প্রীতি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

(ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত)

দ্বিতীয় বর্ষ।

(বৈশাখ—চৈত্র)
১৩১৯।

২৪।৩ এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী।

(বৈশাখ—চৈত্র)

১৩১৯

সেবাব্রত শশিপদ।

প্রীতি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

(ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত)

দ্বিতীয় বর্ষ।

(বৈশাখ—চৈত্র)
১৩১৯।

২৪।৩ এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী।

(বৈশাখ—চৈত্র)

১৩১৯

চিত্র সূচী।

ভ্রম সংশোধন।

বিষয়	পৃষ্ঠা	ভুল	শুদ্ধ
পাহাড়িয়া প্রিয়া	৩৬৫	পচন হেথা না কুরে	পবন হেথা না ফুরে
,,	৩৬৬	কুল পল্লব	ফুল পল্লব
,,	,,	কুণ্ডল	কুন্তল
অপরাধ কার	৩৯৩	জীবন কর্ম্ম	জীবন ধর্ম্ম
,,	,,	আঁমিপুট	আঁখিপুট
,,	,,	এভাবে	লুকাবে
,,	৩৯৪	ঘর	ঘটে
অপূর্ব চিত্র	৪১০	মন্দ্রের	চন্দ্রের

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৯। [১ম সংখ্যা।

শুভাশীষ।

হে রবি, বঙ্গের কবি সমুদিত আজি,
সৌম্য, শান্ত, দীপ্তোজ্জ্বল, শুভ্র বেশে সাজি
বঙ্গের নির্ম্মল নীল উদার গগনে।
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ মধুর লগনে,
হৃদয়ে বরিয়া নিল; তোমার মূরতি
পত্রে পুষ্পে সাজাইল,—করিল আরতি।
জানাইল বঙ্গবাসী প্রাণের ভাষায়
ভালবাসে বঙ্গভাষা—পূজা করে তায়।
তুমি বাণী-বরপুত্র, প্রতিনিধি তাঁর
লহ জয়মাল্য কণ্ঠে;—সাধ বাঙ্গালার
মহান কল্যাণ,—শত রতনে ভূষণে
সাজাইয়া তোল নিতি কনক কঙ্কনে
প্রতি বাঙ্গালীর যত পরাণের ভাষা।
প্রতিদিন নবচ্ছন্দে গাঁথ তার আশা।

নবসুরে, নবভাবে, নবানন্দে মাতি।
ছুটে যাক্ দিশি দিশি তব কীর্ত্তি ভাতি,
স্বদেশে বিদেশে থাক জুড়ি অহর্নিশ ;
বঙ্গবাসী নারীনর করে শুভাশীষ।

নববর্ষের অভিষেক।

আজ এই নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালী বিশেষভাবে নূতনত্ব এবং অমরত্বের উৎসব করিতেছে। আজিকার এই আনন্দকোলাহলে একটী বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে—যাহা সমস্ত সঙ্গীত এবং বাদ্যের পশ্চাতে শান্ত, সৌম্য, মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। আজিকার সমস্ত হাসিগান এমন এক অভিনব সুরে অভিষিক্ত যাহা সমগ্র ব্যাপারকে একটা চিরত্ব দান করিতে সমর্থ।

নববর্ষের অভিষেক বিশেষ ভাবে অমরত্বের অভিষেক। মানুষ যুগে যুগে ইহাকে এমনি করিয়া বরণ করিয়া আসিতেছে—ইহাতে যে তাহারই যথার্থ লাভ তাহা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে বলিয়াই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া প্রাণ ঢালিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইতেছে।

এই নূতনের প্রতি আদর প্রদর্শণ শুধু বাঙ্গালার কিম্বা ভারতবর্ষের একার সামগ্রী নহে;—ইহা সমগ্র বিশ্বের এবং বিশ্বমানবের হৃদয়ের জিনিস। মানুষ মাত্রেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এই আকর্ষণ তাহার মনুষ্যত্বকে অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট করিয়া তুলে।

মানুষমাত্রেই যে 'নূতন'কে ভালবাসে ইহা আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। নূতন জিনিস ব্যবহার করিতে বালকবালিকাগণের যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু যুবক, প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধেরও এই দিকে মনযোগের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ছাত্র নূতন পুস্তক পড়িতে ভালবাসে, পরিব্রাজক নূতন স্থান দেখিতে ভালবাসে, পিতামাতা

এবং আত্মীয়বর্গ সকলে নূতন শিশুর মুখ দেখিতে ঠাকুর দেবতা মানত করে। পৃথিবীতে নূতনের আদর যথেষ্ট ; সকল দিকে এবং সকল ভাবে মানুষ নূতনকেই বরণ করিতে ভালবাসে। তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপে নূতনত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অশ্রান্ত প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যে নূতনের প্রতি একটা নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহা মানবপ্রকৃতির স্বভাবজাত। নহিলে সকল মানুষের ভিতরে ইহা এমন আশ্চর্য্যরূপে একটী একতান রাগিণী বাজাইয়া তুলিতে পারিত না। মানব সমাজে অজস্র পার্থক্য থাকিলেও তাহারা যে বাস্তবিক পক্ষে এক—তাহাদের মধ্যে যে একটী ঐক্যের বন্ধন আছে—যা' কোনওক্রমেই লঙ্ঘন করা চলে না—যা' শত চেষ্টা এবং শত অত্যাচারের মধ্যেও অবিচ্ছিন্ন—এই নববর্ষের অভিষেক আমাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেহগত, আচারগত, এবং ভাষাগত যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন—সকল মানুষই যে বাস্তবিক পক্ষে এক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সকলের মধ্যেই একটী জিনিস আছে যাকে আমরা হৃদয় বলি, এই হৃদয়টীই সমগ্র বিশ্বমানবের ঐক্যের কথা সময়ে অসময়ে আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। শত বিরুদ্ধতার মধ্যেও যখন অন্তঃস্থলে আঘাত পড়ে তখন তাহা একই রাগিণীকে বাজাইয়া তুলে ; তাহা ইংরাজ, বাঙালী, কিম্বা ইউরোপ এসিয়ার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রাখে না—তাহা সমগ্র বিশ্ববাসীকে মানবধর্ম্মের এক আসনে টানিয়া আনে।

আজিকার এই আনন্দ যথার্থ হৃদয়ের আনন্দ, সেই জন্যই সমস্ত বিশ্বের সহিত আমরাও আজ মিলিতে পারিয়াছি। এই নববর্ষের অভিষেক পৃথিবীর সকল জাতিই করিয়া আসিতেছে, কোন তারিখে ইহার আরম্ভ তাহা কোনও ইতিহাসে লেখা নাই—কিন্তু ইহা যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এমন বিশ্বাস করিলে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মানুষ যে যথার্থই নূতনকে আদর করিতে জানে তাহার কোন

প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই আনন্দ উৎসব পৃথিবীতে যে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করিতেছে তাহাকেই মানুষের এই যোগ্যতাটুকুও প্রচারিত হইতেছে। যেখানে শেষ সেখানেই আরম্ভ এবং যেখানে পুরাতণের সমাধি সেখানে নূতনের অভিষেক। এই চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ একটা বৎসর মরিয়া গেল কিন্তু সেখানে আমরা তেমন কোন শোকই প্রকাশ করিলাম না অথচ এই নূতন বৎসরের আরম্ভেই তাহাকে আনন্দগানে অমর করিয়া তুলিতেছি। ইহাতে অতীতের অপমান হইতেছে একথা মনে করিলে নিতান্তই ভুল করা হইবে। বর্ত্তমাণকে বরণ করিয়া লওয়া যেমন মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য অতীতকে সম্মানিত করাও তেমনি তাহার মনুষ্যত্বেরই অঙ্গীভূত। মানুষ চিরকালই অতীতের আদর করিয়া আসিতেছে; আজ এই আনন্দ উৎসবে তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিলে কোনও ক্রমেই তাহাকে সম্মানিত করা হইবেনা। আজ অভিষেক আনন্দ সঙ্গীতেই মুখরিত হউক!

আমাদের অতীত আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং আমাদের আনন্দে অতীতেরও আনন্দ। আমরা তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিতে গিয়া কেবল তাহাকে অপমানিত করিব মাত্র। অতীতকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া দেখি বলিয়াই তাহাকে এত নীচে টানিয়া আনি; অতীত আমাদিগকে মাতার মত স্নেহে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সে কখনই এমন স্বার্থপরের মত তাহার আদর আমাদের নিকট যাচাই করিতে আসিবেনা। অতীত প্রতিদিবসেই আমাদিগকে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, অতীতের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত আমাদিগকে বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সম্মুখের দিকে ধাবমান হওয়াতেই আমাদের মঙ্গল— অতীত আমাদিগকে সেই দিকেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। আগে চলাতেই যে আমাদের যথার্থ মুক্তি আজিকার এই মঙ্গল বাসরে সেই কথাটাই সত্যের আলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নববর্ষের অভিষেকে যে মানুষ নিজেকেও অভিষিক্ত করিয়া

তুলিতেছে, একটু চেষ্টা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। অনন্তের সহিত যে আমাদের একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে তাহা যদিও আমরা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিনা তথাপি ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারি যে অনন্তের দিকেই আমাদের অশ্রান্তগতি এমন কি আমাদের দৈনিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যেও এই অনন্তের গুপ্ত অস্তিত্বটি মাঝে মাঝে উঁকি দেয়।

সমস্ত জিনিসই সেই অনন্তপুরুষ হইতে আসিয়াছে, সেই জন্যই প্রতি অনুপরমাণু পর্য্যন্ত অনন্তের আধার। পৃথিবীতে সীমা বলিয়া কোন জিনিসই নাই, সমস্তই অসীম, সমস্তই অনন্ত। শেষ কাহাকে বলিব? যেখানে শেষ সেখানেই আবার আরম্ভ। অনন্ত অন্তকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আরম্ভ যুগ যুগান্তর বহিয়া চলিয়াছে। বৎসরের শেষ না হইতেই আবার বৎসরের আরম্ভ।

আমরা টের না পাইলেও, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই অনন্তের অভিষেকই প্রতিদিন করিয়া আসিতেছি; আরম্ভকেই আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকি; প্রভাতে যেমন আমরা দিবসের আরম্ভকে দেখি, সন্ধ্যাবেলাও তেমনি বিশ্রামের আরম্ভ দেখিয়া আনন্দিত হই। আরম্ভের আনন্দকে কোনও ক্রমেইউপেক্ষা করা চলেনা। কিন্তু এই আরম্ভের আর শেষ নাই; প্রভাতের পর প্রভাত, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, যুগের পর যুগ, আসিয়া এই আরম্ভকে অনন্তের দিকে টানিয়া চলিয়াছে। একদিকে ইহা যেমনি অনন্ত অন্যদিকে তেমনি চিরনবীন। চিরত্বের সাথে পুরাতণের সম্পর্ক বেশী। যাহা চিরকালব্যাপী তাহাই পুরাতন নহে, বরং তাহা বিপুল বিচিত্রতাদ্বারা আপনাকে প্রতিনিয়তই নূতন করিয়া তুলিতেছে। তাহা সুচির অথচ চিরনূতন। বৎসরের পর বৎসর করিয়া যুগযুগান্তর চলিয়া যাইতেছে কিন্তু সেই একই বৎসরে কত ঋতুপরিবর্ত্তন, কত প্রভাত, কত সন্ধ্যার বর্ণসৌন্দর্য্য, মেঘও রৌদ্রের কত বিচিত্র চিত্র, প্রকৃতির কত গন্ধগীত তাহাকে এক অখণ্ড নবীনতার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই নূতনের আনন্দকে

মানুষ যথার্থ সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে বর্ষে বর্ষে অভিষেক করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে আমরা প্রতিনিয়তই বরণ করিয়া লইতেছি; তাহাকেই বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই নববর্ষের উৎসব। বর্ষে বর্ষে পৃথিবী যতই পুরাতন হইতেছে আমরা ততই উৎসাহের সহিত এই উৎসব করিতেছি। সমস্ত পুরাতনকে অস্বীকার করিয়া নূতনকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার বিপুল চেষ্টাই মানুষের সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা। ইহার সার্থকতায় তাহার নিজেরও সার্থকতা।

আজকার উৎসব আরেকটী কথা মনে করাইয়া দেয়; তাহা সরলতার কথা। মানবাত্মা যে অক্ষয়, তাহার যে শেষ নাই, ধ্বংশ নাই, বিশ্বের এই অনন্ত গতি দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। মৃত্যুতেই আমাদের শেষ নয়, তারপরেও আবার জীবন আছে; আর এই অনন্ত জন্ম মৃত্যুর পর, আত্মলুপ্তিতেই আমাদের পরিসমাপ্তি নহে। জন্মে জন্মে আমরা কত নবীনতা লাভ করিয়া চিরকাল ছুটিয়া চলিব, কত গ্রহে উপগ্রহে বিচরণ করিব, কত সৃষ্টি ধ্বংশের মধ্য হইতে নূতন নূতন বিশ্ব ফুটিয়া উঠিবে, কত শত নক্ষত্র জ্বলিয়া নিভিয়া যাইবে, কিন্তু আমরা কোনদিনই নিভিবনা, আমাদের ঔজ্জ্বল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিবে, এগতির কোন শেষ নাই, বিরাম নাই—অনন্ত আরম্ভের ভিতর নূতনের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অনন্ত পথে ছুটিয়া চলিব; অনন্তপথের যাত্রী আমরা অনন্তের গান গাহিয়া আনন্দলোকের মহাযাত্রা করিয়াছি; এই গানই আজ নববর্ষের আকাশে, বাতাসে; এবং সলিলে হিল্লোলিত হইয়া আমাদের সমস্ত উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

—র প্রতি।

(শেলি হইতে অনুবাদিত)।

স্নিগ্ধ, ক্ষীণ স্বরগুলি যবে ডুবে যায়,
সুরগুলি স্মৃতি মাঝে ওঠে ঝঙ্কারিয়া,
সুন্দর কুসুম যবে অকালে শুখায়,
সাড়া পাওয়া চিত্তে গন্ধ থাকে গুনরিয়া।
গোলাপ জীবন যবে করে সমাপন,
প্রিয় যিনি তাঁরি তরে দলগুলি রয় ;
তেমনি তুমিও যবে লভিবে মরণ
তব চিন্তা, তব প্রেম, রবে চিত্তময়।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

বিকাশ।

জগতের প্রত্যেক জিনিসের একটি প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহা কেবল বিকশিত হইতেছে—এই বিকাশলাভ নিম্নশ্রেণীর অসভ্য হইতে সুসভ্য মানব শ্রেণীর মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যে বাস্পপিণ্ড এককালে নীহারিকা অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল তাহা ক্রমশঃ আকার ধারণ করিয়া আপনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে, যে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছে সে একদিন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার পূর্ণ বিকাশ সাধন করিবে। অসভ্য ও আপনার আনন্দকে প্রকাশ করে। তাই শুনিতে পাওয়া যায়, আফ্রিকার জঙ্গলে বন্য জাতিরা সূর্য্যোদয় দেখিলে আপনাদের আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য মাথায় পালক চড়াইয়া, গাত্র রঞ্জিত করিয়া, উন্মত্ত হইয়া, নৃত্য জুড়িয়া দেয়। এই আনন্দ প্রকাশ সুসংযত ও সুশোভনতা প্রাপ্ত হইয়া সভ্যসমাজে আরও বিকাশ লাভ করিয়াছে। একজন সভ্য ব্যক্তি সূর্য্যোদয় দেখিলে আপনার আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ হয়, ছন্দোবন্ধে গাঁথিয়া তাহা প্রকাশিত করে, অথবা সঙ্গীত বা চিত্র অঙ্কণে তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলে।

মানুষের মধ্যে তাই কেবলি দেখিতেছি—বিকাশ, বিকাশ, বিকাশ। ইহাতেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব। জীবনহীন জড়বস্তু কখনো আপনা হইতেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পাথর, সে চিরকাল পাথরই আছে—তাহার না আছে বৃদ্ধি, না আছে হ্রাস। সৌন্দর্য্যের বিকাশের চিহ্ন তাহাদের দেহ হইতে বিলুপ্ত—সেই জড় পাথরের উপর বিচিত্র লতাপাতা কাটিয়া যখন সৌন্দর্য্যের ভঙ্গি প্রকাশের তরঙ্গ প্রবাহিত করা হয়, তখনই আমরা তাহা দেখিয়া খুসী হইয়া বলি—"বাঃ, বেশ হয়েছে ত!" কিন্তু এই 'বেশ-হওয়া'টুকু পাথরের চেষ্টায় হয় নাই; মানুষের চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়াছে।

মানুষ যখন নিজের ব্যবহারে, কর্ম্মে, চরিত্রে সাধারণের নিকট এবং আপনাকে প্রকাশ করে আমরা তখনই তাহাকে চিনিতে পারি। মানুষ একলা কিছুই নয়, সমগ্রের প্রকাশ লইয়া সমগ্র-প্রকাশ সম্পূর্ণ। আমরা একমুহূর্ত্তের জন্য অন্যের প্রকাশ অস্বীকার করিতে বা নিজেকে অপ্রকাশিত রাখিতে পারি না। পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান সময়ে মানুষের কাব্যে, সাহিত্যে, ও ইতিহাসে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই বিকাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। দেশের ইতিহাস সাহিত্য, কাব্য, এ সমস্তের অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা আমাদের মনেরই বিকাশ দেখিতে পাই। জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের জন্যই। আমার জন্যই যুগে যুগে জ্ঞানীগণ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন আরাধনা করিয়াছেন—আমার জন্যই এ্যারিষ্টটল্, ইউক্লিড, প্লেটো ইত্যাদি ভাবুকগণ, বাল্মীকি, হোমর, সেক্সপিয়র ইত্যাদি কবিগণ আপনাদের গাথা রচিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের জন্যই কোন্ এক আদিমকালে, মানবসভ্যতার প্রথমবিকাশে, আরবের দূর বিস্তৃত মরু বালুকার উপর মানুষ রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া মাথার উপরকার নক্ষত্রখচিত আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, ও তারকামণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে। এই সমস্তই আমাদের প্রত্যেক

করিবার ক্ষমতা আমার পূর্ণমাত্রায় আছে নিজেকে এই সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করা—জ্ঞানের দাম্ভিকতা প্রকাশ করা নহে কিন্তু সমগ্রের মাঝখানে নিজেকে বিকশিত করা। যেখানে সমগ্র মানব-ইতিহাস আপনাদের রহস্যময় তাৎপর্য্য বহন করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরে বহমান, যেখানে মানুষের প্রবল চেষ্টা, উদ্দাম এবং প্রয়াস কোনো বাধা না জানিয়া সুখে দুঃখে উত্থান পতনের ভিতর দিয়া চলিতেছে, নিজেকে সেই স্থানটিতে রাখিয়া নিজের মনুষ্যত্বের প্রকাণ্ড দাবীটি অনুভব করিবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে।

প্রকৃতির মধ্যেও এই প্রকাশের বিরাম নাই। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আকাশের কোন্ সুদূরস্থিত নক্ষত্র আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্য নিজের আলোকরশ্মি প্রেরণ করিয়াছিল, সেদিন সেই আলোক মানুষের চোখে আসিয়া পড়িলে একটি নূতন নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সহস্র বৎসর ধরিয়া সে আলোকরশ্মি অনন্ত আকাশ সন্তরণ করিয়া কেন আসিল?—আমার এই চক্ষু তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইবে, আমার জ্ঞান, আমার কৌতুক তৃপ্ত হইবে, এবং আমি নূতন প্রকাশকে জানিতে পারিব বলিয়া, বৃক্ষশ্রেণী পর্য্যন্ত পুষ্পপত্র উদ্গমের দ্বারা নিজকে কেবলই বিকশিত, কেবলই প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

এই যেমন প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ,—মানুষের মধ্যেও তেমনি নানা ধরণের প্রকাশ আছে। সঙ্গীত, শিল্প, কাব্য—এ সমস্তের ভিতর দিয়াই সে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছে। এ প্রকাশের মূল্য অনেক। ভাল করিয়া নিজের বক্তব্যটি প্রকাশ করা, ভাষাকে ভাবের বেষ্টনী দ্বারা সুসংযত করিয়া চালনা করা ক্ষমতার কার্য্য সন্দেহ নাই। নিজের যথার্থ মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে লিখিতে যাইলে আমরা নিজেদের গলদ দেখিতে পাই,—ঠিক্ মন-মতো করিয়া ভাষার স্রোতকে পরিচালনা করিতে ক্ষমতার আবশ্যক। আমরা যাহাকে "আর্ট" (art) বলিয়া থাকি, এই ভাষার প্রকাশ তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। চর্চ্চা এবং সাধনা দ্বারা তাহার অনুশীলন করিতে হয়। জগতের মধ্যে

কয়জন যথার্থ কবিনামের উপযুক্ত ?—জগতের কয়জন ব্যক্তি নিজেদের লেখনী দ্বারা অমর হইয়াছেন ?

মানুষের এই ভাষা পরস্পরের মধ্যে একটি যোগস্থাপন করিয়া দেয়। ভাষার প্রকাশ সমাজে বলুন, মণ্ডলীতে বলুন, আর ব্যক্তিগত জীবনেই বলুন, যেখানে তাহা উন্নত হইয়াছে, সেখানেই একটা একতার বাঁধন, একটা সামঞ্জস্যের ভাব আসিয়াছে জানিতে হইবে। যে সকল জাতি বা সমাজমণ্ডলী একতা-সূত্রে আবদ্ধ, তাহাদের ভাষা ও তাহাদের সাহিত্য কতই উন্নত ! ভাষার এই অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোনো য়ুরোপীয় ভাবুক বলিয়াছেন—"Thanks to man's capacity of expressing thought by words. It is a means of union among men, joining them together in the same feeling and indispensible for life and progress towards well-being of individuals and humanity."

আমরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছি, যে ভাষা সকলেই ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে লইয়া যে কেহ সুন্দর করিয়া, শোভন করিয়া, অপরূপ ছন্দ, অনুপম স্পন্দন দান করিতে পারেন তিনিই যথার্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রকাশ মন হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইলেও মানুষ সেই চরম প্রকাশটিকে, অনুপম প্রকাশটিকে ভাষায় প্রকাশিত করিতে গিয়া আর কথা জোগাইয়া উঠিতে পারে নাই, আর উপমার দ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই উপনিষৎ বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" অর্থাৎ বাক্য তাহার কাছ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাহা কি কথায় বোঝানো যায় ?—সে শান্ত—কথার বাহিরে,—ভাষা সেখানে দুর্ব্বল। কিন্তু তবুও মানুষের ভাষা সেই প্রকাশকেই মূর্ত্তিদান করিবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তর বহমান্। কত কবি কত গানই রচনা করিল, কত দার্শনিক কত চিন্তাই করিল, কত চিত্রকর কত তুলিকাই টানিল কিন্তু হায় তবুও তাহারা বিন্দুমাত্রও প্রকাশকে মূর্ত্তিদান করিতে পারিতেছে না। তাই মনু বলিয়াছেন,

"জনম অবধি হাম রূপ "নেহারিনু নয়না তিরূপিত ভেল।"
যুগ যুগ হাম হিয়া পর রাখিনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"—চণ্ডীদাস।

সেই প্রকাশটিকে আমরা এই বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রকাশ বলিতে পারি। মানুষের মন স্বভাবতঃই সেই দিকে ধাবিত, কারণ আমরা বিশ্বসৌন্দর্য্যের পিপাসু। সে সৌন্দর্য্য, সে রূপ বা সে আনন্দ কখনো প্রকাশ করা যায় না। যে সকল সৌন্দর্য্যের সাধকগণ, যে সকল মহাকবিগণ, আপনাদের সাধনা ও তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে নিঃশেষে সেই মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিন ও রাত্রির, আলোক ও ছায়ার আবর্ত্তনের মধ্যে তাহার আভাষ প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে। প্রভাতের সৌন্দর্য্যে, দ্বিপ্রহরের নীরবতায় তাহার একরূপ প্রকাশ। বসন্তের উদ্গত পত্রপুষ্পের উৎসবের মধ্যে তাহার অন্য এক প্রকাশ, শরতের সুশীতল শুভ্র আকাশ এবং শ্যামল ধরাতলের শেফালিপুষ্পের ভিতর তাহার অন্য রকমের প্রকাশ; আবার ভীষণ মৌন সমীরিত সুন্দর শুভ্র রজনীর মধ্যে তাহার আর এক রকমের প্রকাশ। ইহার বাক্য নাই, ধ্বনি নাই, কিন্তু আবার সবই আছে। যে ইহাকে মান্য করিবে সেই তাহা লাভ করিবে। ইহা হাতে ধরিয়া পাইবার অথবা আঙ্গুল দেখাইয়া বলিবার জিনিস নহে। উৎস ধরণীর গভীর অথচ গুপ্ত স্থান হইতে আকাশের দিকে নানা বিচিত্র সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে কিন্তু উৎসের উৎপত্তি ধারাটি যেমন অচঞ্চল—বৈচিত্র্যবিহীন তেমনি জগতের সৌন্দর্য্যের আদি স্থান নীরব, সঙ্গীত শূন্য, ছন্দহীন, এবং চিরমৌন। যে প্রকাশ অনন্ত, ভাষায় যাহার কিনারা হয় না, তাহা ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইয়া মানুষের কাছে আসিতেছে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

চীনালণ্ঠন।

(জাপানী হইতে অনুদিত)

চীনালণ্ঠন ভিজে গেছে হায় বৃষ্টিজলে,
রঙীন্ কাগজ এলায়েছে, আঠা গিয়েছে গ'লে।
বাদ্‌লা হাওয়ায় পক্ষিদের দল গিয়েছে ছুটি,
চোখের কোনে শামুক লুকায় শুণ্ড ছুটি।
অকাল বাদলে উৎসব, হায়, হয়েছে মাটি,
কোথা আলো কোথা ভালবাসা ? মিছে কান্নাকাটি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইতিহাস অধ্যয়নের ধারা।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, মুনিঋষি পদরেণুপূত, গরীয়সী জন্মভূমির ইতিহাস সযত্নে অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সুদীর্ঘ অষ্টশতাব্দীব্যাপী নানাপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন সত্বেও এই বিরাট জাতি মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। তাহার কারণ কি? অতীতকালে সম-অবস্থাপন্ন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, উন্নতশির ব্যবিলনের মহারাজ্য অদ্য কোথায়? তাহা কি ভীষণ মরুভূমির অনন্ত ধূলিকণার মধ্যে লীন হইয়া যায় নাই? জগতের শীর্ষস্থানীয় মিশরীয় সভ্যতা আজ কোন খানে? তাহার আর চিহ্ন মাত্রও আছে কি? তাই মনে হয় যে এখনও ভারত উহাদের মত অবস্থাপন্ন হয় নাই। যদিই বা হইয়া থাকে তবে কেন অত্যাচার, উৎপীড়ন বা আক্রমণ সত্বেও এই জাতি এখনো জীবিত? কৈ ঐ সকল জাতিকে শত পদাঘাত করিলেও তো তাহারা সাড়া দেয় না, কিন্তু এ জাতি কেন এখনো মর্ম্মে আঘাত পাইলেই গর্জ্জিয়া উঠে? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে পরিদৃশ্যমান মৃত্যু এ জাতির মৃত্যু নহে, তবে ইহার তমোনিদ্রা মাত্র। এ জাতি ধর্ম্মকে চিরদিন ধরিয়া ছিল তাই ধর্ম্মও ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের উপরেই এ জাতির সমাজও প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, তাই এখনো ইহার প্রাণ রহিয়াছে, ভবিষ্যতে ইহার

আরও কিছু কার্য্য অবশিষ্ট আছে তাই এখনো ইহা বিরাজমান। এত বিপদেও এজাতি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়াছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নূতন বৈদেশিকের আবির্ভাবের ফলে অননুভূত প্রচণ্ড-শক্তিবলে সমাজভিত্তি শিথিল হইবার উপক্রম হইল, এই বিরাটজাতি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপথগামী হইবার প্রয়াস পাইল, সেই মুহূর্ত্তেই যুগে যুগে আগমনকারী ভগবান বজ্রনাদে তাহার মোহ টুটাইয়া দিলেন। গত শতাব্দীব্যাপী অশনিনির্ঘোষে এ জাতিকে সেই ভগবানই জাগাইয়া দিয়াছেন। এই বিংব শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আমরা ঐ জাগরণের পূর্ব্বাভাসমাত্র পাইয়াছি, পাইতেছি। এ জাতি ভবিষ্যতে কতদূর ধাবিত হইবে, কোন উচ্চশিখর পর্য্যন্ত উঠিবে এখন আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।

গত শতাব্দীতে কিরূপে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদিগকে ভগবান সতর্ক করিয়াছেন সেই বিষয়ে কিছু বলিব। কয়েকটী মহাপুরুষের সমালোচনা করিব।

ভারত ইতিহাসে ব্রাহ্মণ।

এ ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র গলদেশে উপবীত-ধারী, স্বেচ্ছাচারী, আত্মগরিমায় পরিপূর্ণ তথাকথিত ব্রাহ্মণ নহে। এ ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারী, সংযতচিত্ত, দয়াবান্, বিশ্বপ্রেমিক, বৈরাগী, সত্যপরায়ণ, নিঃস্বার্থপর, সরল, উদার—ব্রাহ্মণ; "ব্রহ্মং জানাতীতি," ব্রহ্মজ্ঞানী "ব্রাহ্মণঃ"—যাঁহার নিকট মানব-হৃদয় স্বতঃই শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। এই তপঃপরায়ণ, উদাসী ব্রাহ্মণই একদিন সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন। এই ব্রাহ্মণই ভারতের বেদ বেদান্ত, শাস্ত্রাদি সমস্তই আনতশিরে ধারণপূর্ব্বক, বক্ষে করিয়া, লুকাইয়া, বজায় রাখিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী, সহিষ্ণু, এই ব্রাহ্মণই ভারতের নব জাগরণের প্রাক্কালে অগ্রদূত স্বরূপে জাগিয়া ভিভুরনিস্বনে বলিলেন,

"হে ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্রবণ কর! হিন্দু এক ভগবানের উপাসক। তোমরা উঠ, চাহিয়া দেখ। মোহজালমুক্ত করিয়া ফেল, দেখ,

তোমরা একজনেরই সন্তান; তোমরা উঠ, জাগো। ওগো উঠ, উঠ, জাগো, তোমাদের অনেক কাজ বাকী আছে যে।"

রাজা রামমোহন রায়।

যে ব্রাহ্মণ বেদ বেদান্তাদি বজায় রাখিতে পূর্ব্বে কত অত্যাচার অবনত শিরে গ্রহণ করেন, ইনি সেই "বিশ্বের" ব্রাহ্মণেরই সন্তান—রাজা রামমোহন রায়। ধর্ম্মের অবসন্নতা, একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণেরই মর্ম্মে সর্ব্বপ্রথমেই আঘাত করে, শেলবিদ্ধবৎ যন্ত্রনা প্রদান করে। এই রামমোহন কত শত অত্যাচার সহ্য করেন,—কার কাছে জান? যাহারা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যাওয়ায় তাঁহার আবির্ভাব—তাহাদেরই কাছে। কিন্তু তিনি বিচলিত হন নাই।

একাকী সকল ঝঞ্ঝার সম্মুখে অটল, অপ্রতিহত, বিরাট মহিমায় ব্রাহ্মণরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, নির্ভীকভাবে সনাতন সত্য প্রচার করেন। জগৎ এই ব্রাহ্মণের, নব জাগ্রত-আশ্চর্য্যশক্তির স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া বিস্মিত এবং পরে জয়যুক্ত হইল, হিন্দু আপনার ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া চাহিল। ভারতের এই নবজাগরণের প্রাক্কালে আপনার বিরাটমহিম-ভূষিত ব্রাহ্মণই অগ্রদূত।

তাহার পর কে আসিলেন?—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ইনি ব্রাহ্মণের ত্যাগশীলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশ্বমানবকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিলেন; জগৎ ইহার ত্যাগশীলতা দেখিয়া অবাক্। ইঁহার ত্যাগে বিশ্ব দেখিল এখনো এজাতি মরে নাই, এ সমাজ চূর্ণ হয় নাই। ধিকি ধিকি এখনো জীবাগ্নি প্রজ্বলিত—গুপ্তভাবে। ইনি আর এক মহান্ কার্য্য সাধন করিলেন। তখন দলে দলে লোকে ক্রীশ্চ্যান্ হইতেছিল, বলিতেছিল আমরা অন্ধ বিশ্বাস চাহি না, চাই বস্তু, সত্য বস্তু-লোকে এইরূপে স্বধর্ম্মত্যাগী, বিধর্ম্মী হইতেছিল। এই মহর্ষিদেব উক্ত ধর্ম্মান্তগ্রহণ হইতে জাতিকে, সমাজকে, সকলকে ত্রাণ করিলেন। তখন ক্রীশ্চ্যান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লোকে ৺রাজা রামমোহন দ্বারা পুনঃ প্রচারিত, ৺মহর্ষির দ্বারা আচরিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পত্তন

কিছুই নহে। ফলতঃ, যাঁহারা ক্রীশ্চ্যান হইতেছিলেন, অপরোক্ষভাবে (indirectly) তাঁহারা হিন্দুই রহিলেন। মহর্ষিদেবের এই অতুল কীর্ত্তি জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরমুদ্রিত রহিবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রাদি, বেদ, উপনিষদাদি লইয়া তাহার উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্ম্মের আংশিক অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মের অন্তর্গত ভাবরাজি আপনার করিয়া লইলেন না। এতদ্বারা তিনি বিশাল, বিরাট হিন্দুধর্ম্মের একটা দিকে যেন একটু পরক্ষে আঘাত করিলেন। এই আঘাত প্রাপ্ত বিশ্বজনীন ভাবকে পরিপূর্ণ করিতে ৺মহাত্মা কেশব চন্দ্রের আবির্ভাব। * তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চ্যান ধর্ম্মের সারাংশ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ের প্রধান সাক্ষ্য তাঁহারই গুণোদ্ভাসিত অমিয় চরিত শিষ্যবর্গ—প্রাতঃস্মরণীয় ৺পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায় ৺গিরীশচন্দ্র সেন, ৺প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও এখনও বর্ত্তমান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ব্রজ গোপাল নিয়োগী প্রভৃতি—মহাশয়গণ।

কেশবচন্দ্র এত উদারতা সত্ত্বেও ক্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রতি একটু বেশি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাই এই সময়ে অন্য একটি লোকের আবশ্যক হইল—যিনি আমাদেরই প্রণালীতে ভাবিবেন, ধ্যান ধারণা করিবেন অথচ বিশ্বস্থ সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ ও অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া আমাদিগকে একটী অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিবেন, যে পথে অদূর ভবিষ্যতে জগতের পথ প্রদর্শকরূপে, গুরুরূপে ভারতকে চলিতে হইবেই।

এই জন্যই আবির্ভাব হইল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। ইনি

---

* ইঁহার আবির্ভাবের ফলে ইতিহাসের আর একটী দিক স্পষ্ট হইয়া গেল। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ—চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"——ইত্যাদি বাণী সার্থক হইল। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রাহ্মণ হইলেন।—যথা কেশবচন্দ্র নিজে, ৺রাজনারায়ণ বসু ও বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি।

শুদ্ধ সাধন লব্ধ মহাধন দান করিয়া সকলকে দেখাইয়া যান যে ধর্ম্ম কি, ভারতে ধর্ম্ম আছে কি না ও কিরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কার্য্য—মহাকার্য্য।

অতীতের আশ্রমভূমিতে, ব্রহ্ম দ্রষ্টা, ব্রাহ্মণ বা ঋষির নিকট ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা করিতেন। তাই সত্ত্ব রজঃ এই গুণদ্বয় মিলিত হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিত, ধর্ম্ম রক্ষা করিত। এই যুগেও তাহাই হইল। কায়স্থের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত হইল, সত্ত্ব ও রজঃ মিলিত হইয়া ভারতের ইতিহাসের ধারা বদলাইয়া দিল।

নব্যভারতের জাগরণের কর্ত্তা, ইহার কঠোরতম সাধনের স্বামী বিবেকানন্দ। ইহার সাধনলব্ধ মহাধনের, চিন্তার সন্দেশ পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির নিকট প্রচার করিতে মহাবীর বিবেকানন্দের আগমন।

কপর্দ্দকশূন্য, বৈরাগী ও ভারতের শেষ নিঃস্পৃহ কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দ ভৈরবনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "কে বলে ভারত মরিয়াছে? ভারতের এ অবস্থা মৃত্যু নহে, ইহা ভারতের সুষুপ্তি।

For Sleep it was not death,
"To bring thee life Anew O Truth!
No death for Thee.

ইহা মৃত্যু নহে; তোমাকে নবজীবন প্রদান করিতে এই সুষুপ্তির আবির্ভাব। হে সত্য, তোমার আবার মৃত্যু কি?

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ কর ও দেখ "Resume thy march,"Lo! the world in need awaits Awakener ever forward!" আবার ধাবিত হও। দেখ, দেখ, জগৎ তোমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। হে জাগ্রত, উঠ, চল। হে জাগ্রত, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" উঠ, জাগো, বরগ্রহণ কর।

জাগিতেছে। অরুণের রক্তিমাভা সদ্য সুপ্তোত্থিতের বদন মণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেছে তাই আজ ইহার "আধমিলিত আঁখি।" এই আলোকরশ্মির প্রখরতা যখন সহ্য হইয়া যাইবে, যখন সম্মুখে সকল বাধা পরিষ্কার হইয়া যাইবে তখন এ উন্নতজাতির দ্রুতবেগ রোধ করে কার সাধ্য?

যখনই আবশ্যক হয় তখনই অবসাদগ্রস্ত, স্ফূর্ত্তিহীন জাতিকে উত্থিত করিতে দেবদূতবৎ (Angel এর মত) অনন্ত মহিমায় বিভূষিত মহাপুরুষগণ জগতে উপস্থিত হন। তাঁহাদের হৃদয়ে দুর্ব্বলতার লেশ থাকে না, বচনে ভীতির চিহ্ন অবর্ত্তমান, বদনে হতাশার মলিন রেখামাত্রও অদৃষ্ট হয়।

সর্ব্বসময়ে আবির্ভাবকারী, সর্ব্বাগ্রে-অবস্থিত, পথ প্রদর্শক উক্ত মহাপুরুষগণের আবির্ভাবে, তাঁহাদের দর্শনে—ভীতি ও নিরাশা দূরে পলায়ন করে, মানব-হৃদয়ে আশার উদয় হয়। তাঁহারা দুর্ব্বলকে বল দান করেন—বলবানকে উৎসাহে মাতাইয়া দেন তাঁহাদের আবির্ভাবে অনন্ত বীর্য্য ও সাহস হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, আনন্দভরে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করে। অযুত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা জগন্নাথের পদতলে নিবেদিত হয়। মহাপুরুষের পদাঙ্কানুশরণপূর্ব্বক এই সর্ব্বদাপরিবর্ত্তনশীল বাহ্যজগতের বহু ঊর্দ্ধে ভগবচ্চরণে মানব প্রাণ উৎসর্গীকৃত হয়।

মহাপুরুষের জন্ম কখনও বৃথা যায় নাই, এদেশেও যাইবে না। গত শতাব্দীতে এদেশে যে সকল মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, তিল তিল করিয়া যে বৃক্ষ বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন এখন আমরা তাহার পুষ্প মাত্র দেখিতেছি, অচিরেই ফলও প্রাপ্ত হইব।

এখনও এস ভাই, ভৈরবনাদে জাগিয়া বল, "হে ভারত, ভুলিও না —তোমার উপাস্য—সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ভুলিও না—তোমার সর্ব্বস্ব, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও

না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।” “ওগো বীর ঘুচায়ে স্বপন শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে? “হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের ঈশ্বর আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, সারাদিন রাত বল “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা—আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ।

সত্যইচ্ছা।

সবার মাঝারে নমিব তোমারে সঁপিয়া আমার মন
যা' কিছু আমার তোমারে দিয়েছি মোর তনু মন ধন!
বন্ধন মোর নহে বন্ধন মুকতি আজি সে মুকতি
আনন্দ মোর বন্ধনহীন নাহি মানে কোন যুকতি!
আলোক আমার শুধু আলো নয় জীবন জ্বালায়ে জ্বলে;
বাঁচন আমার শুধু বাঁচা নয় খাঁচা সে ভাঙ্গিয়া চলে!
ওগো বন্ধু হে, ওগো একান্ত, হে মোর জীবন সাথীটি,
জ্বালিয়া জ্বালাও এ নিশীথরাতে তোমার উজল বাতিটি।
কর কর ভোর এরজনী মোর ডাক দাও মোরে জাগায়ে,
তোমারি লাগিয়া জাগরণ মোর দাও মোহ ঘোর ঘুচায়ে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

যৌতুক।

সুধাংশু মোহন যখন টেনিস্ রেকেট হাতে করিয়া বাইসিকেল গাড়ী পূর্ণবেগে চালাইয়া মামার বাড়ী টেনিস্ খেলিতে যাইতেছিল তখন তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কি করিয়া তাহার অবাধ্য চোখ দুটি মিঃ রায়ের বাড়ীর সাম্‌নের বারাণ্ডার দিকে পড়িল তাহা সে বুঝিতে পারিল না—অনেকেই সে সময় পারে না। যদি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হইতাম, তবে সুধাংশু মোহনের গাড়ীর হ্যাণ্ডেল অবাধ্য হইয়াছিল কিনা, এবং তাহার ঘণ্টা, দু'চারবার অনাবশ্যক বাজিয়াছিল কিনা, সব সংবাদ লইতাম। সে দিন তার খেলা কিরূপ হইয়াছিল সে খবরও অজানিত থাকিতে দিতাম না।

মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন মানুষ স্বভাবতঃই কবিত্বময় হইয়া উঠে। সুধাংশুমোহনের জীবনে এ সময়টী বোধ হয় কিছু আগে আসিয়াছিল। সে দিন সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়ী ফিরিবার পথে রায় সাহেবের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া যে তাহার গাড়ীর গতির কিছুমাত্র হ্রাস হইল না এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে নিজের ঘরে আলো জ্বালাইয়া পাখা চালাইয়া বসিয়া পড়িল। মুখ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সে কোন গভীর—সুখময় তন্দ্রায় অভিভূত। ধীরে ধীরে ড্রয়ার হইতে নিজের কবিতার খাতাটি বাহির করিয়া কি লিখিল। বোধ হয় মনোমত হইল না—সে পাতাখানি ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে একটী মনোমত হইল। কিন্তু আমাদের সেটী দেখিবার সুযোগ হয় নাই। তবে ছিন্ন কাগজখানির এক টুক্‌রা আমরা দেখিয়াছিলাম তাহাতে লেখা ছিল—

"নীরবেতে আসে প্রেম নীরবেতে বাড়ে,
নীরবেতে প্রাতে কাঁদি নীরবেতে ধরে।"

তার পর যে কি তা জানা যায় নাই। তবে সন্ধ্যা হইতে যে

কবিত্বের দু'একটী ঢেউ সময় সময় তাহার বন্ধু দু'একজন জানিতেন। যাঁহারা এ সব বিষয়ে পারদর্শী তাঁহারা দু'একটী ঢেউয়েতেই সরোবরে কত জল আছে বুঝিয়া লইলেন ; আর যাঁহারা না বুঝিবার তাহারা চুপ করিয়া রহিলেন।

সে দিন ছিল শনিবার। সুধাংশুমোহনদের বৌঠা'নের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। কাপড় চোপড় পরিয়া সকলেই বাহির হইয়া পড়িল। বৌঠানের খোকার ভাত। সুধাংশু একটী বিলাতী পুতুল কিনিয়া লইয়াছিল—মনে করিয়াছিল যে তাহার কচি ভ্রাতুষ্পুত্রটি প্রায় নিজের সমান একটী সঙ্গী পাইয়া মহা উৎসাহ প্রকাশ করিবে।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সকলে উপরে উঠিলেন। সুধাংশুর বৌঠান, সুধাংশুর মা ও অন্যান্য পূজনীয়দিগকে প্রণাম করিলেন। সুধাংশু কিছু না বলিয়া বৌঠানের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। দাদার সুন্দর কুকুর ছানাটী যখন তাহার পা চাটিতে সুরু করিয়াছিল তখন সে যে এই নূতন ভদ্রলোকটীর কাছ হইতে এরূপ সদয় ব্যবহার পাইবে তাহা আশা করে নাই। সুধাংশু কুকুর ছানাটী লইয়া বেশ আদর করিতে সুরু করিয়া দিল। তার পর বৌঠানের হুঁস হইলে সে সেটীকে আবার মাটীতে রাখিয়া গাড়ী হইতে পুতুলটী লইয়া আবার পিছন পিছন উপরে উঠিল। সকলে গিয়া হলঘরে বসিল—আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে সুধাংশুর আলাপ হইয়া গেল। সুধাংশুর দাদা তখন নীচে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন।

যার অন্নপ্রাশনে আজিকার ভোজ তাহাকে না দেখিলেই নয়। সকলেই খোকাকে দেখিতে চাহিল। সুধাংশুর বৌঠান্ পাশের ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "লিলি ! বেবীকে নিয়ে আয় ত।" নির্দ্দিষ্ট ক্রোড়ে বাহিত সেই ক্ষুদ্র জীবটী সকলের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধাংশু এতক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল ; এক্ষণে শিশুর ক্রন্দন তাহার মনকে ঘরের ভিতরকার একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিয়া ফেলিল। বালকও তদপেক্ষা তাহার

বাহয়িত্রীকে দেখিয়া সুধাংশু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। বেবীর হাতে পুতুলটী দিল। বেবী পুতুল পাইয়া কিরূপ সন্তুষ্ট হইল সে দিকে লক্ষ্য করিবার সময় সুধাংশুর ছিল না। বোধ হয় চেষ্টাও করে নাই।

তাহার পরদিন হইতে সুধাংশু হঠাৎ বৌঠানের বড় ভক্ত হইয়া উঠিল। রোজ বিকালে কলেজ ছুটী হইলে পর সে দাদার বাড়ী গিয়া দাদার সঙ্গে টেনিস খেলিত। আর একটী প্রাণীর সহিতও তাহার আলাপ হইল। সে বৌঠানের সম্পর্কীয় ভগিনী—নাম লীলা। তাহার পিতা কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন। লীলা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে। তার সঙ্গে সুধাংশুর বেশ আলাপ হইল। আলাপ জমাট করিতে সুধাংশুমোহন একেবারে সিদ্ধ হস্ত।

আজকাল প্রায়ই সে বৌঠান ও তাহার ভগিনীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করে; আলোচনাটা বেশীর ভাগই কাজ সম্বন্ধীয়। লীলার কাজে মন আছে দেখিয়া সুধাংশুও লাগিয়া পড়িল। মাঝে মাঝে সে বড় বড় কবিদের কবিতা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিত। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে সেই সঙ্গে সুধাংশুমোহন নিজের দু'একটীকে চালাইয়া দিতে ভুলে নাই।

এমনি করিয়া সুধাংশুর দিনগুলি বেশ আমোদে কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে দিন কলেজ বন্ধ ছিল। সুধাংশুমোহন তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয়া বৌঠানের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। দাদা বাড়ী ছিলেন না—কোথায় 'এনগেজমেণ্ট' (engagement) রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে ছিলেন বৌঠান ও লীলা। সুধাংশু তাহাদের সহিত বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে আরম্ভ করিল। যদি কেহ তাহার বিস্তারিত বিবরণ চান্ তবে আমাকে ঠকিতে হইবে। নিজে সে রকম আলাপ করি নাই—বলিতেও পারি না। কিছুক্ষণ পরে বৌঠান বলিলেন, "সুধাংশু, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?

"কোথায়!"

"কেন? আমার উপর আবার তোমার এত খাতির কেন?"

"না সুধাংশু তোমাকে যেতেই হবে। লীলার বিয়েতে ত আমায় যেতেই হবে। তোমার দাদা ত আর কাজ ছেড়ে যেতে পারবেন না।" সুধাংশু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পর বলিল, "আমার পরীক্ষা সাম্‌নে, আমি যেতে পারবো না।" বৌঠান্‌ তাহার কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "তোমায় মতিচাঁদের দোকান থেকে লীলার জন্য একটী বেশ ভাল নেক্‌লেস্‌ এনে দিতে হবে।" তিনি সুধাংশুকে টাকাটা দিতেও ভুলিলেন না। তার পর সুধাংশু তাড়াতাড়ি কথা সারিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছুতা দেখাইয়া বিদায় লইল। দুপুর বেলাকার গম্ভীর প্রকৃতি তাহাকে আরও আঘাত করিতে লাগিল —আজ তার মধ্যে একটী ভয়ানক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ঝড়ের মত সে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইল। রাস্তায় তখন একটী ক্লান্ত ফিরিওয়ালা নিস্তেজ কণ্ঠে হাঁকিতেছিল, "চুড়ি চাই, বালা চাই।"

মধ্যে অনেকদিন সুধাংশু আর বৌঠানদের বাড়ী যায় নাই। দরওয়ান আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, লীলার বিবাহের বেশী বিলম্ব নাই। সুধাংশু মতিচাঁদের দোকানে গিয়া বৌঠানের জিনিস কিনিয়া আনিল, সেটী লইয়া বৌঠানের বাড়ী চলিল। বলা বাহুল্য বৌঠান্‌ সুধাংশুকে না আসার জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিল; কিন্তু সুধাংশু এক উত্তর দিল, "পরীক্ষা সামনে।" যখন বৌঠানকে লইয়া যাওয়ার কথা উঠিল তখন সুধাংশু একেবারে নারাজ হইয়া বসিল। তাহার মনের যে তখন কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তাহার বৌঠান জানিতে পারেন নাই।

বিবাহের উৎসবে যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। সে চায় নীরবে আপনার নিভৃত ঘরে বসিয়া নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিতে। সকলের সামনে নিজেকে ধরিবার মত অবস্থা তখন তাহার ছিল না। কিন্তু সুধাংশু না গেলে তাহার বৌঠানের যাওয়া হয় না। বৌঠান্‌ তাহাকে যাইবার জন্য ধরিল—সেও যাইবে না। বৌঠান তাহাকে

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও সুধাংশুকে গাইতে হইল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিজের খাতায় কত কি লিখিল। কিছুই তাহার মনোমত হইল না। শেষে দেশলাই জ্বালাইয়া খাতাখানি পোড়াইয়া ফেলিল।

মতিলাল বাবুর বাগান খানি বড় সুন্দর। আজ সেইখানে তাহার কন্যার বিবাহ। চারিদিকে একটী আনন্দ বিরাজ করিতেছিল। সকলেরই মনে আনন্দ।

ছোট একটী ঘরে নানা জায়গা হইতে প্রেরিত যৌতুক সাজানো ছিল। কোনটাই খোলা হয় নাই। নিরুপমার ভগিনী, আমাদের সুধাংশুর বৌঠান তাহার সমান বয়সী কয়েকজনকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ছোট বালক বালিকারাও যাইতে ছাড়ে নাই। বৌঠান সুধাংশুকে যৌতুক দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। এক একটী বাক্স খোলা হইতে লাগিল এবং সেই বাক্সের অভ্যন্তরস্থিত জিনিষের প্রশংসা বা নিন্দা চলিতে লাগিল। একটীর পর একটী বাক্স খোলা হইতে লাগিল—বিচিত্র রকম অলঙ্কার বাহির হইল। শেষে একটী "ব্রোচ" বাহির হইল। ব্রোচটীর উপরে একটী তীর অঙ্কিত। সব যৌতুকের সঙ্গেই প্রেরকের নাম ছিল—কিন্তু এটী নাম হীন। এরূপ যৌতুক বিবাহে কখন ব্যবহৃত হইয়াছে কি না কেহ জানে না। সেই তীরটী নিজের শাণিত অগ্রভাগ প্রসারিত করিয়া যে কি কহিতেছিল কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। ছোট ব্রোচটী সমবেত সকলের মনের মধ্যে একটী ঘোর সমস্যা ঘনাইয়া তুলিতেছিল। যখন সকলে সমস্যা পূরণে ব্যস্ত ছিল সুধাংশু তখন বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া নহবৎ শুনিতেছিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না; সমস্যা-পূরণেই সকলের মন নিযুক্ত। যদি কেহ সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিত বা তাহাকে প্রশ্ন করিত তবে হয়ত সেই কঠিন সমস্যা সহজেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু কেহ তাহা করিল না। সে সমস্যা অপূর্ণই রহিয়া গেল। শুধু সেই শাণিত তীর খানা মুখ বাহির করিয়া একটী ভগ্ন হৃদয়ের "যৌতুক"রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

দুর্গেশনন্দিনী (BALLAD)

মারঠা প্রতাপে দিল্লী নগরে
মোগল দর্প টুটে,
বিপুল হর্ষে বর্গী সকল
ভারতবর্ষ লুটে।
বাঁধিয়া একদা ফেলে দিল আনি
মারাঠা সেনার দল
তুরাণ দেশের যবন সেনারে
দুর্গেশ পদতল।
দুর্গেশ কহিল "শুন হে বন্দী,
হ'য়েছ বিদেশবাসী
আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিতে
সহায় করিয়া আসি :
মোগল প্রদীপ নিবিছে এখন
মারাঠা তুলিছে শির
অসিখানি তব পেশোয়া আদেশ
পালন করুক বীর"।
আনত আননে সাহসী যুবক
সম্মতি দিল তায়
গিরি দুর্গমাঝে ভীম কলরবে
সবে জয় জয় গায়।

(১)

যন্ত্রের মত দাঁড়াত শান্ত্রী
বন্দুক স্কন্ধে রাখি
বাতায়ন পথে চাহিয়া থাকিত
কাহার তৃষিত আঁখি।

একদা যখন　　বিজয় পুরের
কঠিন নিশীথ রণে
ফিরিল তুরাণ　　বিজয় উল্লাসে
মারাঠা কটক সনে
দুর্গেশ ঢুকিল　　দুর্গ দুয়ারে
বিজয়ী সৈনিক দলে
সহসা একটী　　মালিকা পড়িল
তুরাণ চরণ তলে।
হেরিল বিজয়ী　　দুর্গেশ সুতার
সজল নয়ন দুটী
এত দিন যাহা　　আভাস কেবল
পলকে উঠিল ফুটি।
যতনে যুবক　　কোমল মালাটী
রাখিল আপন শিরে
নীরবে রমণী　　ঈষৎ হাসিয়া
চলে গেল ধীরে ধীরে।

(৩)

শ্রাবণ গগন　　ঘন চুম্বিত
নিবিড় তিমির মেঘে
তরুণ তুরাণ,　　দুর্গেশ দুহিতা
ছুটায় ঘোটক বেগে।
আকাশ রাণীর　　নয়ন সলিলে
তিতিল দোঁহার দেহ
আঁধিয়ার রাত　　চকিত চপলা
গর্জ্জিল গগনে মেহ।
সহসা আকাশ　　ধ্বনিয়া উঠিল

মুখর করিয়া বন্ধুর প্রান্তর
 স্তব্ধ শান্ত স্বপনে।
সম্মুখে হেরিল প্রেমিক যুগল
 কৃষ্ণার ক্রুদ্ধ জল
পশ্চাতে শুনিল আসিতেছে দ্রুত
 অশ্ব আরোহী দল।
মাথার উপর অশনি ডাকিল
 রূঢ় চীৎকার করি
নদীর সৈকতে হেরিল তাহারা
 একটী ক্ষুদ্র তরী।
কর্ণ ধরিল তুরাণ যুবক
 রমণী টানে ক্ষেপণী
কৃষ্ণার সলিলে নাচিতে লাগিল
 শত শত কালফণী।
"করিলাম ক্ষমা আয় ফিরে তোরা
 দুর্গেশ কহে কাঁদিয়া
সৌদামিনী শিখা উঠিল জ্বলিয়া
 মেঘের দেহ পুড়িয়া।
আবার ডাকিল কাতর দুর্গেশ
 "আয় আয় ফিরে আয়"
কুপিয়া বাতাস শুষিয়া কহিল
 হায়! হায়! হায়!! হায়!!

শ্রীঅনুপমচন্দ্র রায় বি, এ।

চন্দ্রলোক।

(উইণ্ডসর ম্যাগাজিন হইতে)

The clear light of the moon slept upon the waves

Vitor Hags

জন কোলাহল পূর্ণ পৃথিবী হইতে দূরে—বহুদূরে এই আলোকের রাজ্য। জ্যোৎস্না প্লাবিতা গভীর শান্ত রজনীতে যখন আমরা নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি—তখন কি এক মধুরদৃশ্যে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে! সেই চন্দ্রালোকিত আকাশের প্রতিবিম্ব যখনসাগর তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, তখন সে দৃশ্য কি মধুর, কি প্রাণস্পর্শী। চিন্তাস্রোত আমাদিগকে ধীরে ধীরে সেই জনহীন রাজ্যে বহিয়া লইয়া যায়। আমরা সেই সুখ রাজ্যে আনন্দে বিচরণ করি।

সৌরজগীতের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে গমনাগমন যদি সম্ভবপর হইত তবে সেই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের প্রথম বিশ্রাম স্থান (Station) হইত এই চন্দ্রলোক—গগণমার্গ বিচরণকারী শতসহস্র যাত্রী প্রতি নিয়ত এই ষ্টেশনেই গতায়াত করিত।

গগণবিলম্বী অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় ইহার ও দূরত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক ২৩৮, ৮১৮ মাইল—অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের ৩০ গুণ। ইহা হইতে অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে হয়ত এ অনুমান ভূল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—কলিকাতা হইতে দিল্লী কিম্বা লক্ষ্ণৌর স্থিরিকৃত দূরত্ব অপেক্ষা ইহা অধিকতর নির্ভুল।

চন্দ্রলোক সম্বন্ধে কি কি জানা গিয়াছে।

এক্ষণে আমরা মনে মনে পৃথিবী এবং চন্দ্রলোকের দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি। মনে করুণ একটী কামানের গোলা প্রতি সেকেণ্ডে ৫৫০ গজ করিয়া ছুটিতে পারে—এই গোলা আট দিন পাঁচ ঘণ্টা পরে যাইয়া চন্দ্রলোকে পৌঁছিবে। বাতাসের

স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬৫ গজ পথ পরিভ্রমণ করিতে পারে। পৃথিবী এবং চন্দ্রলোকের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ যদি শুধু এই প্রকার বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে এবং চন্দ্রলোকে যদি এমন একটী ভীষণ স্ফোটনশব্দ (Expiloson) হয় যাহার কম্পন পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তবে আমরা এই পৃথিবীবাসী নরনারী সেই শব্দ তের দিন কুড়ী ঘণ্টা পরে শুনিতে পাইব।

পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রদেব ১/৪৯ ভাগমাত্র অর্থাৎ ৪৯টী চন্দ্র একত্রিত হইলে আমাদের পৃথিবীর সমান হইতে পারে এবং ছয় কোটি কুড়ী লক্ষ চন্দ্র একত্রিত হইলে এক সূর্য্যের সমান হইতে পারে এবং এই চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে যে ব্যবধান টুকু বিদ্যমান রহিয়াছে তন্মধ্যে আমাদের ত্রিশটী পৃথিবী অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

চন্দ্রদেব আমাদের অতি নিকটে বলিয়াই আমরা তাহার আকার, অবস্থা, ভৌগোলিক ব্যবস্থা, এবং সংস্থান সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমরা বহুসহস্রশতাব্দী হইতে সুন্দর মুখমণ্ডলের সহিত চন্দ্রদেবের তুলনা করিয়া আসিতেছি কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই যুগযুগান্তের বিশ্বাস মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। আমরা যে স্থানে চন্দ্রদেবের চক্ষু নাসিকা কল্পনা করিয়া থাকি সেস্থান সমতল ভূমিমাত্র, চিবুক এবং গণ্ডস্থল অত্যুচ্চ গিরিরাজীতে পরিপূর্ণ এবং নিমেষমধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের সম্মুখে আর একটী মহাবন্ধুর পৃথিবী শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে একবার চন্দ্রদেবের সে চেহারা অবলোকন করিলে আর কিছুতেই তাহাকে আপন প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের সহিত তুলনা করিতে প্রয়াসী হইবেন না একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চন্দ্রলোকের বিশাল গুহারাজীর মধ্যে কয়েকটী দুই তিন মাইল

অতলস্পর্শী গহ্বর, বন্ধুর গিরিপথ, উচ্চশির শৈলমালা, উপত্যকা, অধিত্যকা এবং অসংখ্য 'ফাটল' পরিষ্কার ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে যখন আমরা চন্দ্রদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন মনে হয় যেন আমরা ঐ নবীন রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি—আমাদের কল্পনার নৌকা ঐ প্রদেশের নদী সমুদ্রের উপর ভাসাইয়া যাই ; উহাদের সীমান্তরেখা নিমেষমধ্যে নির্দ্ধারণ করি। *

লিউয়ী এবং পুঁইজো নামক (M, Lœwy & M, Puisen) দুই ব্যক্তি প্যারীমান মন্দিরে চন্দ্রলোকের অনেক আশ্চর্য্য ফটো তুলিয়াছেন। † এই ফটো দেখিয়া সেখানকার পর্ব্বতমালা এবং অন্যান্য স্থান সমূহের নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সেই ছবি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে সেখানকার পর্ব্বতমালা চক্রাকার। দক্ষিণদিকে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতচক্র রহিয়াছে উহার মধ্যভাগ সম্পূর্ণ সমতল—এই সমতল ক্ষেত্রের ব্যাস ১১৫ মাইল এবং পর্ব্বত-চক্র ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে এক মাইল হইতে দেড় মাইল পর্য্যন্ত উচ্চ। ইহাকে 'টোলেমি' (Ptolemy) নাম দেওয়া হইয়াছে।

আরবদেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ আল্‌বাটিজীনের (Albatigin) নামে বামদিকের বিশাল চক্রের নামাকরণ হইয়াছে। টোলেমির নিম্নভাগে একটী অত্যন্তকালো ছোট চক্র দেখিতে পাওয়া যায়—এই চক্রে এ পর্য্যন্ত সূর্য্যালোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হার্শেল (Horschel) অনুমান করিয়াছেন যে উহা অন্যূন পচিশ মাইল গভীর হইবে। এই কালো চক্রের

* বর্ত্তমানে ঐ নদী সমুদ্রের ধারণা পরিহার করা হইয়াছে।

† সর্ব্বপ্রথম Dr. Draps, New york হইতে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে চন্দ্রলোকের ফটো তোলেন, Bond সাহেব ১৮৫০ খৃঃ অব্দে যে ফটো তুলিলেন তাহা আরও পরিষ্কার এবং তৎপরে De, le, Rue, এবং

সন্নিকট আরও একটী এই প্রকার কালোদাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থের সাহায্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্ম, উহার লেখক ক্যামিলি ফ্লামারিয়ন (Camille flammarion) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ—ইনিই এই কালো চিহ্নটী আবিষ্কার এবং উহার ব্যাস ৫২ (মাইল) স্থির করিয়া ইহাকে আপন নামানুসারে ফ্লামারিয়ণ চক্র (flammaion cirle) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহত এইরূপ অসংখ্য পর্ব্বতচক্র, গিরিগহ্বর প্রভৃতি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উহার কত প্রভেদ!

চন্দ্রলোকের এই চক্রগুলিকে নিঃশোষিত আগ্নেয় গিরি বলা যায় না কারণ আগ্নেয়গিরির দ্রবপদার্থরাশীর নির্গম পথ আমরা খুঁজিয়া পাইনা এবং ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ গুলি এত সূক্ষ্ম যে, উহা যে কোনও কালে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে তাহা কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না। কি প্রকারে যে এই সকল পর্ব্বত শ্রেণী এবং সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের উৎপত্তি হইল আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না। তবে মনে হয় যেন চন্দ্রলোকের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে উহার অভ্যন্তরস্থ গ্যাস সমূহ বাহির হইবার পথে যে সকল দ্রব পদার্থ সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল তাহাই স্তুপাকারে ঐ পর্ব্বতমালার সৃজন করিয়াছে—সর্ব্বোচ্চ গিরিমালা সর্ব্বপুরাতন—চন্দ্রের জন্মসময় হইতেই উহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অতলস্পর্শী গিরি-গহ্বর, অত্যুঙ্গ গিরিশেখর—সমস্তই ঐ গ্যাসোদ্গীরণের ফল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রদেবের জন্ম কত সহস্র কিম্বা কত লক্ষ্য কোটী বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে মানব চিত্ত তাহা স্থির করিতে অক্ষম।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যেন যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে চন্দ্রোলোক অদ্ভুত ভৌতিক যুদ্ধের রঙ্গভূমি ছিল—সেই যুদ্ধে তাহাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—ফলে সেখানে এক্ষণে মহাশান্তি

বর্ত্তমানে ঐ উপগ্রহ স্নিগ্ধ শান্তি পরিপূর্ণ। আমরা যখন এই চন্দ্র লোক সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরীক্ষা করি তখনও পৃথিবীর সঙ্গে কোনও প্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। সে রাজ্যে সূর্য্য উঠেনা, বাতাস বহেনা, মেঘ ছোটে না, বিদ্যুৎ চমকে না, অশনি গর্জ্জে না, বৃষ্টি পড়ে না, বরফ গলে না। যে রজতশুভ্র উপগ্রহ আমাদিগকে রাত্রির পর রাত্রি বিমল জ্যোৎস্নাধারায় পরিপ্লাবিত করে তাহা নীরব, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, শান্ত।

পূর্ব্বে কত অনন্ত বৎসর তাহার জন্ম কেহ বলিতে পারে না, তবে উহা পৃথিবী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর বাষ্পরাশি তখনো ঘনীভূত হয় নাই, জনমানবের বাসোপযোগী সেই বাষ্পরাশি তখন অনন্ত শূন্যে ঘুরিতেছিল—সেই সময়ে ঐ বাষ্পাকারে পৃথিবী হইতেই ঐ চন্দ্রদেবের জন্ম। জননী অপেক্ষা সন্তান বয়োজ্যেষ্ঠ! চন্দ্র দেবের জন্ম হইল।

চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে নাক্ষত্রিক জীবন অতিবাহিত করিয়া শৈশবে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সবল হইতে লাগিল, লক্ষ্য লক্ষ্য বৎসর শক্তিসঞ্চয় করিয়া যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন, চেহারা খানা নিটোল গোলগাল হইয়া উঠিল, তখন তাহার ইচ্ছা হইল সে শক্তির পরিচয় দান করিবেন। তখন তাহার ভূতপ্রকৃতির সহিত মহা দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল,—লক্ষ্য লক্ষ্য বৎসর এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল। অনেক শক্তি অপচয় হইয়াছে—শরীরের অনেকাংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ এখন নিস্তেজ, নিথর, অবশ। এখন তাঁর সে যৌবনের সৌন্দর্য্য নাই, যৌবনের উৎসাহ নাই, যৌবনের শক্তি নাই, যৌবনের বিক্রম নাই। তেজোহীন বৃদ্ধ বাঁচিয়া কি মরিয়া আছে সন্দেহ! সেখানে জলবায়ু আছে কিনা তাই বলা যায় না; যদিই বা থাকে তবে তাহাও এত সূক্ষ্ম, এত সামান্য যে আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারি। সেখানে বাষ্প রাশি জলে পরিণত হয় না, কিম্বা জলরাশি বাষ্পে পরিণত হয় না—তাই বলিয়া এখানেই আমরা চন্দ্রদেবের উপর মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া দিতে পারি না, কারণ উহা যে প্রাণহীন তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয়

এই উপগ্রহ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার অবয়ব দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। *

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ফন্টেনিল (Fontenelle) মার্কুইস্ পত্নীর (MarQuise) সহিত কথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে তিনি চন্দ্র লোকে একটি বালিকার অপরূপমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, যার চেহারা এবং হাব ভাব ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তার মুখখানা অতি সুন্দর এবং কমনীয় ছিল, ক্রমে গণ্ডদেশ বসিয়া গিয়াছে, নাসিকা দীর্ঘতর হইয়াছে কপাল এবং চিবুক আরও উন্নত হইয়াছে—ক্রমে তাহার মুখে যাহা কিছু সুন্দর এবং প্রীতিময় ছিল সকলই ম্লান হইতে ম্লানতর এবং ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মার্কুইস পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন একি বলিতেছ ? তুমি কি পাগল হইয়াছ, না ঠাট্টা করিতেছ ?" উত্তরে ফন্টেনিল বলিলেন,—This is no joke. I assure you, you really can see a peculiar figure in the moon, which resembles the head of a woman as she issues from between the rock, and variations have certainly taken place there ; pieces of mountain have fallen and brought to view fresh paints and these now only serve to represent the forehead, nose and chin not of a girl, but of an old woman.

এই সমস্ত গল্প আমরা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না, হয়ত কিছু মাত্র সত্য ও ইহার মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে।

সম্প্রতি দূরবীক্ষণ সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া এবং চন্দ্রলোকের ফটোগ্রাফ গুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া মনে হয় যেন আজ পর্য্যন্ত ও সেখানে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর হইল Astronomical Soeiety of Franceর এক সভায় M. Puisew এবং M. Deseilligny মহোদয়দ্বয় চন্দ্রলোকের

* হার্শেল অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে তিন ক্রিয়াশীল আগ্নেয়-

কয়েকটি সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তবে মঙ্গল (Mars) কিম্বা (Jupiter) বৃহস্পতিতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই না বলা যাইতে পারে।

চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন একটী ঘুমন্ত জগত আকাশের গায় পড়িয়া রহিয়াছে—এত শান্ত, এত স্তব্ধ, এত নির্জ্জীব! সে জগতে জল নাই, বায়ু নাই—কাজে কাজেই সে দেশ বর্ণহীন, শব্দহীন, স্বর্গহীন! নীলআকাশ তার চারিদিক বেষ্টন করিয়া বিরাজ করে না, প্রাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যদেব তথাকার আকাশ লালবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেয় না, প্রকৃতির সহস্র বন্দন গীতিতে সে জগত মুখর হইয়া উঠে না। যেখানে জল বায়ুর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে নভোমণ্ডল সৃষ্ট হয় নাই, সেখানে সকলই এই প্রকার অদ্ভুত! এই আশ্চর্য্যজনক দেশে আমাদের মতন জীবের বাস অসম্ভব! সেই মহাশূন্যময় দেশে জনপ্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না বলিয়া আমরা নিরাশ হইব না। এমন একদিন আসিতে পারে যখন ঐ প্রদেশ প্রাণীজগতের উপযুক্ত হইবে, প্রকৃতি তাহাকে নবীন সাজে সাজাইয়া দিবে, তটিনী সেথায় আনন্দে ছুটিয়া যাইবে, বাতাস ফুলকে বহিয়া যাইবে, সূর্য্য সেদিন নবীন গরিমায় হাসিয়া উঠিবে! কিম্বা এইরূপও হইতে পারে ভগবান রাজ্যের উপযুক্ত জীবসমূহ সৃজন করিয়া দিবেন—গ্রহে গ্রহে, পৃথিবীতে পৃথিবীতে, নব নব জীবনের উৎপত্তি হইবে! বর্ত্তমানে চন্দ্রলোকে জনপ্রাণীর বসবাস সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনও উপায়ই আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

অত্যুৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে আমরা এক একটী জিনিষ ২,০০০ হইতে ২,৫০০ হাজার গুণ বড় দেখিতে পাই, কিম্বা বাতাস যদি শান্ত থাকে এবং বায়ুমণ্ডল যদি শীত গ্রীষ্মজনিত কোনও প্রকার কম্পন অনুভব না করে, তবে এক একটী পদার্থ ৩,০০০ হাজার গুণ বড়ও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সচরাচর সকল স্থানে হওয়া

অনুকূল অবস্থার মধ্যে দেখিতে পারিলে, চন্দ্রকে আমরা ৩,০০০ হাজার গুণ বৃহৎ দেখিতে পাই। তখনও চন্দ্রদেব আমাদিগ হইতে ৮০ আশী মাইল দূরে অবস্থান করেন। কিন্তু আশী মাইল দূরে আমরা কি দেখিতে পারি ?

আমরা যদি বেলুনে মাত্র ৩ মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া আমাদের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি—ইহার পূর্ব্বদেশ জনহীন নীরব বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যথার্থই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়! কাজে কাজেই চন্দ্রলোকে কোন প্রকার জনপ্রাণী নাই—এরূপ অনুমান করা আমাদের পক্ষে অন্যায়! হয়ত তাহারাও আমাদের এই পৃথিবীর বিষয় এক আধটু চিন্তা করিয়া থাকে !

সাধারণতঃ লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে চন্দ্রদেব ঋতু পরিবর্ত্তন, বৃক্ষলতাদির জীবনমরণ, মানুষের কল্যানঅকল্যাণ, পাখীর ডিম্বপ্রস্ফুটন প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

লাপ্লেস্ (La place) * চন্দ্রদেব সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়াছেন এবং লোকের এই সকল ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু লোকের বিশ্বাস সহজে দূরীভূত হইবার নহে। শত তর্ক বিতর্কে শত যুক্তি প্রদর্শনেও উহার পরিবর্ত্তন হয় না—তবে লোকের ঐ প্রকার ভুলধারণাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বিজ্ঞান অসমর্থ—তাহার সম্মুখে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে।

"Science cannot admit that which has not been proved."

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ।

---

* La Place, "The Newton of France"—ফ্রান্সের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ এবং বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিশারদ, Fowrier ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"He would have completed the science of the sky had that Science been capable of completion."

বিবাহ বিভ্রাট।

পুত্র অমলচন্দ্র যে দিন সহরে কলেজে পড়িতে গেল সে দিন গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্র সহর হইতে শীঘ্রই ডেপুটী হইয়া ফিরিয়া আসিবে। তিনি আরো বলিলেন যে তাঁহার পুত্রের বিবাহে নগদ পাঁচহাজার টাকা, গহনাপত্র ও দানসামগ্রী ইত্যাদিতে আরো পাঁচহাজার টাকা যে না দিতে পারিবে এমন লোকের ঘরে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন না। গৌরহরি বাবু যখন চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর পাতিয়া সমবয়স্কগণের মধ্যে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নত পদের ও বিদ্যাবত্তার বিষয় আলোচনা করিয়া রামধন মুদীর দোকানের তামাকের বংশ উদ্ধার করিতেছিলেন, তখন দিনমণি বড় বড় তালগাছগুলির পিছনে অস্ত যাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কালীচরণ, বামাচরণ, ঈশান, কৈলাস ইত্যাদি ঘটকরাজগণের বিবাহ প্রস্তাবে কমলপুরের গৌরহরিগৃহ মুখরিত হইতে লাগিল। গৌরহরি বাবু যখন সকল ঘটককেই ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমলচন্দ্রের বিবাহ না হইতে কনিষ্ঠ অমলচন্দ্রের বিবাহ একেবারে অসম্ভব তখন সকল ঘটকই ক্ষুন্নমনে শিকার পলাইল ভাবিয়া বাড়ী ফিরিলেন—কেবল ফিরিলেন না কৈলাসচন্দ্র। কূটবুদ্ধি পরায়ণ বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের যেই নামটুকু ছিল সেই নামের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, কৈলাসচন্দ্র গৌরহরি বাবুকে বলিলেন—"হলো'ই বা আপনার ছেলে মূর্খ তাই বলিয়া কি আমরা থাকিতে তাহার একটা সম্বন্ধ স্থির হইবে না? আজ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে যদি আপনার বড় ছেলের একটা ভাল সম্বন্ধ যোগাড় করিয়া দিতে না পারি তবে আমার নাম—"বেশ, আপনি যদি তাই করিতে পারেন তবে আমি আপনাকে আমার যথাসাধ্য পুরস্কৃত করিতে চেষ্টা করিব।" "কত টাকা দিতে পারিবেন?" "পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিতেছি যদি কৃতকার্য্য হন তবে আরো পঞ্চাশ—"

আর আপনি কি না আপনার পুত্রের বিবাহে ঘটককে মোটে একশত টাকা দিতে চাহেন? "আচ্ছা, দ্বিগুণ দিব কিন্তু ভাল সম্বন্ধ চাই—কণেটির বেশ লক্ষ্মীশ্রী থাকে—আর পাওনা দেনা তা এই দশজনে যাহো দেয় তাহা দিলেই হইবে। তবে কি না এই সোণার ঘড়ি চেন একটা তা আমার ছেলের বড়ই ইচ্ছা—সেটা দিতেই হইবে—আর আপনাকে কি বলিব, আপনি ত আর পর নন। "প্র াপতির ইচ্ছা" বলিয়া কৈলাসচন্দ্র বিদায় হইলেন। যাইবার সময় তাহাদের কাণে কাণে কি কথা হইল—দুই জনই খুব হাসিলেন।

২

কনকগ্রামের গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে না চেনে এমন লোক বোধ হয় পরগণার চারিধারে নাই। গোবিন্দবাবু নিজে প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার না হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বটে। তাঁহার প্রপিতামহ এক নিলকর সাহেবের মুৎসুদ্দি ছিলেন তিনি বহু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পিতামহের আমলে তাহা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতার সময় সুরা দেবীর আবির্ভাবে স ল সম্পত্তিরই পাখা গজাইল কেবল গজাইল না ভদ্রাসন খানির। গোবিন্দবাবু যখন অল্পবয়স্ক তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, কিন্তু গোবিন্দবাবুর স্বাবলম্বন গুণে সমস্ত বাধা বিঘ্ন এড়াইয়া বেশ দুপয়সা করিয়াছেন—ভাগ্যলক্ষ্মী আবার কনকগ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবারের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। যখন কৈলাস ঘটক এক সম্বন্ধ লইয়া হাজির হইল তখন তাহা উপেক্ষার যোগ্য রহিল না।

৩

গোবিন্দবাবু পূর্ব্বে এক বিলাতী কোম্পানীর অধীনে কণ্ট্রাক্টরী করিতেন, পরে ধীরে ধীরে সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিয়া এখন বাড়ীতে আছেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র সে কলিকাতায় এফ্‌ এ, পড়ে, আর তিনটি কন্যা। দুইটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে—একটির

সত্য সত্যই পুরুষাকারে মেয়ে মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন তখন গোবিন্দ বাবুর পৌরুষটুকু ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তাই সে দিন যখন কৈলাস ঘটক এক সম্বন্ধ লইয়া হাজির হইল তখন তাহা উপেক্ষার উপায় রহিল না।

৪

কৈলাস ঘটক গোবিন্দবাবুকে ছেলের প্রসঙ্গে বলিলেন যে ছেলে কলেজে বড় বড় ইংরেজী বহি পড়িয়া থাকে। ঘটকের কথা শুনিয়া গিন্নির পরামর্শ লইয়া গোবিন্দবাবু ছেলে দেখিয়া পাকাপাকি ঠিক্ করিতে কনকপুরে চলিয়া গেলেন। ছেলে দেখিয়া গোবিন্দবাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সমস্ত ঠিক্ হইলে গৌরহরি বাবু বলিলেন "মশায়, আমার একটী অনুরোধ—বিবাহটা আমাদের বাড়ীতে হউক। আমার বৃদ্ধ মাতার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি বিমলচন্দ্রের বিবাহ দেখেন।" "তাতে ক্ষতি কি" বলিয়া গোবিন্দবাবু সে কথায় সায় দিলেন।

৫

ভাদ্রমাস। কনকপুরের গৌরহরি বাবুর বাগানের শেফালি ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া জোৎস্না ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুমধুর সানাইয়ের তান মৃদু মৃদু দক্ষিনা বাতাসে ঢেউ তুলিয়া এক সপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া বিমলচন্দ্রের বিবাহ ঘোষণা করিতেছে। লগ্ন উপস্থিত। জামাই বিবাহ সভায় আসিল। কিন্তু একি! "অমল কোথায়?" গোবিন্দ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "অমল কোথায়?" বর পক্ষ সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া গোবিন্দ বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল বলিলেন "আমি যাহাকে দেখিয়াছি সে ত এ নহে। কি ভয়ানক জাল!" আবার হাসির রোল পড়িয়া গেল। গৌরহরি বাবু প্রথমতঃ গোবিন্দ বাবুর মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা বলিয়া এই সকল অভদ্রোচিত ব্যবহার হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পরে দুই পক্ষে বচসা আরম্ভ হইল। গোবিন্দ বাবুর শ্যালক হীরেন বাবুর সঙ্গে বর

৬

গোল থামিয়া গেল। গোবিন্দ বাবু কন্যা বিবাহ দিবেন না বলিয়া মনস্থ করিলেন। গৌরহরি বাবু গোবিন্দ বাবুর ন্যায় ছোটলোককে আর মুহূর্ত্তেক বাড়ীতে তিষ্ঠিতে দিবেন না বলিলেন। এমন সময় গোবিন্দ বাবুর পুত্র সুবোধ তাহার সহপাঠি ভুবনকে এককোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। ভুবনদের বাড়ী সেই গ্রামেই। ভুবনেরা খুব বড়লোক বলিয়া সেই গ্রামের সকলেই বলিয়া থাকে। সুধীর ভুবনকে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল এবং ইহা ও বুঝাইয়া দিল যে যদি দুই এক দিনের মধ্যে তাহার বোনের বিবাহ না হয় তবে তাহাদের সমাজ চ্যুত হইতে হইবে। "চিন্তা করিও না" বলিয়া ভুবন তাহার বৌদিদির নিকট যাইয়া বলিলেন "বউদি," আজ আমার বিয়ে তুমি দাদাকে না বলিলে ত আর হয় না। "ইহা বলিয়া ভুবন সমস্ত ব্যাপার বৌদিদির নিকট খুলিয়া বলিল। ভুবনের পিতামাতা কেহই সংসারে ছিল না কেবল মাত্র দাদা ও বৌদিদির স্নেহেই সে পালিত।

৭

ভুবনের দাদা সম্মত হইলেন। এক রাত্রির মধ্যে যাহা যাহা হইতে পারে তাহা ঠিক্ হইয়া গেল। গোবিন্দ বাবু এই অযাচিত বিবাহ প্রস্তাবে যেন অকূল সাগরে কূল পাইলেন। ভুবনের মতো জামাই তাঁহার হইবে এই চিন্তায় তিনি যার পর নাই চিন্তিত হইলেন। এক রাত্রির মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। ভুবন বৌদিদিকে হাসিয়া বলিল "বৌদি,' আজ এক নভেলী বিয়ে হয়ে গেল না ?"

——— শ্রীরঞ্জিন চন্দ্র হালদার।

গ্রন্থ ও মাসিকপত্রের সমালোচনা।

মায়াচিত্র—শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আট আনা। ইহার ভাষা 'শুক্লা' অপেক্ষা কম কঠোর ও গদ্যময়তাপূর্ণ (Prsaic) কিন্তু 'শুক্লা'র মধ্যে যে সমুদয় মূল্যবান্ ও কবিত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ইহার মধ্যে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। 'শুক্লা' অপেক্ষা মায়াচিত্রের গভীরতা বেশী। ইহার ঘটনাবলীর ভিতরে অন্তরতর গূঢ় ভাব আছে। কবি, চিত্রখানির সময়ে সময়ে অস্পষ্টতা ও সুস্পষ্টতাদ্বারা অবস্থাভেদে মানসিকভাবের বাস্তব (Objective) বিকাশ প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কাব্যখানার প্রকৃত অর্থ অনেকের নিকটই দুর্ব্বোধ্য হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে যথেষ্ট কলানৈপুণ্য থাকা সত্ত্বে ও Plan এর তুলনায় Execution হীন হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—চৈত্র সংখ্যায় প্রায় প্রত্যেকটী প্রবন্ধই খুব ভাল লাগিল। চরিত্রচিত্র, নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা, মানবের জন্মকথা, মুগ্ধা এই কয়টী সবচেয়ে বেশী ভাল লাগিয়াছে বলিতে পারি না। "জবরদস্তীর লেখাপড়া" সম্বন্ধে বিপিনবাবুর সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস এক কারণই অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। "জবরদস্তীর লেখাপড়া বিলাতে লোককে স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং যাহা বিলাতে ক্ষুদ্রস্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিতে প্রণোদিত করিয়াছে তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়িয়া বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থের নিকট ক্ষুদ্রস্বার্থকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিবে। কতকটা শিক্ষার প্রকারের উপর ও নির্ভর করে কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা লওয়া সম্ভব ও সহজ। সুতরাং শুধু এই বিষয়টীই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

বীরভূমি (ফাল্গুন)—প্রায় সবগুলি প্রবন্ধই ...

উইল ও চোখের বা'লী এই কয়টী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধটী "কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেথ'' উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে। আমরা এজন্য চারু বাবুকে অভিনন্দন করিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—বড়লাট বাহাদুর ঢাকাতে ছাত্রাবাস সংযুক্ত এবং শিক্ষাপ্রধান এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশে যত শিক্ষা বিস্তার হয় ততই ভাল কিন্তু যাহা অধিকতর আবশ্যকীয় তাহাতেই সর্ব্বাগ্রে অর্থ ও উদ্যম ব্যয়িত হওয়া উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে যে সমুদায় নূতন সুযোগ উপস্থিত হইবে মনে করিয়া কেহ কেহ উহার সমর্থন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ নূতন নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস সংযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলা যায় এবং যদিও ইহা নিম্নতর শিক্ষার ভার বিভিন্ন কলেজের উপর অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তথাপি এম, এ ও আইন শিক্ষা অংশিকরূপ নিজেই পরিচালন করিতেছে। এখন দেশে সূক্ষ্ম ও শ্রমশিল্প শিক্ষার (Art and indastry) ব্যবসাবানিজ্য শিক্ষার (Business manage ment), ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ও উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ দরকার সুতরাং এই সমুদায় বিষয়ের গবর্ণমেন্টের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটী নষ্ট হইবার পথে আসিয়াছে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া ঐ কলেজটী সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করা উচিত পূর্ব্বালিখিত প্রত্যেক বিষয়ে এক একটী আদর্শ কলেজ স্থাপন করা উচিত। London polytechuie institute এর ন্যায় একটী Institute কলিকাতায় অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অপেক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী কখনই বেশী হইতে পারে না। আশা করি লর্ড কার্মাইকেল এ এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিবেন।

শ্রীপ্রাণশঙ্কর সেনগুপ্ত এম, এ।

স্বর্গীয় মহাত্মা ষ্টেড্।

প্রীতি

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ [২য় সংখ্যা।

অস্ফুট।

তটিনীর কলগান নাচিয়া নাচিয়া
অস্ফুটেরে চাহিছে ফুটাতে,
মাটির পিঞ্জরে সিন্ধু ফুলিয়া ফুলিয়া
যাহা চায় পারেনা বুঝাতে।
যুগ যুগ ধরি তারা আকাশে বসিয়া
কি জানি কি পোষিছে অন্তরে,
আঁধারের কোলে মগ্ন আলোকের ধ্যানে,
তবু তাহা ফুটিছে না স্বরে।
অরণ্যের মর্ম্মকথা শ্বসিয়া শ্বসিয়া
মর্ম্মরেতে খুলি যেতে চায়,
শাখায় পল্লবে ফুলে আকুল কাকুলি
কাঁদে প্রকাশের বেদনায়।
দুঃখসুখ আলো ছায়া জন্ম মৃত্যু আর
একই কথা চাহে বলিবারে,
স্নেহে প্রেমে নরনারী মিলন-লীলায়
একই কথা চাহে ফুটিবারে।

সেই সে বারতা মুখে খুলিয়া বলিতে
যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত গঙ্গা বহে,
তারি লাগি ধরণীর নরনারী মেলা
সুখে ভাসে দুঃখদৈন্য সহে।
সে'কথা হইলে বলা মনে হয় সব
মুহূর্ত্তেকে বলা হয়ে যায়,
সে কথা হলোনা বলা চরাচর তাই
রহস্যেতে মগ্ন আছে হায়!

১৩১৪। শ্রীসুখরঞ্জন রায় বি, এ।

অক্ষর বিভীষিকা।

চুঁচুড়া সহরে বংগীয় সাহিত্য সম্মিলনের
পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত)

আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার। তবু বলি, যদি দয়াময় ভারত-সম্রাট আরও একটি 'করনেশন বুন' দিয়া বাংগালী প্রজাদের বলেন, "তোমরা 'স্বরযুক্ত'-বাবু কে জি গুপ্তকে গবর্ণর লইয়া খাঁটি বাংলা ভাষায় যুক্ত-বংগের সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালন কর" তাহা হইলে বিষম মুসকিল ; এক দম সব কাজ বন্ধ।* কারণ ইংরাজ বাহাদুর হইতে অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার লাইসেন না পাইলে বাংলায় টেলিগ্রাফ চালানো দুঃসাধ্য হইবে। আর তারের খবরই যদি না চলে, তবে রেলর গাড়ীও অচল। কাজেই ডাকঘরের কাজও প্রায় বন্ধ। সুতরাং সভ্যতা রূপ ঘড়ীর কাঁটা পেছনদিকে ফিরাইয়া ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তক সের শাহের আমল হইতে পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়।

বিন্দু বিসর্গ উপসর্গাদি লইয়া এবং এক 'ব' কে দুইবার গুণিয়া আমাদের মৌলিক বর্ণই পঞ্চাশের উপর। তা ছাড়া, মূল হইতে

---

* ন্ধ এই যুক্ত অক্ষরে ধ বিকৃত। বিকার দশাগ্রস্ত হরপের প্রতি সকলের বিশেষ

সুদূর শাখা প্রশাখায় অনেকটা কাণ্ডাকাণ্ড-সম্‌ন্‌ধ-বিহীন কত বহুরূপী যৌগিক বর্ণ আছে তাহা অনেকেরই ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। মিশ্রবর্ণের মধ্যে য-র-ল-ব ফলা যুক্ত গুলি আমাদের বিশেষ পরিচিত। এই য-র-ল-ব দের একটি সহচর আছে, সেটি হ। য র ল ব হ পরে থাকিলে যে একটা রসায়নিক কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয় তাহা যাঁহাদের মনে ব্যাকরণের সন্‌ধি-সূত্‌ জাগ্রত্‌ আছে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন। বস্তুতঃ, অন্তঃস্‌থ বর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় 'হ' ও একটি ফলার বর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই "হ-য ব-র-ল" গোষ্ঠির আদি ও প্রধান হ ফলাটা ঋষিদের চোখেও ধূলি দিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ গুলি হ-ফলা যুক্ত বই আর কিছুই নয়। ক্‌হ=খ, গ্‌হ=ঘ ইত্যাদি। শুনিতেছি, বাংলায় গ্রামোফোনের আশাতিরিক্‌ত কাট্‌তি দেখিয়া টাইপ-রাইটারপ্রচলনপ্রয়াসী কোম্‌পানিগণ হ এর এই ছদ্মবেশ ধরাইয়া দিবার জন্য সাহিত্য পরিষদের বড় কর্তাদের নিকট শীঘ্রই একটা সওলা পরামর্শ উপস্‌থিত করিবেন। কিন্তু 'হ' দমন করা সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। এ পর্য্যন্ত ইহার পদে ু ৃ (উকার, ঋকার) শৃঙ্খল কিছুতেই পরানো যাইতে পারা যায় নাই। দূর হইতে ভয়ে ভয়ে অতি 'সন্তর্পণে' শেকল ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু নিক্‌ষিপ্ত শেকল উহার, হয় মাথায়, না হয় পিঠে ঠেকিয়াছে; পায়ে পঁহুছায় নাই। যথা, হুমায়ুন, হৃষীকেশ। আবার অন্যদিকে দেখুন, দন্ত্য স ও দন্ত্য ন এর দন্তের দংশনে কিংবা পদাঘাতে থরথরি কম্পমান থ বেচারীর যে প্রকার অংগ হানি ঘটিয়াছে তাহাতে এস্থলে থ কে চেনাই দায়; হ ফলা বলিয়া ভ্রম

দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য অনন্যোপায় হইয়া ঐরূপ মুদ্রিত হইল। টাইপ ফাউণ্ডারগণ "প্রকৃত" রূপ উদ্ভাবন করিবেন। ত্‌, ঞ্‌চ, স্‌থ, হ্‌ম ইত্যাদির পক্ষেও এই মন্তব্য.

দেবনাগর যুক্ত অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখিবেন তাহাতে একটি আর একটির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন্মৃত বা বিকলাঙ্গ হয় নাই। সংস্কৃত বর্ণ বিকৃত নহে, প্রত্যেক বর্ণেরই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তবে বলিতে বাধ্য, সংস্কৃত 'ক্ষ' টি

হয়। এটিও হ এর নষ্টামি। সংস্কৃত গ্রন্থে "থ" এর বেশ সুন্দর অবয়ব দৃষ্ট হয়.

সুখের বিষয়, বংগভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম নেতা সুপংডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বাংলা হরপের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর সাহায্যের জন্য কতিপয় টাইপ ফাউণ্ড্রারও মনোযোগের সহিত হস্তসংযোগ করিয়াছেন। যে সব মিশ্র বর্ণের জটিল অবয়ব দুর্ব্বোধ্য অথবা যেগুলির বর্তমান রূপ অসংগত, কারিকরগণ তাহাদের সুখবোধ্য সরল ও সহজ কলেবর দিউন। 'কুদ্দালকে কোদাল বলা'র ন্যায় 'ক্র' কে 'ক্‌্র' লেখাই উচিত.

দেবনাগর বিধান মতে 'ক' এ র-ফলা দিয়া সোজাসুজি রকমে ক্‌্র গড়াই নিয়ম। সংস্কৃত 'ক্‌্র' (ক্র) দেহের একটি অস্পষ্ট ছায়ার ফটোগ্রাফ হইতে বাংলা 'ক্র' এর জন্ম। ইহাতে সবই আছে, কেবল ক এবং র নাই.

এখনকার উন্নতির দিনে টাইপের সংখ্যা কমাইলে নানাদিকে শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত। যাঁহারা প্রেসের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন বাংলা ছাপার কাজে কত ঝঞ্ঝাট। কম্পোজিটারকে অর্দ্ধ সহস্রাধিক খোপ হাতড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। পরন্তু দুই লাইনের ভিতর বেশী করিয়া লেড না দিলে ি ী ৗ গুলি আস্ত রাখা দায়। সংযুক্ত হরপের ষ্টকও বেশী রাখা অনেকের দুঃসাধ্য। আমাদের নামের মধ্যে মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, নরেন্দ্র চন্দ্রের এত বাড়াবাড়ি যে যখন সাপ্তাহিক খবরের কাগজওয়ালারা এণ্টেনেস্ (মাতৃকুলাশন ?) পরীক্ষার পাশের তালিকা ছাপেন তখন ইন্দ্র চন্দ্র উধাও হইয়া নিরাকার হইতে বাধ্য হন। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই জানেন না আকার ও একারের যুগল বেশ। যথা, া া এবং ে ে। এক সাজ ঘরের ভিতর, আর এক পোষাক ঘরের বাহিরে। মাত্রা বা কার্ণিশ যুক্তগুলি শব্দের ভিতরে, এবং মাত্রাবিহীন ে শব্দের প্রথমে ও া অন্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার মনে হয় হরপ কমাইবার চেষ্টায় প্রথমে মাত্রাবিহীন ে া কে এই দণ্ডেই জবাব

খণ্ড ত (ৎ) আমাদের অনর্থক নূতন সর্জ্জন। দেবনাগরে নাই। ইহাকেও এখনি বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে। ৎ "পুসির গায়" ছিল, উহা পুসির গায়েই থাক্। কেবল এক ত এর জন্য বিশেষভাবে হসন্ত বন্দোবস্ত কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তলিপিতে ৎ এর ব্যবহার নাই। তিনি স্বহস্তে লিখিতেন ত্। তাঁহার অনুস্বার ও সংস্কৃতানুযায়ী ০ এইরূপ। অনুস্বারের অকারান্ত উচ্চারণ নাই, সুতরাং হসন্ত চিহ্ন দিয়া ং গঠন 'হনুকরণ' হইয়াছে। চন্দ্রবিন্দু উঠাইয়া দিলে হরপ অনেক কমিতে পারে। 'চাঁদ' না ছাপিয়া 'চংাদ' ছাপিলে, দেখিতে দেখিতে চোখে সহিয়া যাইবে। হরফ কমাইতে হইলে আর্ক ফলা টাকেও মাথা হইতে কংাধে নামান উচিতং

দেবনাগরে য ফলা অতি প্রকট। বাংলায় তাহার পেছন দিকটার ছায়া। বিদ্যা অবিদ্যা, ন্যায় অন্যায়, দৃশ্য অদৃশ্য, সহ্য অসহ্য প্রভৃতি মুদ্রিত শব্দে য ফলার খাম-খেয়ালি উল্লেখ যোগ্য। কেহ ছাপেন "উদ্যোগ", আবার কেহ কেহ উচ্চারণের প্রতি নজর রাখিয়া ছাপেন "উদযোগ"। যখন দেখি 'অল্প' তখন তাহার পাশেই দেখি 'গল্প'। যখন দেখি ষ এবং ট শিষ্টভাবে একাসনে উপবিষ্ট, আবার তখনই দেখিতে পাই ষ ও ট পরস্পর বিষম জড়াজড়ি করিয়া 'বৃষ্টি'তে 'কষ্ট' পাইতেছে। ঐ প্রকার পর্ব্ব ও পূর্ব্ব। হায়, ছাপাখানার ভূত এতদিনে হরপ ঢালাই কারখানাতেও প্রবেশ লাভ করিল.

সমশ্রেণী হরপগুলির মধ্যে একীভাব নাই। এক উকারের কত রূপ দেখুন। গু, শু, হু, দু, সু, সু, রু, রূ। ইহাদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। দুঃখের বিষয়, শিশু-শিক্ষার রু ও খু এর পরিচয় দিয়া তত্‌ দণ্ডেই বিনা introduction এ "শু" এর সংগে আন্তরিকতা বিহীন আলাপ করিতে দেওয়া হয়। অতঃপর গুপ্তকে গুপু পড়িলে কিংবা পশুকে পশ্ত পাঠ করিলে, কেবল অষ্টাবক্র "শুরু" মহাশয় ব্যতীত আর কেহই বোধ হয় অপোগণ্ডের গণ্ডে চপেটাঘাত অনুমোদন করিবেন না। বস্তু কিন্তু রুদ্র, ক্রুত অশ্রু শ্মশ্রু

যথাস্থানে ু উকার দিয়া 'ত্রুটি' লিখিলে যদি অপরাধ হয়, তবে দীর্ঘ-উকার-যুক্ত 'অক্রূর এ সে অপরাধ হয় না কেন? সংস্কৃত উকার চিহ্ন অনেকটা মাত্রাহীন ত এর মত। জীবন্ত ভাষায় আসিয়া আলস্য ভংগের চেষ্টায় উহা বাংলাতে অনেকটা ঋজুভাব ধারণ করিয়াছে' পুনরায় উহার কুকুর-লেজত্ব বা বক্রভাব ভাল নয়।

'শ্রীহট্টের ভট্টাচার্য্য,' 'মক্কা' 'দিল্লির লাড্ডু,' 'ভগবচ্চরণ দত্ত' প্রভৃতি বাক্যে হরেক রকমারি ডবল হরপ লক্ষ্য করিবার বিষয়। একীভাবের অভাব। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কিছু পূর্ব্বে ইংরাজীতেও ডবল s (ss) এর বিসদৃশ অবয়ব ছিল। তাহা ছিল একটি বর্জ্জিত বিধির মত। তবে, দ্রুত কমপোজিশনের জন্য fi, ffi, fl, ffl,কয়েকটি মিশ্র গঠন এখনও চলিত আছে। আমাদের মধ্যেও 'করিয়াছে, গিয়াছে' ইত্যাদির "য়াছে" ও করিবেন, যাইবেন প্রভৃতির "বেন" এবং দ্রুত শব্দ গ্রন্থনের সহায়তা কল্পে অন্যান্য মিশ্র-গঠন যাহা আবশ্যক হয় (যথা শ্রী) তাহা টাইপ ফাউণ্ডারগণ এক বডিতে ঢালাই করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি নাই। যাহাই গড়ুন, সহজ অবয়ব দিতে হইবে, কিম্ভূত-কিমাকার বিভীষণ গড়িবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ; কোথায় রহিল ক, কোথায় ষ, উহাদের একটিরও সত্তা নাই, অথচ দেখি দশ-মুণ্ড কুড়ি-হাত বিশিষ্ট ক্ষ। ক আর ষ যুগপত্ উচ্চারণের প্রথা নাই, তবু জোর-জবরদস্তি করিয়া আমদানি করিতেছি, সেক্ষপীয়র, মোক্ষমুলর। কিন্তু পালোয়ান খোদাবক্সের কাছে এই জোরজবরদস্তি খাটে না।

ক আর ষ কে আস্ত ভক্ষণ করিয়া ক্ষ রাক্ষস বসিবার চেয়ার ম-ফলাখানিকেও গ্রাস করিতে উদ্যত! এই জন্যই লছমনকে সংগে লইয়া লছমী বংগদেশ হইতে বাল্মীকির দেশে চলিয়া গিয়াছেন.

এখানেই বলিয়া রাখি যে বাংলায় অনেক স্থলে উচ্চ বর্ণের চাপে পড়িয়া নীচ বর্ণের মাথা তুলিয়া কথা কহিবার শক্তি নাই। এই দেখুন, দন্ত্য স ও দ এর চাপে পড়িয়া বেচারী 'ম' কেমন লা-চার ও লা-জওয়াব (silent)! যথা ভস্ম, পদ্ম ইত্যাদি। Elevation

of the depressed classes যদি করিতে হয়, তবে 'ভস্মে' পতিত মুচীদের আদি বর্ণ 'ম' হইতে সুরু করিয়া 'ভসম' ছাপাই উচিত। হিন্দু-(পীঠ)স্থানে ঐ রকম উচ্চারণ। আসামেও 'পদ্ম'কে পদুম ফুল বলে। সেই প্রকার বোধ হয় 'সদ্ ব্যবহার,, লেখাই ভাল। নতুবা 'সদ্ব্যবহারের' প্রতি ছেলেরা শিশুকাল হইতেই 'বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতে পারে। সেইরূপ 'উদ্যোগ', উদ্যোগ নহে.

হ আর ম, দুইয়ে মিলে হ্ম। স্বয়ং ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণের উপাদান। সুতরাং প্রণব ওঁ এর ন্যায় 'হ্ম' তেও বোধ হয় একটা গুপ্ত বীজমন্ত্র নিহিত আছে। নতুবা শুধু 'হ' আর 'ম'তে অমন নয়নাভিরাম মনোগ্রাম তৈয়ারি হয় না। এই জন্যই বোধ হয় "আহ্‌মদ" নামের প্রচলিত বানানে বীজমন্ত্র দিতে নাই; কেবল হ আর ম দিয়াই কাজ সারিতে হয়.

জ্ঞ এর বাঁ দিকটা এবং ঞ এর ডান দিকটা লইয়া জ্ঞ। "জ্ঞানাত্ (বা গানাত্) পরতরং নহি।" অর্থাৎ এই নশ্বর সংসারে জ্ঞান বা গান (গীতবাদ্য) হইতে বড় কিছুই নয়। এই 'গেয়ান' আজকাল ভূ ভারতের অনেকেই বিলাতের অরগ্যান কিনিয়া শিখিতেছেন। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ সাহেবেরা জ্ঞ এর মর্ম্ম ঠিক বুঝলেন না। তাই সম্প্রতি সরকার বাহাদুর সরাসরি ভাবে আদেশ জারী করিয়া দিয়াছেন যে যাহাদের নাম জ্ঞান বা জ্ঞানেন্দ্র, তথৈবচ আর কিছু তাহাদিগকে অতঃপর Jnan, বা Jnanendra না লিখিয়া বিনা ওজরে Gyan অভ্যাস করিতে হইবে; (Vide সিবিল লিষ্ট).

ঙ এর আর সে দিন নাই। সরস্বতী-তীরে বেদগানের দিন চলিয়া গিয়াছে। লয়-ভীত ঌঙ, লৃঙ লকার-গুলি টোলে আশ্রয় লইয়াছে। ঙ এখন জরাগ্রস্ত, সুতরাং অকেজো। স্ববর্গের গায়ে ভর না দিয়া ইনি মোটেই দাঁড়াইতে পারেন না। গ ইহাঁর প্রধান ভৃত্য। গ এর সঙ্গ না পাইলে একদণ্ডও চলে না। অথচ ইনি গ এর অঙ্গে চাপিলে গ বেচারীর সশরীরেই গঙ্গালাভ। তখন অনুবীক্ষণের সাহায্যেও গ কে

তখন জীবাত্মা উড়িয়া যায়, থাকে কেবল স্থূল দেহ। তাও কি যেমন তেমন স্থূলদেহ? টিকি-কাটা দীর্ঘ ঈ ন্যায় বিরাট-বপু! কোথায় ঙ আর গ, আর কোথায় ঈ! 'শৃঙ্খলা', 'লঙ্ঘন' যদি সহ্য হয়, তবে গা-ঘেসা 'ঙ্গ' কেও অনায়াসে বরদাস্ত করা যাইতে পারে। দেবনাগরে ঙ এর অধীনে গ কায়-ক্লেশে আত্মাকে সতত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; অঙ্গ ভঙ্গ হয় নাই.

ঞ ঙ এর ছোট ভাই। তত স্থবির হন নাই। কএক বৎসর পূর্ব্বে ইনি হিন্দুদের 'গোসাঞি' ঘর হইতে সুদূর মুসলমানদের 'মিঞা' বাড়ী পর্য্যন্ত একাকী পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, বাহন বা বাহক আবশ্যক হইত না। ঞ এখন চঞ্চলার অঞ্চল গ্রহণ করিয়া চ কে বঞ্চনা করিতেছেন। ইহাঁর আওতায় পড়িয়া চ কে চর্ম্ম-চক্ষে চেনা ভার। 'যাজ্ঞা'য় যদি মান না যায়, 'ঝঞ্ঝাবাতের' 'ঝঞ্ঝাট' যদি সহিতে পারি, তবে স্পষ্টাস্পষ্টি ঞ এর তলায় চ কে মাথা হেট করিয়া চরণ ধূলি লওয়াইতে লজ্জা কি? প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকেও শেষ কথিত রূপ হরপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনাগরেও তাই, (ঞ্চ).

ঞ বোধহয় তাঁহার পিঠের পরম-ধন মাঝে মাঝে ণ এর হেপাজতে রাখিয়া দেন। তাই আমাদের 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু' দর্শন লাভ। সুখের বিষয়, দেবনাগর শ্রীকৃ'ষ্ণে' ণএর এই 'নিপঃ কপট' ভাব নাই; প্রকট ভাবেই বিরাজমান, যথা ষ্ণ.

সাহেবেরা তিন চারি জন রাস্তায় একত্র ভ্রমণে বাহির হইলে সকলে সমভাবে পাশাপাশি এক কাতারে যাইয়া থাকেন। আর এদেশীয়গণ একজনের পাছে অন্য জন, তৎ পশ্চাতে আর এক জন ইত্যাদি ক্রমে গমন করেন। এই যাত্রা-পদ্ধতির নাম Indian file. বর্ণ যোজনায়ও এই জাতীয়ত্বের ছাপ দেদীপ্যমান। আমাদের দেশে সাম্যভাব কম, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বেশী। ইংরাজীতে, এক বর্ণের পর দক্ষিণে আর একটি, তার পর দক্ষিণে আর একটি

বাংলায় অধোগতি। যথা ; সান্ত্বনা, উর্দ্ধ, স্ক্রু (screw) ইত্যাদি।

চীনদেশে এই অধঃস্রোত ভয়ানক বেগময়। ভগবান চীনকে রক্ষা করুন। পারস্যে বামা গতি। বামা গতির ফলও ভাল বোধ হইতেছে না.

আমাদের হরপের গা-ঘেসা ইয়ারী বা সাম্যভাবও আছে। যথা, আহ্লাদ, আহ্বান ধ্বনি, বাগ্দান, লঙ্ঘন, উড্ডীন, খড়্গ, মুদ্গর, উদ্ঘাটন, আনন্দ, পশ্চিম. ইত্যাদি। এগুলি বেশ সুখদর্শন। 'উচ্চ নীচ' জাতীয়দের মধ্যে প্রফুল্ল, বিল্ব, যত্ন, ঝঞ্ঝা, উদ্ভিদ এগুলিও সুখ-বোধ্য। ইহাদের চেহারা অবিকৃত বলিয়া শিশুরা অনায়াসে বানন বলিতে পারে। এস্থলে দেশী বিদেশী শিক্ষার্থীদের মিছামিছি সময় অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই কিন্তু "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গুপ্ত, কায়স্থ, দত্ত, মিত্র" জাতীয়দের বানান শিক্ষা বড়ই বিভীষিকাময়। স্বরবর্ণের উপর রেফ টানা যাইতে পারে, তাহা নৈঋর্ত শব্দ দেখিয়া জানিয়াছি। কিন্তু স্বরবর্ণের "ও" এবং "এ"র উপর মাত্রা টানিয়া 'দত্ত, মিত্র' বানান হয় তাহা শিশুদের মুখে শুনিতে বাকী ছিল। হায়, সেই মানসে অনূদিত বাসনাটি গত—তারিখে পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই এই অতি সামান্য প্রবন্ধটি লেখা। গুরু গম্ভীর সাহিত্যিকেরা তুচ্ছ ভাবিয়া ক্র ত্ত ক্র ক্ষ গুলার প্রতি আর উদাসীন থাকিবেন না। 'অট্টালিকা' বিরোধী অথচ 'গড্ডালিকা' প্রেমিক হরপের কর্তাগণ আর কতকাল প্রবাহে গা ঢালিবেন ?

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, বি, এ, এম্, আর, এ এস্।

পরলোকগত মিঃ ষ্টেড্।

"One who never turned his back, but marched breast forward,

Never doubted clouds would break

Never dreamed. though Right were worsted,

Wrong would triumph."

Robert Browning.

দেবত্ব ও পশুত্ব লইয়া মানব প্রকৃতি গঠিত। কঠোর শিক্ষা এবং সংযম দ্বারা পশুত্বের সম্যক উচ্ছেদ সাধন না করিলে মানব কখনও তাঁহার উচ্চ ও ঐশ্বরিক মনোবৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি সাধন করিতে সমর্থ হয় না—কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন হইতে সক্ষম হয় না। অপর পক্ষে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইলেই দেবত্বের উন্মেষ হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র সাধারণ মানবের মধ্যে একজন হইয়াও যিনি মনুষ্যত্বগৌরবে গরীয়ান তিনিই যথার্থ মহাপুরুষ, দেবত্বে শুধু তাঁহারই অধিকার—এজগতে তিনিই পূজ্য এবং বরণীয়। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহা যথেষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রেণীর মানব সংসারে সুদুর্লভ না হইলেও একান্ত বিরল। তাই, যখন প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এমনি একটী মহাপ্রাণমানব সহসা ধরাধাম হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়—নিষ্ঠুর মৃত্যু যখন মানব সমাজকে এইরূপ একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নে বঞ্চিত করে, তখন পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া হাহাকারধ্বনি উত্থিত হয়—সমগ্র বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

প্রবন্ধের শিরোভাগ যে মহাত্মার নামে অলঙ্কৃত—যাঁহার শুভ্র এবং সমুন্নত মহিমার ভাস্বরদীপ্তিতে জগতের শত শত নরনারীর প্রাণ বিস্ময় ও ভক্তির পূত আলোকরেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আজ

মরণে আজ আমরা এইরূপ শোক ও দুঃখ অনুভব করিতেছি। এই মরণশীল পার্থিব জগতে যে কিছুই অবিনশ্বর নহে, ধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব মনুষ্যও যে মৃত্যুর অধীন, এ ধ্রুব, কঠোর সত্যের নির্দ্দয়তা মানব প্রতিনিয়তই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে; কিন্তু তবুও যখন তাহার কোন প্রণয়াস্পদ বা প্রিয়ব্যক্তি কালের আহ্বানে মৃত্যুর চিররহস্যাবৃত সুদূর বিশ্বে চলিয়া যায়, তখন তাহার দুর্ব্বল হৃদয়খানি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে—প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনীয় নহে, এ জ্ঞান তখন তাহার প্রাণে বিন্দুমাত্রও শান্তি বা সান্ত্বনা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন একজন পুরুষ পুঙ্গবের অভাব স্মরণ করিয়া সমগ্র মানবজাতি যে দারুণ শোক অনুভব করে তাহার স্থায়ীত্ব এবং গভীরতা এই ব্যক্তিগত শোক অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। কণ্টক-কঙ্করময় বিপদ্-সঙ্কুল জীবনআহবে স্থৈর্য্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মহাত্মা ষ্টেড্ হাসিতে হাসিতে বিজয়ী বীরের ন্যায় দিব্য ধামে গমন করিয়াছেন—বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার অমর আত্মা আজ শান্তিময় আনন্দোজ্জ্বল রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে অক্ষম নহি; কিন্তু তথাপি যখনই আমাদের মনে হয় যে ভগবানের অকৃত্রিম সেবক, ন্যায় এবং সত্যের আদর্শ উপাসক, দুর্ব্বল ও পদদলিতের চিরবন্ধু মহানুভব ষ্টেড্ আর ইহজগতে নাই, তখনই শোক দুঃখ এবং নৈরাশ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে!

ইংলণ্ড স্বর্ণপ্রসূ। এই স্বাধীনতার পবিত্র লীলাভূমিতে যে সকল নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদিগের সমুজ্জ্বল গৌরবে শুধু ইংলণ্ড নয়—সমগ্র মানব জাতি গৌরবান্বিত—তাঁহাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশ আজ জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। "রিভিউ অব রিভিউজ" এর স্বনামধন্য বিশ্ব বিশ্রুত সম্পাদকের কর্ম্মময় জীবনী যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বিগত শতাব্দীতে আমাদিগের প্রতি ইংলণ্ডের

কার্য্যকুশলতা, দুর্দ্দমনীয় তেজ ও অদম্য উৎসাহ লইয়া তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিরল গুণরাশির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁহাকে যে অজেয় শক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা তিনি একনিষ্ঠ ভাবে মানবের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত ও উৎসর্গ করেন। জগতে ন্যায় ধর্ম্ম ও শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে নিরন্তর সংগ্রামই তাঁহার জীবনের একমাত্র মহাব্রত ছিল। এই পবিত্র সাধনার পথে পদে পদে তাঁহাকে শতসহস্র বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক বলে সে বীরহৃদয় বলীয়ান ছিল—সংঘর্ষ কখনও তাহাতে অবসাদের ছায়াপাৎ করিতে সমর্থ হইত না। পাপ ও অধর্ম্মের ক্ষণস্থায়ী প্রভাব এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহাকে ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই—পুণ্যের দৃশ্যতঃ পরাজয়ে উন্নতমনা স্থির সাধক একদিনের জন্যও নিরাশার অশ্রু বিমোচন করেন নাই। প্রতিকূল অবস্থা তাঁহার হৃদয়ে নবীন শক্তি, নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিত—আসন্ন বিপদের ঘনান্ধকারে তাঁহার চরিত্রের অসাধারণত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। ন্যায়ের বৈজয়ন্তীপতাকা হস্তে ধারণ করিয়া তিনি সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্র বাধা তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণে যে জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান ছিল, শত বিঘ্নও সে সজীব প্রবাহের অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে সমর্থ হইত না। আন্তরিকতা প্রসূত উৎসাহ এবং শক্তির ধ্বংস যে কখনও সম্ভবপর নহে, মহাত্মা ষ্টেডের জীবনী হইতে তাহা আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

মিঃ ষ্টেড্ বর্ত্তমান সময়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভাষা দাসীর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাকারিণী ছিল। ভাব-সম্পদেও তাঁহার সরস ও সুলিখিত প্রবন্ধাবলী অতুলনীয় ছিল। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না—তাঁহার ভাব ও ভাষার অনন্য

সাধারণ মৌলিকতার পরিচয় প্রদান এস্থানে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সংবাদ পত্রের অবাধ ও বহুল প্রচার যে জাতীয় উন্নতির পক্ষে একটী প্রধান সহায় তাহা ষ্টেড্ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি সংবাদ পত্র সম্পাদন ও পরিচালনার কার্য্যে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এই গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ পবিত্র ও মহান্ কর্ত্তব্য সাধনে ষ্টেডের অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দর্শন করিয়া পুলক ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন born journalist ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, বিচক্ষণ, স্বার্থত্যাগী ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন সম্পাদকের সংখ্যা পাশ্চাত্য জগতেও নিতান্ত অল্প। কেহ কেহ তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসম্পাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবিষয়ে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আমাদিগকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। সমগ্র মানবজাতির সুখ দুঃখ এবং অভাব অভিযোগ তাঁহার প্রাণে আন্তরিক ও জাগ্রত সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া দিত—জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন—তাই সর্ব্বদেশের ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে আপনাদিগের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায় বলিয়া বিবেচনা করিত। বিপদাপন্ন ও আর্ত্ত দুঃসময়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইত। তাঁহার মহাশক্তিশালী অক্লান্ত লেখনী যে শুধু ইংলণ্ড অথবা পাশ্চাত্যের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল এমন নহে, পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় দেশ ও জাতি সমভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। মহাত্মা ষ্টেডের রাজনৈতিক মতের এই অসাধারণ উদারতা তাঁহার বিশাল চরিত্রের আর একদিক সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি একজন নির্ভীক ও মহাতেজস্বী সম্পাদক ছিলেন। যিনি প্রকৃত বীর তিনি স্বীয় হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দ্বারা জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ষ্টেডের পক্ষে

একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য। প্রাণের পূর্ণতার সহিত যাহা তিনি বিবেক ও কর্ত্তব্যানুমোদিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা তিনি মেঘমন্দ্ররবে জগৎসমক্ষে প্রচার করিতেন এবং স্বীয় মতের আনুকূল্যে সারবান যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের ভুল সংশোধনকল্পে সচেষ্ট হইতেন। যাহা তাঁহার নিকট ন্যায় সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইত, শত সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তাহারই অনুগামী হইয়া চলিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর থাকিতেন। এ জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইত কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কোনও বিষয়ে স্বীয় স্বাধীন মত নির্ভীকভাবে সাধারণে গোচর করিবার অপরাধে একবার তাঁহার তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু রাজরোষ শত্রুর উপহাস বা স্নেহশীল বন্ধুর বিচ্ছেদ-আশঙ্কা—কিছুই তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। লাঞ্ছনা তাঁহার বাহুকে দ্বিগুণ বলশালী করিয়া তুলিত—তাঁহার নির্ভীক বীর হৃদয়ে কখনও আশঙ্কার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইত না। জগতের একটা স্থাপিত মত বা দেশাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইলে কতটুকু হৃদয়ের বল লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। রাজনীতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে মহামতি ষ্টেডকে এইরূপ শত শত স্থাপিত মত ও দেশাচারের সহিত জীবন-ব্যাপী সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক বন্ধু 'Light' নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ষ্টেড্‌কে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"No one ever took up so many unpopular causes." এই সংগ্রামে বিজয়ী বীরের গৌরবের প্রতি তাঁহার কতটুকু দাবী বা অধিকার আছে সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না ; কিন্তু ইহাতে যে ষ্টেড্ চরিত্রের একটা ভাগ সুস্পষ্টতম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই পাঠকগণকে দেখিতে অনুরোধ করি। সেটী আর কিছুই নহে—অদম্য নির্ভীকতা। তিনি ভয়শূণ্য ছিলেন ; জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত আহ্বানও সে বীর হৃদয় বিন্দুমাত্রও কম্পিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার স্বাতন্ত্র মহিমাদীপ্ত বীরত্বের নিকট স্থির অবশ্য-

কিন্তু একখানি অতি কোমল ও করুণ হৃদয় এই দুর্দ্দমণীয় তেজ ও নির্ভীকতার আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত ছিল। প্রকৃতই মহাত্মা ষ্টেডের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন তিনি সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতেন—দুর্ব্বল ও পীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যখন তিনি সবলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেন-তখন এই রণোন্মত্ত বলদৃপ্ত তেজস্বী সৈনিকের ভয়ঙ্কর কঠোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শত্রুহৃদয় আশঙ্কা এবং ভয়ে আকুল হইয়া উঠিত; রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র বিচরণ কালে ডিল্‌কি অথবা পার্ণেলের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মহাবলবান লোকপ্রিয় শত্রুকেও তিনি তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—তাঁহাদিগের পতনে একটুকু অনুকম্পাও প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যে হৃদয় কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে এইরূপে প্রস্তরবৎ নির্ম্মম হইয়া উঠিত, সেই হৃদয় হইতেই প্রীতি এবং সহানুভূতির পূতস্রোত নিঃসৃত হইয়া শতধারায় তপ্ত পৃথিবীর বক্ষে বর্ষিত হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনে তিনি যে সুখ শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার মূলে—স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি ষ্টেডের গভীর অকৃত্রিম, স্বার্থশূন্য ভালবাসা। কিন্তু তাঁহার ভালবাসা এমন ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না—তিনি তাঁহার মাতৃভূমির একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইংলণ্ডের পক্ষে প্রকৃতই শুভ এবং কল্যাণকর, এরূপ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কল্পে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহার দেশবাসীগণের যাহাতে ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয় তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দয়াও অনন্যসাধারণ ছিল—দয়া প্রণোদিত হইয়াই তিনি দুঃখী ও দারিদ্র্যক্লিষ্টকে মুক্তহস্তে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট অভাব জানাইলে তাঁহার করুণা উচ্ছসিত হইয়া উঠিত—তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অর্থ দান করিতেন। ইহাতে তাঁহার দয়া বহুবার অযোগ্যে প্রযুক্ত হইত—তাঁহার দান বহুবার অপাত্রে অর্পিত

নাই। অনেক সময় নিজেকে অভাবগ্রস্থ করিয়াও তিনি অপরের অভাব মোচন করিতেন। পরদুঃখকাতর ষ্টেডের দানশীলতা অস্মদ্দেশের দানবীর পূজনীয় বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও সুলেখক—যাঁহার সহিত অনেক বিষয়েই ষ্টেডের মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হইত—ষ্টেড্ চরিত্রের এই বিশেষত্বটির কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"He was generous in deed as well as in word; at a time when his own resource cannot have been very large, his purse was open to every appeal—*he had his regular pensioneers.*"* কিন্তু আর্ত্তের প্রতি এই জাগ্রত ও সজীব সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়নিহিত সার্ব্বজনীন মানব প্রেমের একটী উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অত্যাচার প্রপীড়িত অতিথির ক্রন্দনে তাঁহার প্রাণে সমবেদনার তান বাজিয়া উঠিত। অপরের দুঃখ দূর করিতে যাইয়া মহাপ্রাণ ষ্টেড্ কখনও জাতি বা ধর্ম্মের বিচার করেন নাই। তিনি মনুষ্যজাতিকে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন, তাই একদিকে স্বীয় দেশবাসী জনসাধরণের দৈন্য ও দুর্দ্দশা যেমন তাঁহাকে চঞ্চল এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত, অপরদিকে রুষিয়া বা ভারতবর্ষ আফ্রিকা বা তুরষ্কের প্রকৃত হিত সাধনের নিমিত্ত তিনি সর্ব্ব প্রকারে আপনার শক্তি ও উৎসাহ নিয়োজিত করিতেন।

উপরোক্ত গুণরাশি ব্যতীতও মহাত্মা ষ্টেডের চরিত্রে এমনই একটী বিশেষত্ব ছিল, যাহা আমাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ও মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লক্ষ তারকার একত্রীভূত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যেমন পৃথিবীর অন্ধকার আংশিকরূপেও দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় না, এই একটী অমূল্য সম্পদের অভাবে বিরল ও অসাধারণ সদ্‌গুণাবলীর অধীশ্বর মানবও তেমনি প্রকৃত মনুষ্যত্বগৌরব লাভে সক্ষম হয় না। বলা বাহুল্য আমরা এস্থলে ষ্টেডের গভীর ভগবৎ প্রেমের কথাই উল্লেখ করিতেছি। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রগাঢ়

* ... T. P. O'Connor

ভক্তি ইহাই তাঁহার মহান্ চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বিশেষত্ব। শিশুর সরল প্রাণ ও পূর্ণ সবল বিশ্বাস প্রাতকার্য্যেই তাঁহাকে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। স্বীয় দেহ, মন ও আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে তিনি ভগবানের চরণে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বস্তচিত্তে মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা ও আদেশ পালনই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এ মহাসত্য অক্ষরে অক্ষরে তিনি তাঁহার জীবনে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই ধ্রবজ্ঞানরূপ অক্ষয়কবচের অধিকারী মানবই উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষোভিত সংসার মহাসমুদ্রের ঘোর আবর্ত্তনে অভ্রভেদীগিরির ন্যায় অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ।

ন্যায় ও ধর্ম্মের চির অভয়দাতা অনন্তশক্তি, অনন্ত উৎসাহের অধীশ্বর বিশ্বনিয়ন্তার ঈঙ্গিতে বজ্রবহ্নিসমতেজে পৌরুষ গৌরবে মহাত্মা ষ্টেড সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাই ঝঞ্ঝাবাৎ, দামিনীস্ফুরণ, অশনিসম্পাত কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বিশ্বাসী ও প্রেমিক ষ্টেডের হৃদয়ে ভগবৎভক্তির যে মন্দাকিনীধারা পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইত তাহার অব্যক্ত, মধুর আনন্দ সঙ্গীতে তিনি বিভোর থাকিতেন, সংঘর্ষ বা পরাজয় প্রভৃত নৈরাশ্যের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না। ষ্টেডের গভীর ও অবিচলিত ভগবৎপ্রেমের সম্বন্ধে Miss Harper নাম্নী জনৈক বিদুষী ইংরাজমহিলা যাহা লিখিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহ এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম—

"The greatest and most loveable quality in his wonderfully loveable nature was his indescribably beautiful and touching submission to the will of the Heavenly Father to whom all his life and actions were constantly referred...*It was the absolute loving submission of a heart that has been immoveably anchored upon the Eternal and which knew itself to be ...*

*ways and at all times only for the love of humanity......
Once the will of God has been ascertained, all must be well, all is well, anyhow, anywhere. and for all time. So he was never weary of teaching and living. And so it is, we now know, with him."*

পরলোকগত মিঃ ষ্টেডের কর্ম্ম বহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এই অদ্বিতীয় কর্ম্মীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একাধিক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহা হইতে সংগৃহীত কয়েকটী প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই অক্ষম প্রবন্ধটীর উপসংহার করিব।

উইলিয়ম টমাস ষ্টেড্ ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। নর্দামবারল্যাণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত এমবিলিটন নামক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা ধর্ম্ম যাজকের কার্য্য করিতেন। ষ্টেডের জনক জননী উভয়েই নিরতিশয় ঈশ্বর ভক্তি পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে পিতামাতার যে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহা বুঝিতে পারিয়া ষ্টেড্ দম্পতী তাঁহাদের পুত্রকে সদাসর্ব্বদা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতেন এবং অল্প বয়স হইতেই যাহাতে বালক ষ্টেডের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য বিবিধ প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতে ক্রটী করিতেন না। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা স্বীয় পুত্রের মস্তিষ্ক উর্ব্বর করিবার নিমিত্ত মিঃ ষ্টেড্ আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না—যাহাতে সে সৎসাহসী সত্যবাদী ও ধর্ম্ম পরায়ণ হয়, তাহারই প্রতি তিনি সমধিক মনোযোগ করিতেন। বার বৎসর পর্য্যন্ত ষ্টেড্ তাঁহার পুত্রকে নিজের নিকট রাখিয়া লাটিন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা প্রদান করিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে বালক ষ্টেড্ ওয়েকফিল্ডের বিখ্যাত Silcoates স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি মাত্র দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর তখন তিনি দরিদ্রতা-নিবন্ধন স্কুল পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হইলেন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট পিতামাতার অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তখন বালক ষ্টেড্ চাকরীর অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে এক সওদাগরী আপিষে শিক্ষানবিশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সপ্তাহে ১৪ শিলিং করিয়া পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন। এই সামান্য সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া বীর যুবক অসীম সাহসে সংসার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। আপিসের দৈনিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে সময়টুকু পাইতেন তাহা নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া কাটাইতেন। প্রতিসপ্তাহে দুই পেন্স করিয়া তাঁহার উদ্বৃত্ত হইত। ইহাদ্বারা তিনি সেক্ষপীয়র, কার্লাইল ও অন্যান্য সুবিখ্যাত কবি এবং মনীষাসম্পন্ন দূরদর্শী চিন্তাশীল দার্শনিক দিগের গ্রন্থসকল সুলভে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে তিনি প্রদেশ হইতে প্রচলিত অনেক সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলীর মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য শীঘ্রই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তুলিল। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টেড Northern Echo নামক একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ঐই পত্রিকা খানি ডারলিংটন নামক স্থান হইতে প্রকাশিত হইত এবং ইহার একটু পশারপ্রতিপত্তিও ছিল। ষ্টেড যখন ইহার সম্পাদকপদে নিযুক্ত হইলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। আত্মশক্তির উপর তাঁহার কিরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিংশতিবর্ষবয়স্ক নবীন সম্পাদক অসাধারণ যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত তাঁহার সংবাদপত্রখানি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজস্ব লিখনভঙ্গী সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৮৭৬ খৃঃষ্টাব্দে এশিয়ার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশগুলির সহিত ইউরোপের যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল তাহা হইতে বিষম রাজনৈতিক সমস্যা উদ্ভূত হয়। মিঃ ষ্টেড তাঁহার

পত্রিকায় যুক্তি তর্কের সাহায্যে সেই সকল দুরূহ সমস্যার যে সুন্দর মীমাংসা নির্দ্দেশ করেন তাহা পাঠ করিয়া গ্লাডষ্টোনের ন্যায় বিচক্ষন রাজনৈতিকও আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই মহামতি গ্লাডষ্টোন মিঃ ষ্টেডকে একখানি প্রশংসা পরিপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন; উহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"I have read the articles with much admiration of the Public Spirit as well as the ability with which they are written. I wish that our whole Press was distinguished equally for its justice, heartiness and ability" ষ্টেডের ন্যায় তরুণ যুবকের পক্ষে এরূপ প্রশংসা সামান্য গৌরবের কথা নহে!

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ষ্টেড রাজধানী মহানগরী লণ্ডনে আগমন করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত লর্ড মরলী "পলমল গেজেট"এর সম্পাদক ছিলেন। লিখিবার শক্তি ষ্টেডের যে অসাধারণ, তাহা বহুপূর্ব্বেই মর্লী অবগত ছিলেন সুতরাং এক্ষণে তিনি তাঁহাকে স্বীয় সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। গেজেটের সহকারী সম্পাদক পদ প্রাপ্ত হইয়া ষ্টেড নবীন-উৎসাহের সহিত কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার যোগ্যতায় কাগজের কর্ত্তৃপক্ষ এতদূর বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মরলী যখন তাঁহার কার্য্যত্যাগ করিলেন, মিঃ ষ্টেড তখন সেই শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে এক মহাস্মরনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। মহাত্মা ষ্টেডের চরিত্রের প্রকৃত মহত্ব ইহাদ্বারা অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠক দেখিবেন কর্ত্তব্যপালনে ষ্টেড কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না—যাহা তিনি বিবেকানুমোদিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন

স্বীয় দেশবাসীর পক্ষে যে অনুষ্ঠান তাঁহার নিকট শুভ বলিয়া প্রতীয়মান হইত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আমিরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইত। অতি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য উপায়ে ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কোন অবিবাহিতা কুমারীর সহিত সাক্ষাত হইলে এই নারীরাক্ষসীগণ নানাপ্রকার মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ সুমধুর বাক্যদ্বারা তাঁহার প্রাণে বিশ্বাসের উদ্রেক করিয়া দিত এবং অবশেষে সামান্য কিছু অর্থের লোভে কোন ইন্দ্রিয়দুঃখপরায়ণ পশুপ্রকৃতির মানবের হস্তে সমর্পন করিত। সমাজের বক্ষ হইতে ঐ ভীষণ পাপ দূরীভূত করিবার জন্য ষ্টেড বদ্ধপরিকর হইলেন। জনসাধারণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি যাহাতে ইহার উপর পতিত হয় তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই ব্যাধির দ্বারা সমাজের যে মহাসর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, উপযুক্ত ও অকাট্য প্রমান ব্যতীত কে তাহা বিশ্বাস করিবে? সুতরাং ষ্টেড্‌ ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার নিজের একজন বালিকার প্রয়োজন এইরূপ ভাণ করিয়া তিনি একজন উপরোক্ত নিকৃষ্ট চরিত্রা রমণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উপযুক্ত অর্থের আশায় উৎফুল্ল হইয়া হতভাগিনী তৎক্ষণাৎ শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। চতুর্থ দিবসে এলিজা আর্ম্‌ষ্টর নাম্নী এক বালিকা ষ্টেডের নিকট প্রেরিতা হইল। ষ্টেড্‌ আর বিলম্ব করিলেন না—ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা যাহা অবগত হইয়াছিলেন তাহা তিনি সেই দিনই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও অতি বিশদ ভাবে “গেজেটে” প্রকাশিত করিয়া দিলেন। কিন্তু বিপদ সন্নিহিত হইল। বালিকাহরণে অপরের সহায়তা করার অপরাধে (?) ষ্টেড্‌ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইলেন—তাঁহার প্রাত তিন মাস কারাবাসের আজ্ঞা প্রচারিত হইল। হাসিতে হাসিতে তিনি জেল প্রবেশ করিলেন। এই লাঞ্ছনার জন্য তিনি জীবনে কোন দিন

দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যে অন্যায় শাস্তি তাঁহার ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বরং গৌরব অনুভব করিতেন। জেলে অবস্থান কালীন তাঁহার মনোগত ভাব কিরূপ হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশটী পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়,—"He (Mr. Stead) made to me the significant observation when I paid him a visit to his cell that this was his *First imprisonment*, suggesting he would have to go to gaol many times again in some other fights against the powers of his day in defence of some cause of piety and of oppressed weakness." * ষ্টেডের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধাবলীর দ্বারা তিনি যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে এই মর্ম্মে এক আইন প্রকাশিত হইয়া গেল—অপহৃতা বালিকার সম্মতি বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও তাহার অপহারককে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। এই পরম কল্যাণকর আইনটী ইংরাজ নরনারীর প্রাণে ষ্টেডের স্মৃতি চিরদিনের জন্য সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে "গেজেটে"র সহিত ষ্টেডের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসেই তিনি তাঁহার অধুনা বিশ্ববিখ্যাত Review of Reviews নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ষ্টেডের অমানুষী অলৌকিক প্রতিভা-সূর্য্যের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের গৌরব-দীপ্তিতে ইহা দীপ্যমান। শিক্ষিত সমাজে নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

মিঃ ষ্টেড্ একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী সম্পাদক কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লিখিবার শক্তি তাঁহার অনন্য সাধারণ ছিল—তাঁহার অনুপম উজ্জ্বল প্রতিভা সংবাদপত্র জগতে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। তাঁহার শ্রমশীলতা দর্শন করিয়া ষ্টেডের বন্ধুবর্গ অবাক হইয়া যাইতেন। কর্ম্মক্ষেত্র বিচরণ কালে তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় মতের (Conviction) অনুগামী হইয়া চলিতেন—শত সহস্র অচিন্তনীয় বিপদের নিশ্চয়তাও কখন তাঁহাকে ন্যায় ও সত্যের বন্ধুরপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি উদার রাজনৈতিকদিগের দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বিশাল হৃদয় অনুদার বা সঙ্কীর্ণভাবের মলিন স্পর্শে কোন দিন কলঙ্কিত হয় নাই। সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। তিনি পীড়িতের আশ্রয়স্থল ও পীড়িতকের ভীতির কারণ ছিলেন। ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ যে মানব জাতির উন্নতির পক্ষে এক প্রধান অন্তরায়, ইহা ষ্টেড মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই জগতে শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। ইউরোপে হেগ্ কনফারেন্স নামক সালিসী সভা তাঁহার এক অনন্ত অক্ষয়কীর্ত্তি। এত বড় কর্ম্মী হইয়াও তিনি দুঃখী ও নিরাশ্রয়ের অশ্রুজল মুছাইতে যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হইতেন! "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে র সম্পাদক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন His mind was as alert and ingenious as ever...No English journalists were as well known as Stead in the United States, Germany and Russia. He had invented a new style of journalism, swayed the decisions of the Cabinet, almost made himself a party in the Country....He was a demon for work. *Never have I Known him so busy as not to find time for patient listening to the story of any human being in distress, and no one so readily gave sympathy or loosened his purse strings.*' বস্তুতঃ ষ্টেডের চরিত্রে কঠোর বীরত্ব ও নারী সুলভ কোমলতার অপূর্ব্ব সমন্বয় দর্শন করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি—হৃদয় যে অসীম পুলক ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না!

জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। মৃত্যুর পরেও যে মানব সূক্ষ্মদেহী হইয়া পরলোকে বিরাজ করে এবং প্রাণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে পৃথিবীর মনুষ্যগণ যে পরলোকের অধিবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়—এই সত্যের প্রচার কল্পে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র শক্তি ও উৎসাহ নিয়োজিত করেন। ভগবান বড় নিষ্ঠুর, কেননা তাঁহারই সৃষ্ট মৃত্যু মানবকে প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় হৃদয়ের পরতে পরতে ভীষণ শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া পিতামাতার নয়ন পুত্তলী লইয়া প্রস্থান করে; চাক্ষুষ প্রমাণাদির সাহায্যে জগৎ হইতে এই মহা অনিষ্টকর ভ্রান্ত ধারণা এককালে দুরীভূত করিবার নিমিত্ত মহাত্মা ষ্টেড বিবিধ প্রকারে যত্ন ও চেষ্টা করেন। "জুলিয়া" নাম্নী জনৈকা পরলোকবাসিনীর সহায়তায় তিনি অদৃশ্য জগতের বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন এবং সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা 'Borderland' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। মৃত্যু মিথ্যা—অস্তিত্বহীন: ঈশ্বরের দয়া অনন্ত—তাঁহার ভালবাসা অসীম, অপরিমেয়; মানবাত্মা অজেয়, অনন্ত, অবিনশ্বর; মানবের ক্ষয় নাই—ধ্বংস নাই। মৃত্যু এক মহত্তর জগতে গমন করিবার পন্থামাত্র; সেই শান্তিময় উজ্জ্বল ঊর্দ্ধরাজ্যে শোকসন্তপ্ত মানবের অশ্রুজল মুছিয়া যাইবে—প্রিয়জন বিয়োগে কাতর হৃদয় তাহার প্রিয়তমকে আবার আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইবে। এই আশ্বাসপূর্ণ মহাবাণী ষ্টেড্ জগতে প্রচার করেন—তাপতপ্ত মানবের প্রাণে এই সান্ত্বনার নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দেন। আত্মিক দেহধারীর সহিত মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর নিকটতর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত ১৯০৯খৃঃঅব্দে তিনি "Tulia's Bureau" সংস্থাপিত করেন। ইহার সাহায্যে শত শত অশান্তিময় গৃহে শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছে—শতসহস্র শোকাতুর হৃদয় শান্তির অমৃত প্রস্রবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! আজ তাঁহাদের সম্মিলিত প্রার্থনা ষ্টেডের আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত

অন্তর্ধ্যানে আধ্যাত্মিক জগতের যে ভীষণতম ক্ষতি হইয়াছে তাহা কোন দিন পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। *

অনেক মহাত্মা ষ্টেডের মৃত্যুকে 'শোচনীয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের উদার, উন্মুক্ত বক্ষ তাঁহারই ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত সমাধি। তিনি ভক্ত এবং প্রেমিক; পরম পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে তাঁহার অটুট, অনন্ত বিশ্বাস ছিল, তিনি জানিতেন মৃত্যু মানবের প্রতি ভগবানের অখণ্ড আশীর্ব্বাদ। এমন বীরহৃদয় যাঁহার তিনি সকল অবস্থাতেই মৃত্যুকে সানন্দে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। পাঠক কল্পনানেত্রে তাঁহাদিগের শেষ দৃশ্যটী একবার অবলোকন করুন। উপরে—বহুউর্দ্ধে—সীমাহীন অন্তহীন নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ; নিম্নে অনন্ত জলরাশির উন্মাদ, চঞ্চলক্রীড়া; সম্মুখে—পার্শ্বে স্থির মৃত্যুর গর্জ্জন! এই মহাগম্ভীর মুহূর্ত্তে জীবন মৃত্যুর এই সন্ধিস্থলে মহাযোগী নির্ভীক ষ্টেড তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন—সর্ব্বদাই আনন্দের উচ্ছ্বাস—প্রশান্ত মুখমণ্ডল স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত! আত্মহারা ভক্তি-বিহ্বল প্রেমিক মৃত্যুর নিঃশব্দ আলিঙ্গনও অনুভব করিতে পারেন নাই! ষ্টেডের মৃত্যু তাঁহার স্মৃতিকে বিশ্ব-বাসীর মানস-পটে অবিনশ্বর চিত্রে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে!

যাও, নরশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ, তোমার চিরবাঞ্ছিতের অনুসন্ধানে গমন কর। মরণে জীবনের অবসান হয় কিন্তু আদর্শের বিলোপ সাধন হয় না। তুমি আজ পরলোকে—মানব-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত; কিন্তু তোমার বিরাট চরিত্রের মহান্ আদর্শ বর্ত্তমান। তোমার অমর স্মৃতি চিরদিন ভীরু ও দুর্ব্বলকে এক নবীন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে—তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি উৎসাহের চির-উদ্দীপনারূপে জগৎবাসীর হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

---

* প্রবন্ধের এই অংশটী বর্ত্তমান সংখ্যার Hindu Spiritual Magazine হইতে সঙ্কলিত; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 'Notes' হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট

তোমার ভগবৎ প্রেমের পূত পীযুষ ধারায় মোহমুগ্ধ সংশয়ক্লিষ্ট নর-নারীর অর্দ্ধমৃত প্রাণ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে—সঙ্কটসঙ্কুল অন্ধকার রজনীতে ভ্রান্ত জীবন-পথ-যাত্রার নিকট তোমার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীই ধ্রুবতারার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্র লাল রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন (বৈশাখ)—অধিকাংশ প্রবন্ধই সুখপাঠ্য, তবে কেবল একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২। টি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। "বাঙ্গালা" সম্বন্ধে মধ্যস্থতাটী তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারিলাম না। এরূপ Peace maker সাজিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদবাঞ্ছা একটী প্রবল প্রলোভনের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে সাহিত্যের অভিশাপগ্রস্থ হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ Vর উচ্চারণ 'ব'এর সহিত 'হ' যুক্ত হইয়া হয়, বেশ কথা, তবে আবার হঠাৎ 'হ' রূপান্তরিত (metamorphosed) হইয়া নিম্নগামী হইলেন কেন? পুনঃপৌণিক বিন্দু পাটীগণিতে থাকেন ইহাই জানিতাম, আজকাল ভাষাতেও যে তাঁহার অধিকার বিস্তৃতি ঘটিতেছে ইহা ভাবনার কথা বটে। আবার বাঙ্গালার নিরীহ 'ব' বেচারীও রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে সংস্কৃত 'ব, নবাভিষিক্ত হইয়াছেন। দেখা যাক্ পরিষৎ কি মীমাংসা করেন। "কবি ও ঋষি" প্রবন্ধটী বেশ লাগিল। ইহাদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত হয়নাইত? "সর্ব্বত্যাগী" ও "বসন্তের বীণা" বেশ সরস ও সুন্দর হইয়াছে।

প্রবাসী (বৈশাখ)—"ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধটী রবীন্দ্রনাথের অমৃতলেখনী-নিঃসৃত বলিয়া সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে সুতরাং এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বোধহয়

অসঙ্গত হইবেনা। প্রবন্ধটীতে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মৌলিকতা যথেষ্ট থাকিলেও সমস্ত বিষয় মানিয়া লওয়া অসম্ভব। লেখক জনক, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, পরশুরাম প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত এবং মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক কিন্তু সীতা ও অহল্যা বিষয়ক উক্তিসমূহ নিতান্ত অসার ও প্রাণহীণ বলিয়া বোধহয়। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এবং পরশুরাম ও রামদ্বারা যে স্থিতিশীল ব্রাহ্মণ ও পরিবর্ত্তনশীল ক্ষত্রিয়ের সামজিক বিরোধ সূচিত হইয়াছে এ কথাটি বাস্তবিকই একটী আবিষ্কার। ইহাতে রামায়ণের কালের সামাজিক চিত্রের উপর এক নূতন আলো পড়িয়াছে। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে যে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, অনার্য্যদিগের মধ্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারদ্বারা আর্য্য ও অনার্য্য উভয়কে একতার বন্ধনে গড়িয়া তোলা; কৃষিপ্রবর্ত্তন আনুসঙ্গিক হইতে পারে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় নহে)। বিশ্বামিত্র আবার এই দীক্ষা জনকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং এই দীক্ষাই রামচন্দ্রের চিরজীবনের ব্রত হইয়াছিল। এই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা বেশ সরস ও সজীব হইয়াছে। যাহা বাস্তবকে একবারে নির্দ্দয়ভাবে বিসর্জ্জন করিয়া শূণ্যে উধাও হইয়া যায় তাহা অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনও প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। রাম যে অনার্য্যদিগকে বিজয় ও মিত্রতাদ্বারা বশ্যতাস্বীকার করাইয়াছিলেন একথা রবিবাবু নূতন বলেন নাই। তিনি স্থানান্তরে বোধহয় একাধিকবার বলিয়াছেন যে অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের মধ্যে কৃষি প্রভৃতি আর্য্যসভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট করাই রাম ও কৃষ্ণ উভয়ের বিশেষত্ব, ইহার উপরেই উভয়ের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত। সীতাকে 'হলচালনরেখা' এবং অহল্যাকে 'হলচালনের অযোগ্য' অকর্ষিত ভূমি (fallowland) না করিলেও রামায়ণের ঐতিহাসিক অধ্যয়ণে কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা ছিল না। অভিধানে সীতা অর্থ 'লাঙ্গলের ফাল' পাওয়া যায় সুতরাং রামায়ণের সীতাকে ঐ ব্যাখ্যা দেওয়া এবং তাহার সার্থকতা দেখাইবার জন্য

জড়পদার্থে পরিণত করাটা বেশী কিছু না হইলেও অন্ততঃ নির্ম্মম হৃদয়ের পরিচায়ক।

এই সমুদায় ব্যাখ্যা বজায় রাখিয়া চলিলে সীতাকে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ, অর্থ বনে বনে কৃষিবিস্তার করা, রামের অহল্যা উদ্ধার অর্থ শিলাময় ভূমি চাষ করিয়া আপনার "কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া", রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্ত্তৃক সীতা উদ্ধারের দুইরূপ অর্থ হয়, প্রথম—রাবন রামের লাঙ্গলখানা চুরি করিয়া নিয়া লঙ্কায় কৃষিবিস্তারের চেষ্টা করেন কিন্তু রাম তাঁহাকে নিহত করিয়া উহা পুণরায় লইয়া আসেন। দ্বিতীয় অর্থটী বড় জোর এই হইতে পারে যে রাবণ রামের 'কৃষিবিস্তারে' ব্যাঘাত জন্মান কিন্তু রাম তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বাধামুক্ত হন।

লেখক রামকে বনে পাঠাইবার সময় স্বয়ং বলিয়াছেন যে সীতা অর্থ "তাঁহার সেই ব্রততী" কিন্তু চাপল্যবিহীনা সীতা যে এরূপ বহুরূপী জীব ইহা আমাদের আদৌ বিশ্বাস হয় না। যিনি একবার 'হলচালনরেখা' ছিলেন তিনিই যে আবার কখন "ব্রততী" হইয়া বসিয়াছেন বুঝিলাম না। যে "মধুকরী কল্পনা" ও অগাধপাণ্ডিত্য কৃষ্ণ, রাধা ও সমস্ত গোপিনীগণকে ব্যোমচারী নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত করিয়া সমস্ত ঘটনাটি নীহারিকাচক্রস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক আতসবাজির খেলাতে পর্য্যবসিত করিয়াছে, কবির ঈদৃশ অর্থ আবিষ্কারেও সেইরূপ কল্পনা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপভাবে আভ্যন্তরীন রূপক (symbolic) অর্থ বাহির করিলে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, সভামন্দির করতালিতে প্রতিধ্বনিতে হয় কিন্তু প্রকৃতঅর্থ চাপা পড়িয়া যায়, উহা পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ব্যাখ্যাকার মূল কবিকে তাঁহার নিজের ভাবেই বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া কদাচ তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। একবার নেত্র নিমিলিত করিয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, সত্য সত্যই কি কবি বাল্মিকী পাষাণ অহল্যাউদ্ধার দ্বারা কৃষিপ্রবর্ত্তন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন? কোন সাময়িক চরিত্র

চাঞ্চল্যদোষে দুষ্টা, স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অহল্যা অরণ্যমধ্যে যুগযুগান্তর ধ্যাননিরতা থাকিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন, তারপর শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পরামর্শে গৌতম সেই অনুতাপানলে দগ্ধা, অপস্যাদ্বারা সংস্কৃতা অহল্যাকে বিশুদ্ধীকৃতা কাঞ্চনের ন্যায় পুনঃগ্রহণ করিলেন, এইরূপ বা সদৃশ কোন অর্থ কি ইহার হইতে পারে না? কৃষিপ্রবর্ত্তন বুঝাইতে হইলে সীতাদ্বারাই অহল্যা উদ্ধার কি যুক্তিসঙ্গত হইত না? সংস্কৃত অভিধানে বর্ণমালার অনেক অক্ষরেরই এক একটি অর্থ আছে। উন্নত বিংশ শতাব্দীতে যেরূপ কল্পনার প্রসার দেখা যায় তাহাতে হয়ত কেহ একদিন 'বিশ্বকোষ' বা 'শব্দকল্পদ্রুমের' নজির দেখাইয়া প্রমাণ করিয়া বসিবেন যে র-আ ম-আ য়-ণ অর্থ রণনীতি, র-আ ম অর্থ Dreadnought, ল-ক্-ষ ম-ণ অর্থ torpedo স-ঈ-ত-আ অর্থ রণপোত (man of war)। তখন অতি সহজেই প্রমাণিত হইবে যে রামায়ণের সময়ের আর্য্যেরা যে শুধু ধনুর্ব্বানদ্বারা স্থলযুদ্ধ করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা জলযুদ্ধেও সুনিপণ ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ের নৌযুদ্ধের সমস্ত উপকরণ তাঁহাদের ছিল। আমরা বলিতে চাই না রামায়ণের সময়ে আদৌ কৃষিবিস্তার হয় নাই, তবে উহা যেভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে তাহাতে কষ্ট কল্পনা ব্যতীত কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে এই প্রবন্ধটীতে চিন্তা করিয়া দেখিবার মতন অনেক জিনিস রহিয়াছে—সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"জ্যোৎস্নায়" নামক একটী নূতন ধরণের কবিতা এক অপূর্ব্ব শক্তিমান্ পুরুষের সৃষ্টি। ইনি শ্রীহীন হইয়াও চারুই আছেন। যাহাহউক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। প্রথমেই "রজত শশধর বনপর হাসিছে" তাহাতে পাতার "ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জন উঠিছ," উঠুক। এই এক stanza লিখিয়া থামিয়া গেলে মন্দ ছিল না। কিন্তু অফুরন্ত-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-সম্পন্ন মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য নিজের কবিতাটীকে একবারে তিলোত্তমা না করিয়া ছাড়িবেন না, তাই আবার চলিল

"সরসী সুবিমল

তমাল কালোকায়
তাহাতে মূরছায়
বায়ুর ক্রন্দনে,”

বায়ুর ক্রন্দনে তমাল কালোকায় কিরূপে মূরছিল ? যাহার যে কাজ তাহার তাই সাজে। হটাৎ কবি হইতে গেলে অনেক মুস্কিলে পড়িতে হয়, এইধরুণ না কেন ছন্দ, বন্ধ, ভাব ঝঙ্কার আর সকলের উপরে শব্দের মিলটাত আছেই। তোমার লিখা অভ্যাস 'মুদ্রারাক্ষস' আর গল্প তুমি তাহাই লিখ, কিন্তু দোহাই ময়ুর বাহন, 'নীলকুঠির' মত গল্পের যেন বেশী আমদানী না হয়। নিদাঘের দারুণ উত্তাপ,কবিবর 'এমন সময়ে সুখশীলতা 'স্বপনে' টুপ করিয়া একটু ডুব দিয়া লইয়াছেন। ইহার পর হটাৎ হসুপ্রাণের অনুরোধে 'নীরবতা' 'নিবিড়' হইয়াছে তা হউক কিন্তু 'কোমলতা' প্রশান্তমহা-সাগরের ন্যায় 'গভীর' হইল কেমন করিয়া ? তারপরের দুটি লাইন বেশ।

“রঙ্গিন আলিপন
হতেছে বরিষণ”

কিন্তু ইহাও 'সুলগণের' পক্ষে যথেষ্ট নহে “গগন নিমগন” হওয়া চাই। আমরা এখানে আর গুটী দুই লাইন বসাইতে চাই—

“রঙ্গিন আলিপন
হতেছে বরিষণ,
গগন নিমগন,”
ভ্রমর গুঞ্জন,
মলয় সমীরণ,
হৃদয় বেদন
মাগিছে ক্রন্দন,
এইত সুলগণ !

সমস্ত কবিতাটী পড়িয়া নিম্নলিখিত ইংরেজী কবিতাটী মনে পড়িল

The raging rocks
And shivering shocks
Shall break the locks
Of prison-gates:
And Phœbus' car
Shall shine from far
And make and mar
The foolish fates."

Shakespeare

"মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা" প্রবন্ধটী বেশ হইতেছে। "এতা বা জাপানী পরিঅা" বেশ সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।" "জীবনস্মৃতি" বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। ইহাতে কবির জীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution) বেশ প্রকাশ পাইতেছে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু'রবি' ক্রমেক্রমে কিরূপে অদ্যকার সাহিত্যসম্রাট্, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার, শ্রেষ্ঠকবি, ভাবুক, দার্শনিক, সমালোচক ও আধ্যাত্মিক 'রবীন্দ্রনাথ' হইলেন তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সমাপ্ত হইলে ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটী দুর্লভ সামগ্রী হইয়া থাকিবে। 'অসময়ে,' "না ফুটিত আহা যদি," "রজনী" প্রভৃতি কবিতা একরূপ হইয়াছে। "রূপ ও ধূপ" পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। "ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী" ও "একটী স্বদেশী কারখানা" বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। "মুস্কিল আসান" গল্পটী বেশ লাগিল। "না জানা" কবিতাটীতে আধ্যাত্মের আস্বাদ পাইলাম। কর্ম্মক্লান্ত প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে, সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের অন্তরালে যে এক অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে ইহা তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। সে আনন্দের আস্বাদ পাইলে জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়গুলি অজ্ঞাত হইয়া পড়ে। "নিবেদিতা" নিবেদিতার ন্যায়ই শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। 'গরুড় গাড়ীর গান' বেশ লাগিল কিন্তু 'নববর্ষে'র "শিন্নেন্ ওমেদেতোটায়" বড় তৃপ্তি পাইলাম না।

সাহিত্য (বৈশাখ)—

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পৌত্রের সমবয়স্ক নবীন কালিদাসকে "মুরছায়" লইয়া কেন এরূপ অযথা নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন

বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ সমালোচনা প্রবীণ সাহিত্য সম্পাদকের পক্ষে কখনও শোভা পায় না।

ধূর্জ্জটি।

শিশু সাহিত্য—

"শিশু" (বৈশাখ)—এই সচিত্র মাসিকটী বালক বালিকাদের উপযোগী নানা সরস ও উপাদেয় গল্প কবিতা ও প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ ধরণের মাসিক পত্র সম্পূর্ণ নূতন সন্দেহ নাই। চিত্রসম্পদে রচনামাধুর্য্যে এবং চিত্তবিনোদনে ইহার সমকক্ষ বোধ হয় আর কিছুই নহে। তবে দক্ষিনারঞ্জনের 'শিশু' না ছাপিলেই ভাল হইত। বালক বালিকাদের কবিতা সরল সুন্দর এবং সহজ হওয়া উচিৎ। 'শিশু' বালক বালিকাদের মনপ্রাণ হরণ করিবে সন্দেহ নাই। মূল্যও অতি সুলভ—বার্ষিক ১ এক টাকা মাত্র।

প্রভাব (বৈশাখ)—বালক বালিকাদের জন্য সচিত্র সুলভ মাসিক পত্র। হেমদা বাবুর পুরীর চিঠি হইতে উদ্ধৃত 'পুরী'—প্রবন্ধটি পাঠ করিলে ভাষার তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনও নাচিয়া উঠিবে। মুনীন্দ্র বাবুর কবিতা 'নববর্ষ'—অনেক বড় বড় মাসিক সাহিত্যেও এমন সুন্দর কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। 'বুদ্ধির দৌড়' কবিতাটিতে হাস্যরস মোটেই ফুটিয়া উঠে নাই। পাঁচকড়ি বাবুর 'মঙ্গলাচরণ' বুঝিতে শিশুদের কচি দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। ছবি-গুলি মোটেই সুন্দর হয় নাই—এদিকে সম্পাদকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ভাল। বালক বালিকাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিবে।

মুকুল (বৈশাখ)—সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল সমভাবে চলিয়া বিগত বৈশাখে ১৮ বৎসরে পদার্পন করিয়াছে। ইহার পরিচালকবর্গ একটু মনোযোগ দান করিলে মুকুলের শ্রীবৃদ্ধি আরও সংসাধিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। ইহার লেখা সম্বন্ধে কিছুবলা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান বর্ষে অনেকগুলি শিশু সাহিত্যের (মাসিক) জন্ম হইয়াছে। লেখকগণের মনে রাখা আবশ্যক যে শিশুদের জন্য লিখিতে হইলে নিজেরও শিশু হওয়া দরকার। আমরা শিশু সাহিত্য গুলির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

টুনটুনি।

জ্যাক ফিলিপস্‌।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] আষাঢ়, ১৩১৯ [৩য় সংখ্যা।

অমর মরণ।

ঘুমে অচেতন নিখিল ভুবন
অসীম গগন মাঝে,
স্বর্গ তোরণে দেববালাগণ
জ্বালি দিল দীপ সাঁঝে;
মৃদু সমীরণ বারিধি বক্ষে
নাচিয়া নাচিয়া ফিরে,
বীচিদলবল আলোকে পুলকে
হাসিয়া উঠিছে ধীরে।

চুম্বনরত অম্বরতল
বিশাল সিন্ধুবুকে
ডুবিয়া মরিয়া হাসিয়া হরষে
লুটিয়া পড়িল সুখে,

সিন্ধু তাহার বিরাট বক্ষে
টানিয়া লইল তায়,
মোহন মদির মধুর মাধুরী
গলিয়া বহিয়া যায়।

নিশার নিবিড় নীরবতা ভাঙি
কেরে ওই ভীমকায়,
নীল সিন্ধুর তরল হৃদয়
মন্থন করি ধায় ?
কে ওই নিঠুর করিছে চূর্ণ
প্রচণ্ড পদাঘাতে,
মহাজাগরণ করিয়া বহন
হেন ঘন নিশারাতে।

সহসা দানব থমকি থামিল
সভয় চকিত চিতে
কে যেন তাহার পথরোধ করি
দাঁড়াইল চারিভিতে।
সহসা তাহার সুবিশাল দেহ
ভাঙিয়া পড়িল হায় !
অতল জলধিবক্ষ মাঝারে
ধীরে ধীরে ডুবে যায় !

তখনি উঠিল ক্রন্দন ধ্বণি
নিশার গগন টুটি,
বারিধিবক্ষে শতদীপমালা
তখনি উঠিল ফুটি,
তুষার শীতল সমীর রহিল
কাঁপায়ে হাজার প্রাণ,
ফুঁপিয়া সাগর কাঁদিয়া তুলিল
সহস্র কল তান।

আসিছেরে ওই মৃত্যুর দুত
সাজ সাজ ত্বরা করি
কে যাইবি তোরা চল ছুটেচল
বীরের মতন মরি ;
এ মহা আহবে মহা আহ্বানে
পশ্চাতে কেবা আছে !
এমন সুযোগ হেলায় হারালে
জগত হাসিবে পাছে।

নবীন বীর্য্যে নবীন শৌর্য্যে
দৃপ্ত যোদ্ধ বেশে
বাহিরে আসিল নর নারী যত
—যাত্রী নবীন দেশে।
বিলম্ব আর সহেনাক কার—
'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেকদান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

বিজয় বিষাণ উঠিল ফুঁকারি
স্তব্ধ গগন চিরে
দেব-বালাগণ স্বর্গের পথে
ডাকিছে বিজয়ী বীরে ;—
শুনি আহ্বান দিল বলিদান
শত সহস্র প্রাণ ;
শিহরি উঠিল স্বর্গ মর্ত্ত্য
হেরি সে অর্ঘ্য দান।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ।

টাইটানিক ধ্বংশ উপলক্ষে লিখিত

মনসা

জরৎকারু-মুনেঃ পত্নী ভগ্নীবাসুকেস্তথা।
আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥

বর্ষাকালে নিম্নবঙ্গে সর্পের বড় আতঙ্ক হয়। এই সর্প-ভীতি নিবারণ জন্য মনসা বা বিষহরী ব্রতের অনুষ্ঠান। এই সময় পল্লীগ্রামে পদ্মাপুরাণ বর্ণিত বেহুলা সতীর উপখ্যান প্রত্যহ খোলকরতাল সংযোগে গীত হইয়া ক্ষুদ্র পল্লীকে মুখরিত করিয়া তুলে। শ্রাবণের নৌকার 'গলুইর' উপর মৃণ্ময় বিষহরী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শত শত তরীর প্রতিযোগিতায় প্রধাবিত হওয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

নিয়ম ঃ—পুরোহিত আসিয়া শ্রাবণের সংক্রান্ত দিন বিষহরী ব্রত করাইয়া থাকে। এই দিন সর্ব্বত্র অষ্টনাগের উপর বিষহরী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। একটী ঘটের পাত্রে তিনটী সাপ ও ঘটের মুখে পাঞ্জার মত একটা ঢাকুনী, ঢাকুনীর গাত্রেও পাঁচটী সাপ, ইহার নাম অষ্টনাগ। এই ব্রতে কাঁচা দুধ ও পাঁচটী কলা নাগকে দিতে হয়। পূজান্তে নারীগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। ব্রতের পরদিন বিষহরী মূর্ত্তি ও অষ্টনাগ বিসর্জ্জন করিতে হয়। কেহ কেহ আষাঢ় মাসের সংক্রান্ত দিন ঘট বসাইয়া দশোপচারে দেবীর পূজার সূচনা করিয়া থাকেন। তার পর সম্পূর্ণ মাস ঘটের উপর দেবীর পূজা করিতে হয়। পূর্ণ একমাস গত হইলে শ্রাবণের সংক্রান্ত দিন রীতিমত পূজা হয়।

ব্রত কথা।

এক গৃহস্থের ছিল তিন পুত্র। তিন পুত্রই বিবাহ করিয়াছে। শ্রাবণ মাস। অবিশ্রান্ত টুপ্‌টাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বউরা জল আনিতে ঘাটে যাইতেছিল, এমন সময় বড় বউ বলিল, আজকের মত দিনে বাপের বাড়ী হয় ত গরম দুধ চিড়া খাইয়া শুইয়া থাকি। মেজো বউ বলিল, আজকের মত দিন হয় আর বাপের বাড়ী থাকি ত গরম গরম খিচুড়ী খাইয়া বেশ করিয়া শুইয়া থাকি। কিন্তু ছোট বউ

কোন কথা কহিল না। তখন বড় দুইজনে ছোট বউকে বলিল, "তোমার কি খেতে সাধ হয় বলনা?" সে বলিল, "তোমাদের বাপ ভাই আছে তোমাদের সাধ মিটিতে পারে আমার কেহ নাই, আমি কিসের সাধ করিব?" শুনিয়া বড় দুইজনে বলিল "আমরা সাধ করিলাম বলিয়াইত আর সে সাধ পূর্ণ হল না?" তখন ছোট বউ বলিল "আজকার মত দিন হলে আর মা বাপের বাড়ী হলে আমি শইল (শকুল) মাছ পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত খাই, আর শুয়ে থাকি।"

বলিতে বলিতে তাহারা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাটে আসিয়া দেখে দুইটী শইল মাছ তাদের সম্মুখে। বড় দুইবউ মাছ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদের সাধ ত আর পূরিল না; কিন্তু ছোট বউ যা বল্লে তাই পূর্ণ হলো।" বলিয়া মাছ দুটী ধরিয়া ছোট বউয়ের হাতে দিল। ছোট বউ মাছ দুটী আঁচলে বাঁধিয়া বাড়ীতে আনিয়া ঢাকিয়া রাখিল। বাড়ীর খাওয়া দাওয়ার গোলযোগ থামিয়া গেলে ছোট বউ সেই মাছ আনিতে গেল। গিয়ে দেখে, ওমা! একি! দুইটী সাপ যে! ছোট বউ চমকিয়া উঠিল। তখন সাপ দুটী মানুষের মত কথা কহিতে লাগিল, বলিল—গৃহস্থের বউ, ভয় নাই, আমাদের দুই ভাইকে পালন কর। সাপ দুটীর কাকুতি মিনতিতেই ছোট বউএর মন ভিজিয়া গেল। সে সাপ দুটীকে দুধ দিয়া পালন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সাপ দুটী বড় হইল।

এখন সাপ দুটী দেশে যাইতে চাহিল। ছোট বউ বিষণ্ণ মনে তাহাদিগকে বিদায় দিল। বহুদিন পরে বাড়ী গেলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারাই বুরাই এত দিন তোরা কোথায় ছিলি?" তাহারা বলিল, "এক গৃহস্থের বউ আমাদিগকে বেশ যত্ন করে লালন পালন করেছে। সে যত্ন না করলে আমাদিগকে আর দেখতে পেতে না। শুনিয়া মা মনসা দেবী বলিলেন, "তোরা যা, গিয়ে সেই গৃহস্থের বউকে এখানে নিয়ে আয়।"

দারাই বুরাই দুই ভাই মানুষের বেশে যাইয়া সেই গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিল এবং গৃহস্থের ছোট বউকে বোন বলিয়া ডাকিল। ছোট বউ

তাহাদিগকে বেশ চিনিতে পারিল। তাহারা গৃহস্থকে বলিল যে তাহাদের জন্মের পূর্ব্বে তাহাদের এই বোনটীর বিবাহ হইয়াছে তাই মা তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন যে বহুদিন তাহাকে দেখেন নাই, তাঁহার বড় সাধ হয়েছে তিনি একবার আমাদের এই বোনটীকে দেখেন। গৃহস্থের সকল বউই বাপের বাড়ী যায়, ছোটটী কিন্তু কোথাও যায় না, এইবার নিতে আসিয়াছে শুনে শ্বশুর শাশুরীর বড় আনন্দ হইল, তাঁহারা সম্মত হইলেন। দারাই বুরাই ছোট বউকে লইয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইল।

সাপের দেশে ছোট বউয়ের দিন পরম সমাদরে যাইতে লাগিল। শ্রাবনের সংক্রান্তি আসল। মা মনসা দেবী পূজা খাইতে যাইবেন, ছোট বউকে রাখিয়া বলিয়া গেলেন "আমার যে শতশত নাগ আস্‌বে, তাঁহাদিগকে সময় মত দুধ খেতে দিও। নাগেরা আদুরে ছেলে অল্পে-রাগ করে; দেখো কোন বিষয় যেন ক্রটী না হয়।" ছোট বউ সম্মত হইল। মা মনসা পূজা খাইতে চলিয়া গেলেন।

সময় মত নাগ সব ছুটিয়া আসিল। ছোট বউ তাড়াতাড়ি গরম দুধ তাহাদিগকে খাইতে দিল। গরম দুধ খাইয়া সব নাগ ঢলিয়া পড়িল। তখনই মনসার আসন টলিল। মনসা পূজা খাইতে খাইতে ভাবিলেন— মানুষের মেয়ে কি কাণ্ডই না জানি করেছে।

তাড়াতাড়ি পূজা খাইয়া এসে দেখেন নাগ সব ক্ষেপিয়া আসিয়া রাগে ফোঁস ফোঁস করিতেছে। আর সেই মানুষের মেয়েকে খাইতে যাইতেছে। মনসা আসিয়া বলিলেন—ইহাকে খাইয়া কাজ নাই, যেখানকার মানুষ তাকে সেই খানে পাঠায়ে দিই।" এই বলিয়া তিনি ছোট বউকে অর্দ্ধঅঙ্গ স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়া দারাই বুরাই দুই ভাইকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তাহাকে লইয়া গৃহস্থের বাড়ী গেল। অর্দ্ধ অলঙ্কার দেখিয়া শ্বশুর স্বাশুড়ী সকলেই উপহাস করিতে লাগিলেন ছোট বই তাহাদের উপহাস গ্রাহ্য করিল না। শাশুড়ীকেও তাচ্ছিল্য করিয়া ঘরে গেল। তখন শাশুড়ী বলিলেন "অর্দ্ধ অলঙ্কারেই তোমার

"দারাই বুরাই দুই ভাই জিউক
পদ্মাবতী মা জিউক
এবার এসেছি অর্দ্ধ অলঙ্কারে
আরবার আস্‌ব পূর্ণ অলঙ্কারে।"

এই কথাগুলি দারাই বুরাইর কানে গেল। তাহারা বাড়ী যাইয়া মাকে সেই কথা বলিল। মা বলিলেন, "তোমাদের প্রতি যখন তার এত ভালবাসা তখন তাকে আবার এনে বেশ করে সাজাইয়া পূর্ণ অলঙ্কার দিয়ে দাও।" তাহারা মা মনসার কথা অবহেলা করিতে পারিল না। সেই ছোটবউকে আবার আনিয়া পূর্ণ অলঙ্কারে সাজাইয়া দিল। এবার শ্বশুর শাশুরী দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। মা মনসার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই ব্রত যে করে, মা মনসা জলে জঙ্গলে তার ছেলেপিলেকে রক্ষা করেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

(গীতা)

আজি কেন ধনঞ্জয় তব
অকস্মাৎ হেন দৈন্যভাব ?
রণজয়ে অতুল বিভব,
মৃত্যুফল চিরস্বর্গলাভ ঃ

কুরুক্ষেত্রে আসন্ন সমর
এই বাণী করিছে ঘোষণা ;—
রণোল্লাসে ধর ধনুঃশর,
কেন বৃথা তব এ শোচনা ?

জাননা কি জীবাত্মা অমর ?
তবে তুমি হন্তা হ'বে কার ?

সর্ব্বগত যেমন অম্বর,
সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান তাঁর।

পার্থিব এ দেহ-আবরণ
তেয়াগিয়া জীর্ণ বস্ত্র সম,
নিত্য আত্মা করেন গ্রহণ
দেহান্তর তাঁর মনোরম।

এইরূপে কৃত কর্ম্মফল
ভুঞ্জি' নর জন্ম জন্মান্তরে,
পাপপুণ্য পাসরি' সকল
লীন হয় আমার অন্তরে।

কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থানে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বীর
মিলিয়াছে কালের আহ্বানে
ডারি দিতে নিজ নিজ শির।

কর্ম্মময় এ মহা প্রাঙ্গন,
দৌর্ব্বল্যের নাহি অবসর,
নিশ্চেষ্টতা ভীরুতা লক্ষণ,
বীরবর, হও অগ্রসর।

কর্ম্মমাত্রে তব অধিকার ;
ফলাফল কি কাজ বিচারি' ?
অতএব কর্ম্ম কর সার
ত্যজি' মোহ হে গাণ্ডীবধারি।

ভুলেছ কি ক্ষত্রবীর তুমি ?
প্রাণনাশে কেন বা কাতর ?
রক্তস্রোতে রঞ্জিবে যে ভূমি,
তারি তরে ব্যাকুল অন্তর ?

এত নহে সৃষ্টি বিনাশন ;—
যুগে যুগে এরূপে করি

পাপনাশ ধর্ম্মসংস্থাপন
নানারূপে ভবে অবতরি।
সাধিতে এ মহাকার্য্য ত্বরা
তোমা সম যন্ত্র প্রয়োজন ;
পাপশূন্য করিবারে ধরা
কর প্রাণ মন সমর্পণ।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ।

হত্যাকারী।

কেনারাম সাহা বুড়ো মানুষ। একটী মাত্র পুত্র বাঞ্ছারাম ভিন্ন সংসারে তার আর কেউ নাই। তার চেহারাতে একটা রুক্ষভাব মাখা ছিল, যেজন্য সকলেই তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত। কলিকাতায় তার মস্ত বড় কারবার—সে কারবার আর কিছুই নয়—একটা মদের দোকান। সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া দোকানে যায়, আর সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। রাত্রে পুত্র বাঞ্ছারাম দোকানে থাকে।

আমি আর কাশীশ্বর পণ্ডিত সেদিন সন্ধ্যার পর কেনারামের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ তখন ঘরে পৈঠায় বসিয়া তামাকু খাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সে একটু উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইটী ছোট গোল টুল আমাদিগকে বসিতে দিল। নানা কথা বার্ত্তার পর সে তাহার আত্মজীবনের একটা কাহিনী আমাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিল। আমরা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

তাহার নিকট হইতে সেই রোমাঞ্চকারী ঘটনা শুনিতে শুনিতে তাহার সম্বন্ধে একটা ভয়ঙ্কর ধারণা হইতে লাগিল। যতই সে কাহিনীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলাম ততই মনে হইতে লাগিল—কি ভীষণ এই লোক! কি নিষ্ঠুর এর স্বভাব! কি পৈশাচিক এর প্রকৃতি! এমন অদ্ভুত কাহিনী পূর্ব্বে আর কখনও শুনিয়াছি—মনে পড়েনা।

কাশীশ্বর শুনিতে লাগিল—সেই পৈশাচিক ঘটনাবলী শোনে, মাঝে মাঝে কাণে হাত দেয়, মাঝে মাঝে পৈতায় আঙ্গুল কাটিয়া রাম নাম জপ করে।

কেনারাম নির্ভয়ে ভাবনাশূন্যচিত্তে বলিয়া যাইতেছিল—সে যেন তার অপরাধের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তার নিষ্ঠুরতার একটা পরিমাপ করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা মনে করিলাম, "তা হবেই ত! হাজার হ'লেও ছোট লোকত? পাপ পুণ্য জ্ঞান কম! মদ বিক্রি করে করে, দিনরাত মাতালের সঙ্গে কারবার করে তার প্রকৃতিটাই কেমন কাঠখেট্টা গোছের হয়ে গেছে! আর এতটুকু বুদ্ধি শুদ্ধিও নেই যে বুঝে উঠবে এটা ভাল এটা মন্দ!"

আমরা শুনিয়া অবাক হইলাম যে দিবসে দুপুরে সহরের বুকের উপর—এমন কি থানার এত নিকটে এমন একটা কাণ্ড হইয়া গেল অথচ পুলিশ ঘুণাক্ষরেও তার একটা কিনারা করিতে পারিল না! আশ্চর্য্য বটে!

মনে মনে ভাবিলাম "লোকটা কি ধরিবাজ! সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এমনি করে বসে আছে!"

কিন্তু যতই নীরস, যতই কঠোর তার চেহারা হউক না কেন তথাপি তার কথার ভঙ্গিমা এবং বিনয়নম্র ব্যবহারে কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না যে সে খুন করিয়াছে। এক সময় ছিল যখন তার চোখের ভিতর এমন একটা কঠোরতা, এমন একটা শয়তানী খেলা খেলিয়া যাইত, যাহাতে বিশ্বাস হইত যে সে কোনও কাজে দমিত হইবার নহে, কোথাও কিছুতে বাধা প্রাপ্ত হইলে দ্বিগুণ তেজে সেকাজ করিতে যাইত। কিন্তু এখন তাহার লোল চর্ম্ম, পলিত দন্ত, পক্ক কেশ, ভগ্ন শরীর, কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু দেখিলে মনে হয় সে অতি নিরীহ—অতি ভাল মানুষ। তবে তার মদের কারবারই তাকে যা একটু খারাপ করিয়াছে।

সে আজ ৫ বৎসরের কথা। এত দিন পর্য্যন্ত মহা মানসিক যন্ত্রণা সে নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ আর পারিল না।

কাহারও নিকট তার কৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া হৃদয়ের গুরুভার কতকটা লাঘব করিবার অবসর সে এতদিন খুঁজিয়া পায় নাই। এতদিন বহুকষ্টে সে একথা গুপ্ত রাখিয়াছিল—কিন্তু বিবেকের দংশন আর সে সহ্য করিতে পারিল না—সেই উন্মত্ত বিবেক শান্ত করিবার জন্যই আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিল।

সে বার বার বলিতে লাগিল "ভাই আমাকে ক্ষমা করিও, আমাকে ঘৃণা করিও না, আর এ ঘটনা জনসমাজে প্রকাশ করিও না।"

কিন্তু সে জানিত না যে আমি নবীন সাহিত্যিক—এমন একটা ঘটনাকে সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র আমি নই। অগত্যা পণ্ডিত-মহাশয় মাথা নাড়িলেন।

সে আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

"তা ভাই, এ তার নিজের দোষ। মদের পিঁপে থেকে খুলে গামলা গামলা মদ ঢেলে রাখতাম। সে তাই খেত। খেয়ে খেয়ে ঘোরতর মাতাল হয়ে পড়ত। আমি তার সে স্বভাব সারাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি—কিন্তু সে তা আমলেই আনলে না—চেষ্টা বৃথা হল। মদের নামে সে মাতোয়ারা, মদের নেশায় সে ভরপুর, মদের গন্ধে সে বিভোর।

কিন্তু ভাই আমি তাকে হাতে হাতে একদিনও ধরতে পারিনি—এত ধূর্ত্ত সে! চতুরতার সহিত সরলতার এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রন আমি আর দেখেছি বলে মনে হয় না। আমি তার সরলতায় মুগ্ধ। উভয়ে যখন প্রথম পরিচয় হয়, আমি তাকে নির্ম্মল চরিত্র বলেই ভাবতাম, আর সে যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এ ধারণাও আমার বেশ ছিল।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে লাগলাম যে তার নেশাখোর স্বভাব ক্রমেই মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। স্বভাব যে তার পূর্ব্বথেকেই এরূপ ছিল তা আমার বিশ্বাস হয় না। সে যাই হোক আমি এর বিন্দুবিসর্গও এর আগে জানতেম

না। আমি দেখতে পেলেম—গভীর নিশীথে আমি যখন নিঝুম ঘুমে অচেতন থাকি কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজব করতে বেরিয়ে যাই,—সুযোগ বুঝে তখন সে মদ খায়।”

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—“তা এতে তোমার রাগ হতে পারে কিন্তু তাই বলে এই সামান্য কারণে তুমি তার প্রাণ নিতে পার না।”

“হাঁ পারিনা বটে; কিন্তু তখন আমার মানসিক অবস্থা এতদূর বিকৃত হয়ে পড়েছিল যে আমি সেই রাগের ঝোঁক আর সামলাতে পারলেমনা। আমি অনেকদিন তাকে শাসন করেছি—অনেকবার তাকে বুঝিয়ে বলেছি—‘ফের যদি মদ খাবে ত তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।’ কিন্তু সে আমার কোনো কথাই কানে তুলতনা। যখন আমি তাকে এসব কথা বলতাম সে শুধু চুপ করে আমার সামনে বসে থাকত, মুহূর্ত্তের তরে তার করুণ কোমল আঁখি দুটি তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত—তারপর ধীরে ধীরে উঠে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। ওঃ! তার এই ব্যবহার আমাকে পাগল করে ফেলত—আমি দেখতুম তার কাছে যে এত বকছি সব বৃথা। তীব্র ভৎর্সনাও তার গায় বিঁধতনা—আমার ভয় হচ্ছিল যে সমাজে হয়ত এর জন্যে আমাকে অনেক নাস্তানাবুদ হতে হবে।”—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কেন, তার এ স্বভাবের কথা ঘরের বাইরেও কি কেউ জানতে পেরেছিল ?”

“না বাবু, সে তেমন মেয়ে নয় যে বাইরের লোকে টের পাবে। সে মাতাল হত বটে কিন্তু কোন রকম হল্লা সে করেনি, শুধু মদের নেশায় বিভোর হ’য়ে পড়ে থাকত। তবু আমার ভয় হচ্ছিল—কি জানি যদি কোনো উপায়ে ঘটনা প্রকাশ হ’য়ে পড়ে! আমি ত খুব সাবধানে চলতাম। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম দিনের বেলা সে কখনো মদ খেতনা—কাজেই দিনের বেলা বেশ মন দিয়েই আমি দোকানের কাজ করতে পারতাম।”

পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ নীরব ছিলেন—সামাজিক প্রশ্নের উদয়

এক কাজ করলেই পারতে—পিঁপে ভরা মদ দোকানে রাখলেই পারতে। না হয় একটা ঘরে তাকে আটক করে রাখলে পারতে।'

"তা দাদাঠাকুর সে অসম্ভব—দোকানে আমার এত যায়গাই নেই। আর তাকে আটক করে রাখবার কথা?—তা কোথায় রাখব? সে আমার ঘরেই থাকত কিন্তু আমি ঘুমুলে কিম্বা একটু এদিক ওদিক হলেই সে দরজার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেত—তাকে ধরে রাখা মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। নেশা মানুষকে পিশাচ করে ফেলে—তার আত্মার স্বাধীনতা আর থাকেনা—সে একেবারে নেশার দাস হয়ে পড়ে। নেশা মানুষকে পাগল করে তোলে—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান, সদসৎ বিবেচনা তার লোপ পায়—শেষে এমনি হয়ে দাঁড়ায় যে সে অন্যের সর্ব্বনাশ ক'রে হলেও তার তৃষ্ণা মেটাবার পন্থা করে নেবে! সে যাক।—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। আমার কাছে আর এসব সহ্য হতনা—চোখের সামনে পরদা টেনে দিতাম—দেখেও দেখতাম না, ক্রমে সে বিপদে পড়তে আরম্ভ করলে—এক বিপদ থেকে আর বিপদ—তা থেকে আর এক বিপদ! সে সব বলে দরকার নেই। আমি একেবারে হয়রাণ হয়ে গেলাম—রাগে অন্ধ হ'য়ে শেষে ঐ অপকর্ম্ম করেছি।"

"কতদিন হ'ল তুমি তাকে—?" আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সে কাড়িয়া লইয়া বলিল—"খুন করেছি?—সে আজ পাঁচ বছরের কথা—ঠিক তারিখটা আমার মনে নেই—তবে সেটা ছিল শীতকাল—মাঘমাস, আর সেদিন বড্ড শীত পড়েছিল। কিন্তু আমি তাকে খুন করেছি একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলুম—সেই বিষই তাকে মেরেছে—আমি নয়।"

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাঁচবছর! তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ তার খোঁজ নেয়নি? আশ্চর্য্য বটে।"

"খোঁজ করেছিল বটে—কিন্তু আমি আদত ঘটনাটা গোপন করে বলেছি 'আমি জানিনা তার কি হয়েছে, হটাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি যে সে নেই—অনেক খোজ করেছি কিন্তু আমার সাধের মিনিকে আর ফিরিয়ে পেলামনা। তারাও এ'তেই সন্তুষ্ট হয়ে গেল।"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

আমরা দুজনে মনে মনে ভাবিতেছিলাম "কি কুটীল!" "কি ধূর্ত্ত" আমাদের মনে ভয়ানক একটা ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তাহা প্রকাশ হইতে দিলাম না। তার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া উঠিবনা, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম--"পুলিস কি এর কোন প্রকার অনুসন্ধান করেনি? কিম্বা কাকেও সন্দেহ করেনি?"

"পুলিস!"—সে হাসিয়া বলিল—"পুলিস—সহরের পুলিস তেমন ছেলেই নয় যে কোথায় কে হারিয়ে গেল বা কার জিনিষ খোয়া গেল এ সবের খোঁজ করে বেড়াবে—বিশেষ যদি উপরওয়ালার তাম্বি না পড়ে। আর তাদের সময়ইবা কোথায়? তারা স্বদেশীর গন্ধে পাগল—খুনের খবর রাখেনা। আর এখানেত তাদের কোনো দোষই দেওয়া যেতে পারেনা—কারণ আমি পুলিসে খবরই দেইনি। সে যাই হোক—এঘটনার এখানেই শেষ—তারপর বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল—সকলে ঘটনাটা ভুলেই গেল—কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি।"

আবার ধীরে ধীরে বলিল "আমি ভুলতে পারিনি। তা কেমন করেই বা ভুলব—আমি সর্ব্বদাই আমার চোখের সামনে বিভীষিকা দেখতুম—সে আমার সুমুখে ভেসে বেড়াত—বিশেষ একা একা যখন আমার ঘরে বসে থাকতাম।—তখন দেখতাম সে যেন আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি ভয় পেতাম কিন্তু তবু আমি একথা বলতে পারিনা যে এজন্য আমি অনুতাপ করেছি, তা কখনই না; শুধু দুঃখ হত যে একাজ আমাকে করতে হয়েছিল।—সে তার নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেছিল—আমি একটা উপলক্ষ মাত্র।"

আমি প্রশ্ন করিলাম—'তার সে শরীরটা কি করে সরিয়ে ফেল্‌লে ?,'

আমি দেখিলাম সে একটু কেমন কেমন করিতেছে। মনে হইল সে যেন আমাকে সন্দেহ করিতেছে—হয়ত তাহার এ গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে বিচারকের সম্মুখে হাজির করিব। সে সেই মুহূর্ত্তে আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম —'প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—পালন করিব—ভয় নাই।'

একটু আশ্বস্ত হইয়া সে বলিল—"আমি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছি !"

"পুঁতে ফেলেছ !" আমি ভীত চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি ভাবে ? কখন ? কোথায় ?"

বাড়ীর আঙ্গিনার এক কোনে একটা আমগাছ-তলার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক বৃদ্ধ উত্তর করিল—"ঐ ওখানে,—একটা গর্ত্ত আগেই ওখানে ছিল। যখন দেখলাম তার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে—হৃদপিণ্ড আর নড়ছে না, তখন ঐ গর্ত্তে ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে ফেললুম।" এই কথাগুলি এত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল যে তার কথার ভঙ্গিতে মনে হইল যেন খুব একটা বাহাদুরীর কাজ সে করিয়াছে।

আমরা দাঁড়াইয়া পড়িলাম—ভয়ে আমাদের শরীর কাঁপিতেছিল। কোনও কথা আমাদের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না—এত ভীত হইয়াছিলাম ! আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—"একটু পান তামাক খেয়ে যাবে না ?" ঘৃণাভরে উত্তর করিলাম "হায় রমণী ! মদখেয়ে শেষে তোমার এমন দুর্দ্দশাই হ'ল।"

কেনারাম হাসিয়া বলিল "রমণী ? কে বল্লে সে রমণী ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। সে কোনো মেয়েমানুষ নয়—সে আমার পোষা বেড়াল মিনি ! সে মদের গামলাথেকে মদ খেত, মাতাল হয়ে কোন দিন বা সেই গামলাতে পড়ে হাবু ডুবু যেত।"

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম

যে বেচারী কেনারামের স্ত্রীও নয় কিম্বা কোনো মানুষও নয়। পণ্ডিত মহাশয় হোঃ হোঃ করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরা আবার বসিলাম—পান তামাক খাইয়া বিদায় লইলাম।

নবীন সাহিত্যিকের কলমের খোঁচায় পর দিনই তাহা সহরে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রার্থনা।

সুবিমল প্রভাতের অরুণ আলোকে,
হাসিল যখন পৃথ্বী শ্যাম সুষমায়,
স্বর্ণ বর্ণে গিরি নদী রঞ্জিয়া পুলকে
পূরবে উঠিল ভানু ছাড়িয়া ধরায়,
মর জগতের এই অনন্ত সুষমা
বিস্ময়ে হেরিল যবে বিশ্ববাসীগণ,
সারা বিশ্বভরা স্নিগ্ধ মোহন-প্রতিমা
ফুটিয়া উঠিল যবে মানস মোহন,
তোমার বন্দনাগীত বিহগ কাকলী
উঠিল গাহিয়া ; মৃদু মলয়-নিশ্বাস
পুষ্পিত-পল্লব-শাখা সাদরে আন্দোলি'
দিয়ে গেল প্রাণে কানে তোমার আভাস।
স্তিমিত নয়নে, দেব! জানিনা সাধন,
নীরবে হৃদয়ে তুমি কর আগমন।

শ্রীভুবন মোহন লাহিড়ী এম্ এ।

পাণিপথ ভ্রমণ।

গত ১৮ই ফাল্গুণ আমরা চারিজনে দিল্লী হইতে পাণিপথে গিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে হিন্দুকলেজের দুইজন পাঞ্জাবী ছাত্র

ছিলেন, তন্মধ্যে একজনের জন্মভূমি সেই স্থানে। সুতরাং আমাদের পক্ষে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পানিপথের ঐতিহাসিক স্থানগুলি ভালরূপে দেখিয়া লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দিল্লী হইতে পাণিপথ পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত, ট্রেনে তিন ঘণ্টায় যাওয়া যায়। পাণিপথ ষ্টেসন হইতে কিছুদূর যাইলেই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পাওয়া যায়। এই রাস্তা ধরিয়া ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিয়া আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইব্রাহিম লোদির সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও হত হন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের পাঠান গৌরব-রবি চিরঅস্তমিত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের বহুকালস্থায়ী সুদৃঢ়ভিত্তি প্রথম স্থাপিত হয়। এখন চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী শস্যাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে।

একটী অনতিউচ্চ প্রস্তরমঞ্চ ইব্রাহিম লোদির সমাধিস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহার উপরে উঠিতে দুই ধারে সিঁড়ি আছে। ইহার শ্বেত প্রাচীর গাত্রে এই যুদ্ধের ইতিহাস উর্দ্দুতে সংক্ষেপে লেখা আছে এবং এই লিপি পাঠে জানিতে পারা যায় যে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহার পুনঃসংস্কার করেন। ইহার গাত্রসংলগ্ন একটি উচ্চস্থান বাদ্‌শার সহিত নিহত তাঁহার প্রিয় হস্তীর সমাধি বলিয়া স্থানীয় লোককর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ এই স্থান হইতে আরও ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ দূরে হইয়াছিল। স্থানটীর আধুনিক নাম কাবুলবাগ।

ইব্রাহিম লোদির সমাধির সন্নিকটেই পুরাকালের দেবীমন্দির ও দেবী পুষ্করিণী রহিয়াছে। পুষ্করিণীর জল অতি স্বচ্ছ, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র বাগানের মধ্যে অবস্থিত, একপার্শ্বে শীতলা দেবীর একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ছোট ছোট চতুষ্কোণ, ক্রমসূক্ষ্মশীর্ষ, ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা নাকি রোগমুক্ত ভক্তদিগের শীতলা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞতার ও ভক্তির নিদর্শন।

এই পুষ্করিণীর পার্শ্বেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পুরাতন মন্দির উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। একটী মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তির প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিকৃতি দেখিলাম, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব হননাশঙ্কায় ভীত অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্বোধন করিবার জন্য ভগবান এই মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটির গঠন অতি পরিপাটী। ভারতের প্রাচীন যুগের উন্নত ভাস্কর্য্যের অতিসুন্দর নিদর্শন। পুরোহিতের মুখে শুনিলাম যে মূর্ত্তিটীর বয়স নাকি প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর হইয়াছে। নিকটস্থ হিন্দু কিল্লার ধ্বংশের পর তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্থানে ইহা রক্ষিত হইয়াছে। একটী মন্দিরে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মন্দিরটী তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের সময় মারহাট্টাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। বোধ হয় যুদ্ধের পূর্ব্বে মারহাট্টা বীরেরা এই মন্দিরে দেবীর উপাসনা করিতে আসিতেন। সম্মুখে একটী মন্দিরে দেবীর অষ্টভূজা মূর্ত্তি রহিয়াছে। আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভকৎসিংহ নামে থানেশ্বর বাসী জনৈক ধনী এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বেই বাবা শিবগিরি নামক জনৈক সাধু পুরুষের সমাধি রহিয়াছে। উপরকার খোদিত লিপি পাঠে বুঝিলাম যে সবে মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর হইল তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স শতাধিক বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বে তিনি পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রনজিৎসিংহের প্রিয়সহচর ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া কঠিন যোগসাধনায় নিযুক্ত হন এবং এই মন্দিরের ভিতর কেবল পঁচিশ বৎসর তিনি নীরব সাধনায় ছিলেন। এস্থানবাসীরা বলেন যে এইপ্রকার মহাপুরুষ ভারতের এই প্রান্তে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সাধনার স্থলে উচ্চপদস্থ বহু দেশী ও বিদেশী লোকের সমাগম হইত।

ইহার পরই আমরা সেখ কালন্দার সাহেবের সমাধিস্থান দেখিতে যাই। মস্‌জিদস্থিত সেখদিগের নিকট শুনিলাম যে কালন্দার সাহেব (৬০৫—৭২০) হিজরীতে জীবিত ছিলেন এবং সম্রাট আলাউদ্দিন

খিলিজি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ৬৭০ হিজরীতে আলা-উদ্দীনকে আমরা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে দেখিতে পাই; সুতরাং তিনি যে কালন্দার ফকিরের সমসাময়িক সে বিষয় সন্দেহ করিবরি কোন কারণ দেখিলাম না। মস্‌জিদটীর গঠন দিল্লীর নিজামুদ্দিনের সমাধি মন্দিরের ন্যায় নিপুন স্থপতিদিগের সূক্ষ্মপ্রতিভার পরিচায়ক। ইহার সমস্ত থামগুলিই কাল কষ্টিপাথরের। ভিতরে সেখ কালন্দারের সমাধি রহিয়াছে। পার্শ্বস্থিত কক্ষে এই প্রকার আর একটী সমাধি দেখিয়া, সেটি কাহার জিজ্ঞাসা করায়, একটী কৌতূহলোদ্দীপক উত্তর পাইল্যম। উত্তরদাতা কহিলেন, যে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজির বহুকাল পর্য্যন্ত কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। সেই জন্য তিনি অর্দ্ধভারতের অধীশ্বর হইয়াও পুত্রাভাবে সর্ব্বদাই ম্রিয়মান থাকিতেন। ফকির কালন্দার সাহেব সম্রাটের মনঃকষ্টের কারণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, যদি তিনি ফকিরের কথানুযায়ী কার্য্য করেন তাহা হইলে তিনি পুত্রলাভে সমর্থ হইতে পারেন। সম্রাট সম্মত হইলেন। কালন্দার তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তাঁহার পুত্রগুলির মধ্যে কনিষ্ঠটিকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে শীঘ্রই আলউদ্দিনের চারিটী পুত্র সন্তান হইল; তখন তিনি ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত কনিষ্ঠ পুত্রটিকে ফকিরের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। এই বাদশাহপুত্রই ফকিরের নিকট তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ও পালিতপুত্রের ন্যায় চিরজীবন কাটাইয়াছিলেন এবং সেই নিমিত্তই সেখ কালান্দারের সমাধির পার্শ্বকক্ষেই ইহার সমাধি রহিয়াছে। মন্দিরের ভিতর কিঞ্চিৎ দর্শনী দিতে হইল এবং বাহিরে আসিয়া দেখি কালীঘাটের কাঙালীর ন্যায় একদল ভিখারী জুটিয়াছে।

পানিপথে প্রাচীন যুগের ভগ্ন মন্দির এবং উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত ধ্বংশ প্রাপ্ত কতিপয় দুর্গের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। আধুনিক সহরটী পুরাতন ছাঁচেই গঠিত। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশহাজার; তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান; দেখিতে সুশ্রী কিন্তু বড় অপরিষ্কার। এই টুকু ক্ষুদ্র সহরের ভিতর সাতটী কটন মিল আছে।

প্রত্যাগমনের সময় নূতন জৈন মন্দিরটী পরিদর্শন করিলাম। তিন বৎসর হইল এখানকার ধনী জৈন অধিবাসীরা বহুমুদ্রা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার চিত্রবিচিত্রিত দেওয়ালে রামের বনগমনের একটী ছবি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

পাঞ্জাবী ছাত্রটী অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইলেন এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তাঁহাদের রীতি অনুসারে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলা বাহুল্য যে সেখানে জলযোগের ব্যবস্থা বেশ সুন্দর হইয়াছিল। এইরূপে পথপর্য্যটনের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীবঙ্কুবিহারী গুপ্ত।

রণশেষে ।

"তুর্কী এসেছে দুর্গ দুয়ারে অর্গল কর রুদ্ধ
পরিখার জল তরল আবীর ক্ষান্ত এখন যুদ্ধ।
ছিন্ন শরীর হিন্দু বীরের কবন্ধ রাশি রাশি,
রক্ত পিপাসু মত্ত তুরুক হাসিছে অট্ট হাসি।
দুর্গ অঙ্গনে অঙ্গনা যত সঙ্গীত গাহি ধীরে,
চিতার শয্যা করগো সজ্জা মুছিয়া নয়ন নীরে।
(হেথা) দুর্গ দুয়ারে তুর্কী সোয়ার রয়েছে রুধিয়া পথ,
(আর) স্বর্গ দুয়ারে লইতে তোদের আসিছে কনক রথ।
চন্দন তরু গন্ধ ছুটায়, বহ্নি মূর্ত্তিমান্,—
অগ্নি মাঝারে ভগ্নী সকল সার রত্ন কর দান।"
শত মঞ্জীর উঠে গুঞ্জরী অলক্ত রঞ্জিত পদে।
দুর্গ প্রাচীর চূর্ণ করিল তুর্কী বিকট নাদে।
হাস্য আননে ভষ্ম নারীরা, দেখে বিস্ময় লাগে,
কহিল তখন যবন সেনানী "জয় আজ কা'র ভাগে?"

শ্রীঅনুপম চন্দ্র রায় বি, এ

মৌলিকতা।

বিশ্বসংসারে সর্ব্বপ্রধান মৌলিক পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। মৌলিকতা জিনিসটী কল্পনাও নহে, পাগলামীও নহে,—গোপনের আবিষ্কারই মৌলিকতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক সত্য জিনিস আছে যাহার সন্ধান আমাদের জানা নাই, অথচ যাহা আবিষ্কৃত হইলে আমরা নতমস্তকে তাহাকে স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা মিথ্যা, যাহা সত্যের কোন ধার ধারেনা—সেই যদি তাহার পৃথক অস্তিত্বের জন্য একটা মৌলিকতা দাবী করে, তবে কখনই সেই অন্যায় আব্দার মঞ্জুর হয় না। সংসারে যাহারা মৌলিকতার জন্য শ্রেষ্ঠ তাহারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠতাটুকু না থাকিলে তাহা দ্বারা এমন কোন কাজই হইত না যাহা বিশ্বের মানুষকে সত্য দান এবং আনন্দ দান করিতে পারিত। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সকলে যেখানে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসে তাহার শক্তি তারই বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায় এবং সেখানে জয়লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠে। আমরা যেখানে অসাধারণ কিছুই দেখিতে পাইনা তাহার শক্তি সেইখানে অনন্ত বিচিত্রতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আমাদের সম্মান এবং বিস্ময় আকর্ষণ করে। যেখানে আমরা পরাস্ত সেইখানেই তাহার জয়,—যেখানে আমরা পঙ্গু সেখানেই তার শক্তির বিকাশ। আমরা যাহা প্রতিনিয়ত দেখিয়া আসিতেছি, যাহা আমরা ভাল করিয়া জানি বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই মহাপুরুষ আসিয়া দেখাইয়াছেন যে আমরা তাহার কিছুই দেখি নাই এবং বুঝি নাই। তখন আমরা স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে এবং বুঝিতে পারি যে এ কথাই সত্য; আমরাই এতদিন ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম আর ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে কেমন করিয়া আমরা এই সামান্য ভুলকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি; আমরা বুঝিতে পারি না, কেমন করিয়া এই প্রত্যক্ষ সত্যটা আমাদের চোখের আড়ালে পড়িয়াছিল।

এই জন্যই মৌলিকতাদ্বারা মানুষ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; মনুষ্য সমাজ তাহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে। মৌলিক পুরুষ জগতের আদর লাভ করে কারণ সে জগৎকে এমন কিছু দান করে যাহা জগতের নিজের জিনিস অথচ তাহা সে হারাইয়া বসিয়াছিল।

বিশ্বনিখিলের কত সত্য এইভাবে তাহাকে অহরহ ফাঁকি দিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই; যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জননীর এই হারাধন গুলিকে কুড়াইয়া আনিয়া আপনাদের জীবন সার্থক করিয়া যাইতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর এক পুণ্যলগ্নে ইংলণ্ডের মাটীতে সেক্সপীয়র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি জগৎকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহা দুর্লভ কিন্তু সে সব তাঁহার নিজের জিনিস নয়,—বিশ্বের জিনিসকেই তিনি বিশ্বের দরবারে হাজির করিয়াছেন। আমরা সে সব দেখিয়া বলিতে পারি যে এ গুলিত আমাদেরই নিজের জিনিস,—আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ইহাদের পরিচয় পাইতেছি। সে কথা সত্য সন্দেহ নাই;—জিনিস আমাদেরই কিন্তু আমরা এ সব হারাইয়া বসিয়াছিলাম। তাই যিনি এগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন তাঁহাকে আমরা যুগে যুগে পূজা করিয়া আসিতেছি। সেক্সপীয়র আমাদেরই মত তার স্বদেশের জলস্থল আকাশের কোলে পালিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন; আমাদেরই মত জীবন সংগ্রামের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার আপন পথ খুঁজিয়া লইতে হইয়াছিল; সুখেদুঃখে এম্নি ভাবে তাহার বক্ষদেশ স্পন্দিত হইত। তবু তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ কারণ আমরা সংগ্রাম করিতে করিতে হাসিয়া কাঁদিয়া স্রোতের সাথে ভাসিয়া যাই, কোন বেদনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি না, কিন্তু সেক্সপীয়র প্রত্যেক আঘাতের মূলে বিশ্বমানবের হৃদয়ের উৎস খুঁজিয়া বেড়াইতেন, নরনারীর জীবনযাত্রার পশ্চাতে কখন কোন রাগিনীটি বাজিয়া উঠে তাহাই ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। নরনারীর এই সংসারক্রীড়ার চিত্র আঁকিয়াই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ককে

তিনি সম্মান করিতে জানিতেন বলিয়াই এত সব গভীর সত্য জীবনে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সবই ছিল তাঁহার কাব্যের সামগ্রী। ইহারই মধ্যে তিনি তাঁহার প্রতিভাবলে কত সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহারি মধ্যে হাসিকান্নার কত চিত্র, আশা নিরাশার কত উচ্ছ্বাস, প্রেম প্রীতির কত বিচিত্র অভিনয়,মানব চরিত্রের নিভৃততম প্রদেশকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এ সবই সংসারের চিত্র ; তাঁহার সম্মুখে যে সমাজ জীবনের ক্রীড়ায় চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেক্সপীয়র সেইখান হইতেই তাঁহার কাব্য সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার প্রত্যেকটী সৃষ্টিই মৌলিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যাহা ঘটে তাহার মধ্যে মানব চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তোলাই কবিত্ব ; যাহা কখনও ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও অল্প তেমন সৃষ্টির মূল্য খুবই কম, সেই হিসাবে মৌলিকতার বিচার করিতে গেলে আমাদের বিচারের যে শুধু মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ে তাহা নহে, বিচারের কোন প্রয়োজনই থাকে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মৌলিক হওয়ার আশা কম, কিন্তু একথা কখনই সত্য নয়। হীনধীসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ইহা একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে কিন্তু প্রতিভাবান পুরুষ যুগে যুগে মৌলিক সৃষ্টি দ্বারা অমর হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

Lytton এর Flower-girl মৌলিক সৃষ্টি, তাহা বাস্তব জগতে অসম্ভব নয় ;—হয়ত লিটন্ কোন জীবিত মূর্ত্তি দেখিয়াই এই ছবিটি আঁকিয়াছেন কিন্তু সেজন্য তাহা মৌলিক নয় একথা বলা নিতান্তই ছেলেমানুষী। বাস্তব জগতে যাহা ঘটে তাহা হইতেই কবিগণ নানা প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। একেবারে কিছু না হইতে কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না। ভূদেব বাবু বলিয়াছেন—পক্ষীরাজ ঘোড়াও ঘোড়ার পিঠে পাখীর পাখা সংযোজনা করিয়াই সৃজিত হইয়াছে। পৃথিবীতে

পক্ষীরাজ ঘোড়া একটা খুবই আশ্চর্য্য জিনিস হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থলচর অশ্বের পৃষ্ঠে খেচর পাখীর পাখা দুইটী সংযোজনা করিয়া যে প্রাণীটি সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অসম্ভব রকমে নূতনত্বের দাবী করিতে না পারিলেও কবির মৌলিক সৃষ্টি; মৌলিকতার ষোল আনা দাবী করিবার ক্ষমতাই তাহার আছে। এইরূপ আরও অনেক অদ্ভুত সৃষ্টি সকল দেশের সাহিত্যেই আছে। তাহা একেবারে শূন্য হইতে কল্পিত হয় নাই; আমাদের হাতের কাছে যে সব উপকরণ আছে সে সব মিশাইয়া নূতন জিনিস সৃষ্টি করিতে হয়।

এই হিসাবে Flower-girl লিটনের মৌলিক সৃষ্টি কিন্তু বঙ্কিম বাবুর অন্ধফুলওয়ালী কখনই মৌলিকতা দাবী করে না—বঙ্কিমবাবু রজনীর ভূমিকাতেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অন্ধফুলওয়ালীর মত চরিত্র সৃষ্টি করা যে তাঁহার শক্তির পক্ষে অসম্ভব ছিল এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। দুইজন কবি এক কিম্বা ভিন্ন সময়ে একই চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন। সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের কোনও কালে কিছু সম্পর্ক ছিল না, তথাপি মিরন্দা চরিত্রের সহিত শকুন্তলা চরিত্রের কিছু কিছু ঐক্য অনেকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই দুই চরিত্রে বিশেষ কোনও সমতা না থাকিলেও অবস্থার ঐক্য আছে সন্দেহ নাই, যিনি অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়িয়াছেন টেম্‌পেষ্ট (Tempest) পড়িবার সময় তাঁহার শকুন্তলার কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শকুন্তলা এবং মিরন্দা কালিদাস এবং সেক্সপীয়রের মৌলিক সৃষ্টি। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, দুইটী ভিন্ন কবি কেমন করিয়া এত কাছাকাছি গিয়া পড়িলেন এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে।—একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি যে বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক ইতিহাসের মধ্যে অনৈক্য থাকিলেও সমগ্র মানবেতিহাসের মধ্যে ঐক্যের যথেষ্ট বন্ধন আছে। মানব চরিত্র বাল্মিকী ব্যাসের সময়ে যেরূপ ছিল আজিও প্রায় তেমনি রহিয়া গিয়াছে; এবং সর্ব্বসময়েই যাহা এক দেশে যথার্থ সত্য তাহা সমস্ত পৃথিবীতেই সত্য; কারণ বিশ্বমানবের সত্য এক। ইংলণ্ডে এবং জার্ম্মেনীতে যেমন পিতা পুত্রকে, ভাই ভগিনীকে,

স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, গ্রীসে এবং ভারতবর্ষেও তেমনি পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগ্নী এবং স্বামীস্ত্রীর ভালবাসার বন্ধন অটুট রহিয়াছে। সেই জন্য যাহা কালিদাসের সময়ে ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সেক্সপীয়রের সময় ইংলণ্ডেও সম্ভব হইতে পারিয়াছিল এবং দেশে দেশে যুগে যুগে ইহা সংঘটিত হওয়ার পথে কোন বাধা থাকিবে না।

তথাপি যখন বলা হয় যে আয়েষা বঙ্কিম বাবুর মৌলিক সৃষ্টি তখন অনেকেই ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র যে বয়সে দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন তখন পর্য্যন্ত তিনি Ivanhoe পড়েন না?—এ কেমন কথা?—কথা কেমন জানিনা, কিন্তু মানুষ কেমন করিয়া যে বঙ্কিম বাবুকে অবিশ্বাস করিয়া,—তিনি Ivanhoe পড়িয়াছেন,—এই কথাটাই জোড় করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে তাহাত বুঝিতে পারি না। হইতে পারে Ivanhoe না পড়াটা একটা মস্ত অপরাধ কিন্তু এই অপরাধের জন্য একজনকে তাহার মৌলিকতার খ্যাতিটুকু হইতে বঞ্চিত করা কোন মতেই উচিত নয়। মানব সমাজ দুই জনকেই উপকরণ যোগাইয়াছে. সুতরাং সহস্র বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?—Spenser এর Fairy Queen এর সাথে আমাদের দেশের মধুমালার কাহিনীর সাদৃশ্য আছে অথচ Spenser এর চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কোনও ব্যক্তি উক্ত নায়িকার আখ্যা কস্মিন কালে শ্রবণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

এ সব ত বড় কথা, অতি সামান্য বিষয়েও আমরা এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। যাহা বঙ্কিম বাবু লিখিয়া গিয়াছেন তাহার কোনও কথা একজন সামান্য ব্যক্তি ও লিখিয়া ফেলিত পারে; বড় দার্শনিক যে সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা হয়ত একজন নগণ্য ব্যক্তি একদিন আবিষ্কার করিতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এসব অবান্তর বিষয় লইয়া কত অশোভন কাণ্ড হইয়া থাকে। “ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়” কথাটা রবীন্দ্র বাবু আগে লিখিয়া—

না দ্বিজেন্দ্র বাবু আগে লিখিয়াছেন—মৌলিকতার আলোচনা করিবার সময় একথা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

পৃথিবীকে নূতন কিছু দিতে গেলেই সে রুখিয়া বসে—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। এইজন্য যুগে যুগে মহা পুরুষগণ অনেক অত্যাচার এবং অবিচার সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু অবশেষে পৃথিবীর মানুষই তাঁহাদিগকে পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছে। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে একথা বলায় গ্যালিলিও (Galileo) যাহাদের হাতে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন—তাহাদেরই বংশধরগণের নিকট আজ সেই সত্যকে স্বীকার না করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। সক্রেটিশ (Socrates) জগতকে নূতন সত্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল কিন্তু আজ সমগ্র জগৎ তাঁহাকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।—ইহার কারণ এই যে লোকসাধারণ অভ্যস্ত জীবনকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যে কোন নূতন সত্যকে সে সহসা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। সাহিত্যজগতেও দেখিতে পাই মহাকবিগণ প্রায়শঃই জীবদ্দশায় যশস্বী হইতে পারেন নাই। প্যারাডাইজ লষ্ট ((Paradise Lost) কিম্বা মেঘনাদবধের আজ যে পরিমাণ আদর হইয়াছে—উহাদের প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময় তদপেক্ষা অধিক অনাদর হইয়াছিল। রোহিণীচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আমরা শিল্পীকে প্রশংসা করি, কারণ উহা এমন ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে যে পাঠকের চেষ্টা ব্যতীত রোহিনীর প্রতি একটা ঘৃণা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। অথচ আমরা বিনোদিনীচরিত্র পাঠ করিয়া লেখককে অভিনন্দন করি না, কারণ বিনোদিনী আমাদের নিকট যতটুকু শ্রদ্ধা দাবী করে ততটুকু আমরা দিতে পারি না। কুন্দনন্দিনীকে বোধ হয় আমরা ঘৃণাও করি না শ্রদ্ধাও করি না, তাহাকে বরঞ্চ কৃপা (pity) করিয়া থাকি। কাজেই আশা করা যাইতে পারে যে বিনোদিনী চরিত্রকেও আমরা একদিন শ্রদ্ধা করিতে পারিব। এই চরিত্র সৃষ্টি মৌলিক বলিয়াই বাঙালী পাঠক আজও ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারে নাই।

মানুষ তাহার এই গোঁড়ামির জন্য অনেক ভুগিয়াছে কিন্তু এই ক্ষতি স্বীকার করায় তাহার লাভ আছে বলিয়াই সে ঠেকিয়া ঠেকিয়া মাথা নত করিতে বাধ্য হইতেছে, তবু প্রথমেই কোন সত্যকে এক-চোটে স্বীকার করিয়া লইতেছে না। মানুষের এই স্বভাবকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। গ্রহণ করিবার আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়াই উচিৎ। Parliamentএ House of Lordsএর এই দিক হইতে বিশেষ একটা মূল্য আছে বলিয়াই এত বিপ্লবের মধ্যেও উহা টিঁকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ চিরকালই গুণগ্রাহী; অনেক সময় সে যথার্থ গুণীব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বিলম্ব করে সত্য কিন্তু কাহারও প্রতিভা কোনও দিনেই অনুপলব্ধ থাকে না।

জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন প্রত্যেকেই অসংখ্য বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আপনাদের পথ খুঁজিয়া লইয়াছেন। বিঘ্ন ছাড়া উন্নতি অসম্ভব; এই জন্যই মহাপুরুষদের জীবন সংগ্রাম কোলাহলে এমন মুখরিত। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই এসকলের মূল কারণ মৌলিকতা। সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে সকল বিষয়েই একথা সত্য। কারণ মৌলিকতা ব্যতীত কেহ বড় হইতে পারে না অথচ মৌলিক সত্য চিরকালই বাধার ভিতরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা মৌলিক চিন্তা করেন তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজকে অতিক্রম করিয়া যান, সেই জন্যই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমাজ রুখিয়া বসে। সংস্কারক রামমোহনকে আমরা একদিন নিজের সমাজ, আত্মীয়স্বজন, এমন কি আপন জন্মদাতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াছি অথচ আমরা কিছু মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কারণ ভবিষ্যৎ ভারতের যিনি ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন তিনি সকল বিষয়েই দেশের চিন্তাস্রোতকে ঠিক পথে প্রবাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘুমন্ত দেশ তখন যথার্থ বন্ধুকে চিনিতে পারে নাই বলিয়াই ঘরে চোর ঢুকিয়াছে মনে করিয়া অন্ধকারের ভিতর কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

আমরা মহাপুরুষদের জীবন অনুকরণ করিতে চাই। অনুকরণ করা-

টাই আমাদের স্বভাব ; আহার, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ সকল বিষয়েই আমরা অনুকরণের দাস। কিন্তু ইহাকে বেশি দূরে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। জীবনকে গঠিত এবং চালিত করা অতি বৃহৎ ব্যাপার ; এখানে অনুকরণের অধিপত্য যাহাতে স্থান লাভ করিতে না পারে সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ অন্যের জীবনকে আমরা ঠিক মত অনুকরণ করিতে পারি না। এদিকে আমাদের গঠনপ্রণালীও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না। আমরা মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করি অনুসরণ করিবার জন্য—অনুকরণ করিবার জন্য নয়। জীবনকে গঠিত করিয়া তোলাতেও যথেষ্ট মৌলিকতার দরকার। বিভিন্ন মানুষের জীবন বিভিন্ন রকমের। শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা ঠিক একরূপ হইতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্যকে যাহারা সম্মান করিয়া চলে তাহারা জীবনে উন্নত হইতে পারে। আমাদের স্বাভাবিক মতি গতিকে সংসারের সহিত মিলাইয়া চালিত করিলে তাহা যেমন সুস্থ হয় আমাদিগকেও তেমনি উন্নত করে। কিন্তু এদিকে অনেকেরই বিশেষ দৃষ্টিপাত নাই কারণ অনেকেই এ কথাটা জানে না। এই স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করিয়া চলিলে নিজের শক্তির সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয় এবং তাহা কেবল আমাদিগকে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। সংসর্গের দোষ তখন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন আমরা অন্য কাহারও দ্বারা চালিত হই না, সেই অবস্থায় আমরাই আমাদের একমাত্র যথার্থ চালক। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাই তাহাদের জীবন ধারণ ব্যাপার কেমন মৌলিক। তাঁহারা অনেককে অনুসরণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই। তাঁহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্যই চারিদিকের সমস্ত ঘটনাতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এক গুঁয়েমীটা মানব সমাজে তত দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

আমরা মৌলিকতার বিচার লইয়া মারামারি করি—অন্তর্যামী বোধ হয় ইহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। বিশ্বনিখিলে তিনিই

একমাত্র মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন, কারণ—He is only original for he is *the* original.

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

বিদ্যুৎ।

একি চঞ্চল পাদবিক্ষেপ
ওলো জীমুতের মেয়ে;
অঞ্চল এঁটে চঞ্চল বেগে
কোথা ছুটেছিস্ ধেয়ে?
নাহি হেরি তোর লজ্জা সরম,
শঙ্কা বিপদ, করম ভরম;
বঙ্কিম রোষে একিলো বিষম
শঙ্কিল পথে ছুটেছিস্;
সন্ধান লাগি কার পিছু ওলো
উন্মনা হয়ে চলেছিস্?

অম্বর ব্যাপি নীরদ বৃন্দে
ভৈরব নব নৃত্য!
আঁধারে জগৎ অন্ধ ভীষণ,
শঙ্কা জড়িত চিত্ত।
সহসা চমকি বিদারি আকাশ,
একি বিদ্যুৎ করিলি প্রকাশ?
অন্ধ জগৎ আলোকে সহাস
ঝঞ্ঝা হেরিল সমুখে;
ভীষণ আঁধারে ক্ষুদ্র আলোক
জ্বলিয়া নিভিল পুলকে।

একি চঞ্চল গতিবিধি তোর
ওলো উজ্জ্বলাবরণী ;
ভয়বিহ্বল-চকিত পরাণে
চমকি চাহিছে ধরণী !
মহা প্রলয়ের আগে ছুটে যাস্,
তীক্ষ্ণ অগ্নি করিয়া প্রকাশ,
গুম্ গুম্ রবে বিদারি আকাশ
বজ্র হানিয়া প্রাকারে ;
আঁধারে ক্ষণিক আলোক জ্বালিয়া
খুঁজিয়া মরিছ কাহারে ?

একি ভৈরব নর্ত্তন ওলো
অম্বর-বর-দুহিতা !
অট্ট হাস্তে প্রকাশি গগন
খুঁজিছ কি নব সবিতা ?
একাকী ফিরিছ চিরনিশিদিন,
কারো কাছে কিগো আছে প্রেম-ঋণ ?
বিশ্ব রাজ্যে সঙ্গীবিহীণ
ঘুরিছ অন্ধ গহনে ;
অন্তরতম কারে রাখিয়াছ
অন্তরে সুখ-গোপনে ?

আপন গরবে ফাটিয়া উঠিছ,
ছুটিছ ঊর্দ্ধশ্বাসে,
যদিও ক্ষুদ্র তবুও রুদ্র,
তীব্র যেন কি আশে !
জাননা তুমি যে শুধু নিমেষের,
বৃষ্টি বাদল ঝড় বাতাসের ;

নহ তুমি ওগো চিরবরষের
চির পুরাতন সাথী ;
তবুও অঙ্গ চির উলঙ্গ
রঙ্গ দিবস রাতি ?

ভুলাইতে তব চির কান্তিতে
করিছ কত কি কল্পনা,
মেঘের আড়ালে বসিয়া বিরলে
অন্তরতলে জল্পনা।
রঙীন বস্ত্রে পরি নব বেশ,
এলায়িত করি সুচিকণ কেশ,
করিছ কতই মধুপ আবেশ
ললিত মাধুরী আঁকা।
জানি আমি তব আছে অপরূপ
চিরলাবণ্য মাখা।

একি উদ্দাম-উচ্ছাসময়ী
উন্মনারূপী রূপসী ;
অঞ্জন যুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন গতি রহসি।
কণ্টকে চির ছিন্ন চরণ,
প্রেমের আবেশে রক্ত বরণ,
আশপাশহ'তে তাকায় মরণ
পরাণে নাহিক ভয় !
শঙ্কা মরণ, লজ্জা সরম
সকলি করেছ জয় ?

চমকিত চিতচঞ্চল পদ
চুম্বিছে ধীরে ধরণী,

চাঁচর চিকুর চর্চ্চিত চূড়া
চম্পক চক বরণী !
নীরদ-রদ-নীল-রঞ্জন,
খরতর-গতি যেন-খঞ্জন,
নয়নে জড়িত নব অঞ্জন,
বন্ধন-যুত-হারা ;
চম্পকবতী বিদ্যুৎসতী
প্রেমবিহ্বলপারা !

ভীত-কম্পিত-ভীরু-এজগতে
আঁখিচঞ্চল কারিণী,
রাখ নর্ত্তন চিরদিবসের
বঙ্কিম ব্যোমচারিণী.
চিরপুরাতন আছ এজগতের,
চির উদাসীন মোহ আবেশের
প্রেমে চঞ্চল, চির পরাণের
খুঁজিয়া মরিছ সাথী ;
রক্তিমরাগে রক্ত কপোল
ফাটিয়া পড়িছে ভাতি !

রাখনর্ত্তন চিরপুরাতন
নর্ত্তন-ঘন-বালা ;
অঞ্চলে তব সঞ্চিত রাখ
কাঞ্চন-বর-মালা।
দুখের রজনী হইলে প্রভাত,
ঘুচিলে মনের অভিশম্পাত,
আপনি আসিয়া পাতি নিজ হাত
লইবে বরণ করিয়া ;
সেই দিন তুমি আপনারে দিয়ো
কাঙ্ক্ষিত পদে সঁপিয়া।

বীর বালক।

'মৃত্যু একটা কালো কষ্টি পাথরের মত"—রবি।

কালো কঠিন কষ্টি পাথরে কসিয়া যেমন সোনার পরীক্ষা হয়, মানুষ সত্য সত্যই মানুষ নামের উপযুক্ত কি না তাহারও তেমনি একজন পরীক্ষক আছে—সে পরীক্ষক মৃত্যু। মানুষের ভিতরেও যে দেবতা আছে তাহার পরিচয় পাই আমরা মৃত্যুতে। বিপদের ঘনান্ধকার যখন চারিদিক হইতে আপনার করালবদন ব্যাদান করিয়া শত শত নরনারীর বুকের উপর তাহার নিষ্ঠুর আসন পাতিয়া বসে, তখন আপনার ধ্বংশ স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সেই ভীষণ মৃত্যুদৈত্যের সম্মুখীন অনেকেই হইতে পারে, কিন্তু যখন চোখের সম্মুখে দেখা যাইতেছে যে আমার বাঁচিবার উপায় আছে,--আপনার উদ্ধার আপন হাতে,—শুধু আমি বাঁচিতে গেলে আর একটি প্রাণ বাঁচিবে না—এইরূপ জানিয়া শুনিয়াও স্থির ধীর চিত্তে আর একটি প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই জীবন বিসর্জ্জন করা সাধারণ মানুষের কাজ বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুর করাল ছায়া যখন ঘনাইয়া আসে তখন আপনার জীবনই বহু-মূল্য মনে হয়। তখন অন্যের জীবনের সহিত নিজের জীবনের তুলনায় সমালোচনা করিয়া আত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়, কিম্বা অন্যের জীবনের সহিত নিজ জীবনের সমতা অনুভূত হয়—তখন মনে হয় আমার জীবন অন্যের জীবনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইতে পারে কিন্তু সমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সে বাঁচিয়া থাকিলেও ভগবানের রাজ্যে যতটুকু লাভ—আমি বাঁচিয়া থাকিলেও ঠিক ততটুকুই লাভ—সুতরাং আমিই বাঁচি না কেন! এই সকল প্রশ্নের উদয় এবং মীমাংসা কাপুরুষের মনেই হইয়া থাকে। যদি সত্য সত্য মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয় মধ্যে লুকায়ীত থাকে, যদি প্রকৃত পক্ষে দেবত্ব মানুষেও সম্ভবপর হয় তবে সে কখনও মনোমধ্যে কূটতর্কের মীমাংসায় যত্নবান হইবে না। যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাহার মধ্যে গুপ্ত মন্ত্রের মত কাজ করিবে, সেই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই তাহাকে মহাশক্তি

দান করিয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। সে মানুষ কি পশু, দানব কি দেবতা, সেই মোহন মুহূর্ত্তে সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আকস্মিক বিপদপাতে অবিচলিত চিত্তে অনেকেই কর্ত্তব্য বুদ্ধি স্থির করিতে পারেন না। স্থির ধীর ভাবে বীরের মতন অকুতোভয়ে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু দেবতার কোমল প্রাণ, পরদুঃখকাতরতার উষ্ণ প্রস্রবণ যখন তাহার অন্তরনির্ঝর হইতে শতধারায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তখন সে আত্মপর ভুলিয়া, আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া একটি প্রাণীর উপকার করিতে পারিলে মনে মনে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, সমগ্র পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য, মান সম্মান, যশ গৌরব তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়।

সংবাদপত্রগুলি টাইটানিকের ধ্বংস বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে যে বীরত্ব মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের বিজয় বার্ত্তা চারিদিকে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা দুর্ল্লভ। ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ, নারী নর, বালক যুবক সকলেই যে মহাপ্রাণতার, যে অমানুষিক বীরত্বের, অলৌকিক আত্মত্যাগের পরিচয় দান করিয়াছে, সভ্য জগতে এ কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এমন ভাবে হাসিতে হাসিতে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে পূর্ব্বে কখনো বিশ্বাস হয় নাই।

মানুষের বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভবপর টাইটানিকের নির্ম্মাণে তাহার সমস্তই করা হইয়াছিল। এত বড় বিশালকায় জাহাজ, তাহাতে খেলার ঘর, নাচ ঘর, সরোবর, প্রস্রবণ—সবই ছিল। জাহাজের চারিদিক ঘেরিয়া যে রাস্তা ছিল তাহা দুই মাইল লম্বা! জাহাজের মধ্যে ছাপাখানা ছিল—তারহীন টেলিগ্রাফে দেশ দেশান্তরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাহাজ মধ্যে সংবাদপত্র প্রচারিত হইত। এই মহাকায় টাইটানিকের নির্ম্মাণ কর্ত্তা ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ, এম,

জাহাজকে যথাসম্ভব হাল্‌কা এবং মজবুত করা হইয়াছিল। সকলের মনে বিশ্বাস ছিল যে টাইটানিক ডুবিতে পারে না। কিন্তু ভগবান দেখাইয়াছেন যে মানুষের ক্ষমতা গর্ব্ব তাঁহার সামান্য অঙ্গুলি নিষ্পেষণে চুর্ণিকৃত হইতে পারে। তাঁহার অসীম ক্ষমতার নিকট মানুষের ক্ষমতা কত তুচ্ছ।

টাইটানিকধ্বংসের পরবর্ত্তি শুক্রবার ইংলণ্ডের সেণ্টপল্‌স্ কেথিড্রেলে জলমগ্ন ব্যক্তিদের কল্যাণকল্পে প্রার্থনা হইয়াছিল। কার্লাইল সে উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা তখন এত দূর অধীর এবং ব্যাকুল হইয়াছিল যে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

টাইটানিকের দানবদেহ যখন তুষারস্তূপের সংঘর্ষে বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখনও কাহারও মনে বিশ্বাস হয় নাই যে সত্য সত্যই তাহারা মৃত্যুর মুখে নিপতিত হইয়াছেন। সমুদ্র তখন নীরব, নিস্পন্দ, স্থির— অগণিত তারকারাজি গগনমণ্ডল অম্লোজ্জ্বল কিরণালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। চারিদিকে বিপদের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছিল না। কিন্তু কাপ্তেনের বিপদ-ঘণ্টা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন আরোহীবর্গের বক্ষের উপর বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু কেহই বিচলিত হইল না। আপন আপন কর্ত্তব্য মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে লাগিল। জীবনতরীতে যতগুলি লোক সম্ভব উঠাইয়া আটলান্টিকের সীমাহীন জলরাশির উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইল। ২২০৬ জন আরোহী এবং নাবিকের মধ্যে ৭০৩ জনের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই ৭০৩ জন প্রাণী যে রক্ষা পাইয়াছে তাহার মূলে একটি দেবতার আত্ম বিসর্জ্জন।

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর কেহই নহে—টাইটানিকের তারবিহীন টেলিগ্রাফের যুবক সিগনেলার জ্যাক ফিলিপ্‌স্। বাল্যে কাসাবিয়েঙ্কার অপূর্ব্ব কাহিনী পড়িয়াছিলাম—আর আজ এই যুবকের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী পাঠ করিয়া, তাহার এই অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অশ্রু আপনা হইতেই ঐ

দেবতার চরণ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মানুষে এ প্রকার আত্মবিসর্জ্জন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না!

এই বিপদ সময়ে যুবক যদি বিচলিত হইয়া পড়িত, তবে হয়ত একটী প্রাণীও বাঁচিত না—টাইটানিকের ধ্বংস সংবাদ আটলাণ্টিকের অতল গহ্বরেই লুকায়ীত থাকিত। আমরা ঘুণাক্ষরেও তাহার কোনও সংবাদই পাইতাম না—এই অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী সকল কাহারো কর্ণগোচর হইত কি না সন্দেহ।

সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর রাত্রি ১০টার পর যখন ফিলিপস্ আপন শয়ন কক্ষে যাইতেছিল তখন জাহাজখানা একটু নড়িয়া উঠিল—কাপ্তেন স্মিথ আসিয়া খবর দিলেন—"বরফস্তূপের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগিয়াছে। হয়ত আমাদের বিপদ উপস্থিত হইতে পারে তুমি প্রস্তুত থাক—আমি বলিলেই চারিদিকে আমাদের বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিও," পরক্ষণেই আসিয়া বলিলেন—"বিপদের সংবাদ জানাও—আমরা সাহায্য চাই।" ফিলিপস্ ধীর ভাবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিল।

ওদিকে বৃদ্ধ কাপ্তেন স্মিথ—স্থির করিলেন "আমরা মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু জাহাজের সমস্ত শিশু ও রমণীগণকে রক্ষা করিতেই হইবে।" নিজের মৃত্যুকে যে গ্রাহ্য করে না তাহার পক্ষে অসাধ্য সাধন মোটেই অসম্ভব নহে। তাঁহার আদেশে সকলে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

ফিলিপসের প্রেরিত সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—৭০ মাইল দূরে কার্পেথিয়া জাহাজ অভয় দিয়া জানাইল—"আমি আসিতেছি ভয় নাই!" ফিলিপস্ যখন সেই মৃত্যুমুখনিপতিত নরনারীর নিকট কার্পেথিয়ার ঐ অভয় বাণী প্রচার করিয়া দিল, তখন শত শত কণ্ঠ হইতে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলী তাহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছিল।

এদিকে জাহাজের লোকেরা আপনাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত। ফিলিপ্সের চারিদিকে যে যেভাবে পারে আপনাপন প্রাণরক্ষার চেষ্টা

সংঘর্ষের সময় ঘুমাইতেছিল—গোলমালে সে জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের উপস্থিত বিপদের কথা শুনিতে পাইল। তারঘরে যাইয়া দেখিল ফিলিপস্ আপনার কথা ভুলিয়া কার্পেথিয়াকে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইতেছে। তখন সেই সহকারী ফিলিপস্‌কে লাইফ বেল্ট পরাইয়া দিয়া গেল।

জাহাজ ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছিল, কাপ্তেন বলিয়া গেলেন, "তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা করিয়াছ—এখন নিজে বাঁচিবার চেষ্টা দেখ।" কিন্তু ফিলিপসের কাণে সে কথা প্রবেশই করিল না। দেখিতে দেখিতে তারঘরে হু হু করিয়া জল প্রবেশ করিতে লাগিল—তবু ফিলিপসের জ্ঞান নাই—জলের মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে কার্পেথিয়াকে টাইটানিকের অবস্থিতিস্থান প্রভৃতি জানাইতেলাগিল। সহকারী বলিয়া গেল—"শেষ জীবনতরী চলিয়া যাইতেছে—এইবার আইস," ফিলিপস আসিল না। তাহার সহকারী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—জীবনতরী তাহাকে উঠাইয়া লইল। কিন্তু ফিলিপস বাঁচিল না। নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ৭০৩ জন নরনারীকে বাঁচাইয়া গেল।

ওদিকে জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারী নাবিক কাপ্তেন সকলে মিলিয়া ডেকের উপর প্রার্থনা নিরত হইলেন। অসীম পারাবার কাঁপাইয়া গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া করিয়া ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল

Nearer to Thee O God !

হে ভগবান্ তোমার কোলের কাছে আমাদিগকে লইয়া যাও।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য—(জ্যৈষ্ঠ)—'সাগরিকা' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য তথ্যানুসন্ধানমূলক-প্রবন্ধ। ভারত দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ যে বাঙালীরই উপনিবেশ ছিল লেখক তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন। এই জাতীয় আলোচনা যত হয় ততই দেশের মঙ্গল। দীনেন্দ্রকুমারের 'উপেক্ষিতা' একটী করুণরসাত্মক পল্লী-কাহিনী।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেদমার্গে'—ধর্ম্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের "'সহজিয়া' ধর্ম্ম ও সাহিত্য" সুলিখিত প্রবন্ধ। 'অমা-নিশীথিনী' বড়াল কবির একটী কবিতা। যাদব-চন্দ্রের আত্মকাহিনী—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেবলিখিত সুখপাঠ্য আত্ম-কাহিনী গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে 'কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।' 'বংশানুক্রম' শ্রীশশধর রায় লিখিত ২য় প্রবন্ধ। 'ভারতের অর্ণবযান' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—পাঁচকড়ি বাবু এ প্রবন্ধে শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Indian Shipping এর সমালোচনা করিয়াছেন। শচীশবাবুর 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' বেশ লাগিল। সরোজনাথ ঘোষের চিরপুরাতন (বিদেশী গল্প) নেহাৎই অনুবাদ—মোটেই সরস হয় নাই—সরোজবাবুর পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। 'ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ' শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধের প্রতিবাদ। শশিবাবু যে ভাষায় প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়াছেন বোধ হয় কোন সাহিত্য সেবকই তাহার সমর্থন করিবেন না। তিনি রবীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে যাইয়া নানা অবান্তর বকিয়া ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে কবির পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্য লেখা সম্ভবপরও নহে, যুক্তিযুক্তও নহে। আশ্চর্য্য কথা বটে! এইটুকু বলিয়া চুপ করিলে মন্দ হইত না কিন্তু তাঁহার রবীন্দ্র-বিদ্বেষ হাড়ে হাড়ে বিজড়িত হইয়া আছে কাজেই প্রলাপ বকিতে বকিতে গরল উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যে অশ্লীল অভদ্রজনোচিত ভাষায় গোড়া পত্তন করিয়াছেন তাহাতে তিনি আর কখনো সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। লেখক বাজে বকিতে যাইয়া নিজ বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহার একটু পরিচয় দেই। "যে কবি পসারিণীকে নির্জ্জন বৃক্ষচ্ছায়ায় আঁচল পাতিয়া শোয়াইয়া তাহারই নগ্ন সৌন্দর্য্যে যুবক যুবতীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবের প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ছুটাইয়া দিয়া আপনার কবিত্ব

অপচার মাত্র, নিরপেক্ষ বিচারে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" আহা! কি নিরপেক্ষ বিচারক! A Daniel is come to judgment! পাঠক একবার রবীন্দ্রনাথের পসারিণী পড়িয়া দেখিবেন আমাদের নিরপেক্ষ বিচারক মহাশয় ঐ কবিতার কয় ছত্রের অর্থ কিরূপ ভাবে বুঝিয়াছেন! লেখক মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন তিনি কি করিতে বসিয়াছেন কিংবা তাঁর অন্তর্নিহিত ঈর্ষানল ভিতরে ভিতরে বোধ হয় তাঁহাকে এত দিন দগ্ধ করিতেছিল আজ হঠাৎ পথ পাইয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। যাহা যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে তাহা সকলকে মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। শশিবাবুর নিকট যাহা ভাল লাগে নাই তাহার প্রতিবাদ তিনি ভদ্র ভাষায় বেশ করিতে পারেন। কিন্তু এত বাজে বকা কেন? তিনি বারান্তরে আরো আলোচনা করিবেন ভরসা দিয়াছেন কিন্তু আমরা বলি কি ভাষা একটু সংযত হইলে বোধ হয় শশিবাবুর প্রবন্ধটি সকলের নিকট উপভোগ্য হইত। "সহযোগী সাহিত্যে" পাঁচকড়ি বাবু সাময়িক বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' সম্পাদকের তীব্র কষাঘাত তেমনি ভাবে চলিতেছে।

প্রবাসী—(জ্যৈষ্ঠ) 'জীবনস্মৃতি'—ধীরে ধীরে আপনার সরল সুন্দর ভাব বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। 'ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মগণও হিন্দু। তিনি উপসংহারে লিখিয়াছেন—'এক্ষণে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এইযে, তাঁহারা মিছামিছি বাতাসের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া সকল দেশের সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা যাহা করিয়া থাকেন তাহাই করুন—অন্তরের রিপুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন্ এবং ঈশ্বর প্রসাদে জয়যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মনামের সার্থক্য সম্পাদন করুন্।' মণিলাল এবার কবির আসরে নামিয়াছেন। জলধর দেব 'পরভৃতে' আমাদের

কোকিল যে বিলাতী কুক্কুর স্বকাশি তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 'সাপুড়িয়া' রবীন্দ্র নাথের আধ্যাত্মিক কবিতা। চারুবাবু ফরাসী দেশ হইতে যে সব গল্পের আমদানী করিতেছেন তাহা না করিলেই ভাল হয়। 'গোঁপ-খেজুরে'—দেখিয়া প্রথমে ত অর্থই বোধগম্য হইল না—তারপর পড়িয়াও তেমন সুখ পাইলাম না। যতীন্দ্র মোহন সিংহের 'যাত্রাগান' সুখপাঠ্য। রবীন্দ্র নাথের 'বিদায়' ছোট্ট সুন্দর কবিতা।

মুকুল—(জ্যৈষ্ঠ)—সর্ব্বপ্রথমেই উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের বৃহৎ হাফটোন ছবি—সুন্দর হইয়াছে। 'ইপিকটেটাস —রোমীয় সাধুর জীবন কাহিনী। অনাথ ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প। 'সাধুজীবন' ৺গৌরগোবিন্দরায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সাধুজীবনের আদর্শ বালকবালিকাদিগের সম্মুখে যতই ধারণ করা যায় ততই ভাল। 'বীরবালক'—নৃসিংহচন্দ্র দেবশর্ম্মা লিখিত সুন্দর ছোটগল্প। 'মৃত্যুর সম্মুখে—টাইটনিকের সিগনেলার জ্যাক ফিলিপসের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী। 'সমুদ্র' একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার রচনা বিশ্বের আভাস বেশ পাওয়া যায়। "ভাই বোন" কবিতা এবং ছবি ২টী খুব সুন্দর হইয়াছে। ছোট ছেলে মেয়েদের কবিতা যেরূপ সরল এবং সহজ হওয়া উচিৎ এ কবিতাটি ঠিক তেমনি হইয়াছে। আমরা মুকুলের উন্নতি কামনা করি।

কাপ্তেন স্মিথ।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩১৯ [৪র্থ সংখ্যা।

সাধনা।

বিরাট বিপুল সংসার ফেলি'
ছেদি' বন্ধন আজি,
গভীর গুহায় বসিল যুবক
কঠোর সাধক সাজি।
ফেলি দিয়া দূরে ধনীর বসন,
টানিয়া আনিল শুচির আসন,
নাহি জানি কেন ত্যাগের শঙ্খ
উঠিল হৃদয়ে বাজি'।
"দৃষ্টির মাঝে রয়েছে দীপ্তি
দৃশ্যের ছোট বেড়া—
তাই ত আমরা আলোকে নিত্য
তুচ্ছে পড়েছি ধরা",—
এই ভাবি যুবা মুদি' দুই আঁখি,
গুহাতলে নিতি আরাধনে থাকি

কঠিন কঠোর মুক্তির লাগি'
তেয়াগি' এমন ধরা !
তরলকণ্ঠে ক্ষুদ্র তটিনী
গেয়ে যায় পাশে তারি,
দীর্ঘ সরল তাল-পল্লব
যেন সে বীজনকারী।
নিতি সাঁজে আর নিত্য প্রভাতে,
বন্য মরাল কলগানে মাতে,
জোনাকী-প্রদীপ বনের মাথায়
জ্বলে সে আঁধার-হারী !
সাধক আপন ক্ষুদ্র গুহায়,
না হেরি' বাহিরে আর
ধ্যানের মাঝারে মগ্ন গভীরে
জানিয়া আঁধারে সার !
মন্ত্র পড়িয়া যায় জোর করি'
বাহিরে আলোকে সকলেরে ডরি
ভাবিল, কবে যে ভবনদী-তরী
করিবে তাহারে পার !
মহান্ বিশ্ব শত্রু তাহার
ভাবিয়া রাত্রিদিন,
সুতনু তাহার আহার লাগিয়া
শুষ্ক কঠিন ক্ষীণ !
আলোক তাহারে বন্ধুর বেশে
আহ্বান্ আর করে না'ক এসে,
জাগায়ে দেয়না তা'রে ভালবেসে
সে যে ধ্যানে সমাসীন্ !
সে দিন প্রভাতে নবীন আলোকে
রজনী আঁধার টুটে

বিগত কৃষ্ণ-কুহেলিকা-মোহ
হিরণ-কিরণ ফুটে !
একটি যুবতী গাগরি লইয়া,
তটিনী-সোপানে নীরবে নাহিয়া
চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
ধীরে ধীরে আসে উঠে !
তখন ভোরের বাতাস জেগেছে
তটিনী-দেহটি পরশি'
কুমুদ আবার নয়ন মেলেছে
বরণে ভরিয়া সরসী !
ছলক শব্দে সিক্ত বসনে
যুবতী চলিলা চকিত-চরণে
সিক্তভৃণের শিশির হরণে
প্রভাত-গাহনে হরষি' !
সহসা নিরখি' দাঁড়াল রমণী
সন্ন্যাসী-গুহা-সমুখে.
মানিল পরাণে কৌতুক নব,
হেরিয়া দৃশ্য অতি অভিনব,—
'সকল তেয়াগি' কেন এ মানব
গুহায় নিবসে কি দুখে ?
চাহিয়া করুণ নয়নে রমণী
ভুলাল সাধুরে নিমেষে,
কাঁপিয়া উঠিল ধ্যানের আসন,
হরষে পূর্ণ সন্ন্যাসী-মন,
"এত দিনে তুমি এলে ভগবন্ !
মূরতি ধরিয়া এ বেশে ?"
এতেক ভাবিয়া যুবক উঠিল
লভিয়া মুকতি জগতে ;

মানবের মাঝে মুকতির স্বাদ
বিধাতা দিলেন ভকতে !
কটি-তটে লয়ে পূর্ণ গাগরি,
নিমেষ বিহীনা সুন্দরী নারী
কি সরসী হতে কি মানস-বারি
রমণী ছিটাল মরতে !
মরত মানবী সাধুরে আজিকে
বাহিরে করিল বার,
নিমেষে যেন সে ফেলি দিল ঠেলি
শতেক যুগের ভার !
সেদিন প্রভাতে একটী যুবতী
দিল তারে দিল অসীম মুকতি,
না মানি' সে আর কঠোর যুকতি,
গলে দিল ফুল-হার !

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

"ভারতে ইংরেজাগমন"

বিশ্ববিজয়ী ইংরেজের নিকট একদিন ভারতবর্ষের কথা অজ্ঞাত ছিল। ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংলণ্ডের কানে ভারতবর্ষের কথা স্বপ্নশ্রুত সঙ্গীতধ্বনির মত বাজিয়া উঠিল তখনই তাহার আগ্রহ-ব্যাকুল চিত্ত সর্ব্বপ্রসূভারতেরবাণিজ্যসম্ভারের জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল।

উদ্যোগীপুরুষ তখনি বাণিজ্যপোতসকল সজ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমেই এক অন্তরায় দাঁড়াইল। তাঁহারা শুধু ভারতবর্ষের নামই শুনিয়াছেন মাত্র, কোথায় সে দেশ, কোন দিকে তার পথ কিছুই তাঁহাদের জানা নাই। তবু তাহাদের অদম্য উৎসাহ তাহাদিগের মহান উদ্দেশ্যের অভিমুখে লইয়া চলিল।

চীনদেশ সেসময়ে বাণিজ্যপ্রধান দেশ বলিয়া জগতে খ্যাত। রবার্ট থোর্ণ নামক জনৈক ইংরেজ বণিক ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর নিকট চীন দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপনের উপকারীতা দেখাইয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র কথা উল্লেখিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত সুতরাং সেইদিকে যাত্রা করিলে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যাইবে এ বিশ্বাস তখনকার লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল।

এই আবেদন পত্রের বিশেষ কিছু মূল্য না থাকিলেও ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্ত্তি কালে পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

১৫৫৩ খৃঃঅব্দের ১০ই মে তারিখ গ্রীনউইচ হইতে সার হিউ উইলোবির (Sir Hugh Willoughby) নেতৃত্বে এবং সেবাস্টিয়েন ক্যাবটের (Sebastian Cabot) পরামর্শানুসারে তিন খানা অর্ণবপোত সমুদ্রে ভাসমান হইল। ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্ঠ এডোয়ার্ড এই অভিযানের সাহায্যকল্পে পৃথিবীর সমগ্র রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া এক খানা চিঠি কাপ্তেনের সঙ্গে দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ অভিযান বিফল হইল - উত্তর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া শ্বেত সমুদ্রের (White Sea) বরফস্তুপের মধ্যে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। উইলোবির দুই খানা জাহাজ বরফস্তুপের মধ্যে বসিয়া গেল, আর বাহির হইতে পারিল না—সেই বরফরাশীর প্রবল শৈত্যে উভয় জাহাজের নাবিকগণ প্রাণ হারাইল। তৃতীয় জাহাজ তাহাদের এই বিফল যাত্রার কাহিণী লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল।

ইহার পর আরও অনেক চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নাই। অবশেষে ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে হেন্‌রী হাড্‌সন্ (Henry Hudson) সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন যে উত্তর পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে আগমন অসম্ভব।

উত্তর পথে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা দক্ষিণ পথে অগ্রসর হইতে

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ম্যাগিলান (Magellan) ১৫১৯-২২ খৃঃ অব্দে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করেন। সার ফ্রান্সিস্ ড্রেক (Sir Francis Drake) ১৫৭৭খৃঃ অব্দে ৫ খানা স্বল্পায়তন জাহাজ লইয়া প্লিমাউথ বন্দর হইতে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে যাত্রা করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) প্রদক্ষিণ করিয়া, ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপ পুঞ্জ ভেদ করিয়া, অতলান্ত এবং প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ১৫৮০খৃঃ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় প্লিমাউথ বন্দরে ফিরিয়া যান। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই কারণ তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ পথে চলিয়া গিয়াছিলেন; তবে পথে একটী পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিয়া জানিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য করিয়া থাকেন। ড্রেকের পর ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish) নামক জনৈক নাবিক ১৫৮৬-৮৮খৃঃ অব্দে আবার জল যাত্রা করেন এবং পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য রত্ন সম্ভার লুণ্ঠন করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। তিনি বলেন যে মলাকার (!) (Malucoes; হিন্দু অধিবাসীরা তাঁহার সহিত খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তিনি ইহাও বলেন যে পর্ত্তুগীজদের মতন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ স্বচ্ছন্দে তথায় বাণিজ্য করিতে পারেন।

সে সময়ে পূর্ব্বদেশীয় পণ্যসমূহ ভূমধ্যসাগরপথে ভেনিস এবং জেনোয়ার নাবিকগণ দ্বারা ইংলণ্ড এবং ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে সরবরাহ হইত।

লেভাণ্ট এবং তুর্কীর সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য রাণী এলিজাবেথ ১৫৮১খৃঃ অব্দে "লেভাণ্ট কোম্পানী" নামক একটী ইংরাজ কোম্পানীকে এক সনন্দপত্র দান করেন। কিন্তু পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্য পর্ত্তুগীজদের এক চেটিয়া সুতরাং লেভাণ্ট কোম্পানী বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। অপরদিকে ড্রেকের ভারত দ্বীপ পুঞ্জে গমন সম্বন্ধে স্পেনরাজ প্রশ্ন করিয়া পাঠান,—রাণী এলিজাবেথ তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠান যে বাতাস যেমন পৃথিবীর যাবতীয় জীব সমূহের সাধারণ সম্পত্তি সমুদ্রও তাই। স্পেনীয়গণের সমুদ্র পথে

গমনাগমনের যতটুকু অধিকার তাঁহার প্রজাবর্গেরও ততটুকু অধিকার। সুতরাং ড্রেক এমন কোনও গর্হিত কাজ করে নাই যে জন্য সে দণ্ডনীয় হইতে পারে।

এই ঘটনার পর হইতেই ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপণের চেষ্টা হয়। ১৫৮২খৃঃ অব্দের ১লা মে মিঃ এডোয়ার্ড ফেণ্টন চারিখানি জাহাজ লইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু ব্রেজিল হইতে মাত্র ১খানি জাহাজ লইয়া ফিরিয়া আসেন। ইহার পর কয়েক বৎসর এদিকে কোনও চেষ্টাই হয় নাই।

"স্পেনিস আর্মাডা" ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের একদল বণিক রাণীর নিকট ৩টী জাহাজ পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৫৯১খৃঃ অব্দের ১০ই এপ্রিল তাঁহারা যাত্রা করিলেন। ২৮শে জুলাই উত্তমাশা অন্তরীপ নাবিকদের নয়ন গোচর হইল। কিন্তু পথিমধ্যে নাবিকেরা অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে সেস্থান হইতেই Royal Edward নামক জাহাজে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট (Penelope এবং Edward) জাহাজ দুইটী লইয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। তন্মধ্যে Penelope কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব উহা সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষ (Edward) জাহাজ নিকোবার দ্বীপ হইতে পূর্ব্বদ্বীপ পুঞ্জাভীমুখে অগ্রসর হইল—পথে মলাক্কা দ্বীপের উপকূলে দুইটী পর্ত্তুগীজ জাহাজ আক্রমন করিয়া। সেখান হইতে লঙ্কায় ফিরিয়া আসে। এখানে আসিয়া জাহাজের লস্করেরা ক্ষেপিয়া উঠে, কাজে কাজেই কাপ্তেনের বাধ্য হইয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিতে হইল। কিন্তু এ যাত্রার পরিণাম আরও দুঃখময়। জাহাজ তখন ব্রেজিলের উপকূলে নঙর করিয়াছিল প্রায় সকল লস্করই তখন তীরে। হটাৎ মিস্ত্রি জাহাজের দড়ি কাটিয়া দিল—জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার এবং অন্য ছয়জন সেই জাহাজে ছিল। ঘটনা ক্রমে একটী ফরাসী জাহাজের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়—সেই জাহাজের সাহায্যে তাহারা St. Domingoতে নীত হয় এবং তথা হইতে ১৫৯৬, খৃঃ অব্দের ২৪শে

যে ল্যাঙ্কাষ্টার একাকী ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয় অভিযানও এইরূপে নষ্ট হইলে ইংরেজগণ একটু ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়েন।

এদিকে ওলন্দাজেরা এ সকল সংবাদ পাইল এবং তখনই কর্ণেলিয়স হুট্‌ম্যানের অধিনায়কত্বে ১৫৯৫খৃঃ অব্দে ২রা এপ্রিল চারিটী দৃঢ়দেহ এবং শক্তিশালী জাহাজ ভারতদ্বীপপুঞ্জাভীমুখে যাত্রা করিল। সুমাত্রা এবং যবদ্বীপে বাণিজ্যসম্বন্ধসংস্থাপনই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পর্ত্তুগীজদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠিল না। ১৫৯৮খৃঃ অব্দে যখন হুটম্যান দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখনঁ হলান্দবাসী সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিরাট অভিনন্দন দান করিল। আবার আট খানি জাহাজ প্রেরিত হইল তন্মধ্যে ৪খানি মহার্ঘ পণ্য সম্ভার লইয়া ১৫ মাস মধ্যে দেশে আসিল। এইরূপে হলান্দের সহিত পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। ১৬০২খৃঃ অব্দে হলান্দের ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী গুলি মিশিয়া এক কোম্পানীতে পরিণত হইল।

হলান্দের এই উদাহরণ ইংলণ্ডের চোখে বাজিল। আবার আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ হইল। ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড অর্থ তখনি সংগৃহীত হইল। রাণী এলিজাবেথের নিকট ওলন্দাজ এবং পর্ত্তুগীজদের কৃতকার্য্যতার উল্লেখ করিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। রাণী তাহা গ্রহণ করিলেন। ১৬০০ খৃঃ অব্দে এই কোম্পানীকে সনন্দপত্র দান করিলেন—ইহার নাম ছিল—The Governor and Company of the Merchants of London, trading to the East Indies.

১৬০১ খৃঃ অব্দের ২২শে এপ্রিল পাঁচ খানা জাহাজ যাত্রা করিল। কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার বান্তামে (Bantam) পৌঁছিয়া সেখানে একটী কারখানা খুলিলেন, এখান হইতে ভারতীয় সকল প্রকার পণ্য সরবরাহ হইতে লাগিল। এখানকার ব্যবসা বেশ লাভজনক হইয়া উঠিল।

কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই রাণী এলিজাবেথ পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীকে আরও জাহাজ পাঠাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। ল্যাঙ্কাষ্টার ফিরিয়া

গেলে তাঁহার জাহাজগুলিই আবার নূতন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কাপ্তেন মিড্লূটন্ ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে ২৫শে মার্চ্চ বান্তামাভিমুখে রওনা হইয়া ২০শে ডিসেম্বর তথায় পৌঁছিলেন। ওলন্দাজেরা তাঁহাকে প্রথমে বেশ আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল কিন্তু যখনই তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিল তখনই এভাব আর বেশী দিন টিঁকিল না। বহু রত্নসম্ভার লইয়া ৪ খানি জাহাজ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল কিন্তু একখানা খুবসম্ভব জলমগ্ন হইয়া থাকিবে।

এ পর্য্যন্ত কোনও জাহাজই ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করে নাই, সকলেই ভারত দ্বীপপুঞ্জাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে তৃতীয় অভিযান প্রেরিত হইল। তিনখানা জাহাজ প্রস্তুত ছিল, তন্মধ্যে ১খানা লইয়া ড্যাভিড মিড্লূটন ১২ই মার্চ্চ তারিখে রওনা হইয়া বান্তাম হইতে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া যান। অপর জাহাজ ২টী ১লা এপ্রিল যাত্রা করিয়া আফ্রিকার উপকূলে সোকোত্রা পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই আসিয়াছিল কিন্তু এখানে উভয়ে ভিন্ন দিকে গমন করিল। কাপ্তেন হাকিন্সের জাহাজ 'হেক্টর' সুরাটাভিমুখে এবং অন্যখানা বান্তাম অভিমুখে যাত্রা করিল।

এই "হেক্টর"ই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম জাহাজ যাহা ভারতবর্ষের উপকূলে নঙর করিয়াছিল এবং কাপ্তেন হাকিন্সই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ যিনি ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পন করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত।

Music
The Softest grave of thousand fearSs helly.

মুগ্ধ সঙ্গীতের সুধাস্নিগ্ধ মন্ত্রে
আবেশে ঘুমায় যতেক যাতনা ;
কুসুম শয়নে ভাবনা লুটায়
স্বপনে জাগয়ে স্বরগ সাধনা !

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত।

প্রজাপতির পরিহাস ।

(গল্প)

মাসিক পত্রিকায় কবিতা পাঠাইয়া পাঠাইয়া হয়রান হইয়া যখন এক নূতন রকমের কাব্য রচনা করিতে সুরু করিয়া দিলাম তখন কলেজের পড়া শেষ হইয়া গেছে। বি, এ, ডিগ্রি লইয়া সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেনেট হলের" মোটা মোটা থামগুলো অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সেই থামের নিষ্পেষণে আমাকে কএকটা জিনিষ স্বল্পাধিক পরিমাণে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—তন্মধ্যে "আইসাইট্" একটি।

আমার কবিতার উৎসাহদাতা কেবলমাত্র একজন; কাজেই আমি 'কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিদ্যালয়ের পাঠ্যের অসদ্ভাব বশতঃ' কবিতা লিখিতে যাইতেছিলাম না—শুধু নামের জন্য—কেবল কবি হইবার আশায়। আমার বন্ধুও উৎসাহদাতা সুধী এবং আমি এক মেসেই থাকিতাম। একদিন সে আমাকে বলিল "ভাই অমল, তোর জ্বালাময়ী কাব্যের কতদূর?" আমি বলিলাম "ভাই, যে গরম পড়েছে—বর্ষা না এলে কি আর কাব্য লেখা হয়!"

বর্ষা আসিল। আমি তখন পুরীতে সুধীদেরবাসায়—ইচ্ছা দুই-জনে consult করিয়া বড় বড় আইনের বই গুলো পড়ি আর অবসর সময়ে কাব্য লিখি। রোজই মনে করি আজ অন্ততঃ কাব্যের দুই তিন সর্গ লিখিয়া ফেলিব কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। জ্বালা-ময়ী কাব্য কেবল আমাকেই জ্বালাতন করিতে লাগিল।

সে দিন বৃষ্টি হইয়া থামিয়া গেছে। আকাশের ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলোর ভিতর দিয়া শেষরৌদ্রটুকু অতি সঙ্গোপনে গাছের পাতা গুলোকে রূপার পাতে মোড়াইতেছিল। ঘরে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম—গ্রাপু, টুয়ান্‌টি নাইনে বীতশ্রদ্ধ—কাজেই বাহির হইয়া পড়িলাম—ইচ্ছা সুধীর সঙ্গে গল্প করিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াই।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাই চলিতে আরম্ভ করিব অমনি দেখি পাশের বাড়ীর জানালা হইতে দুইটি 'পটলচেরা' চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—আহা! সেই চোখ দুটি কি সুন্দর! কি সুন্দর তার তারা দুটি! কি সুন্দর তার পলক!

সেদিন মনটা জানি কেমন করিতে লাগিল। পথে সুধীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহার চোখ দু'টি? কে সে? যাঁহাকে আমার কাব্যের নায়িকা কল্পনা করিয়াছি এ যে তাঁরই মতো দেখিতে।

সুধী বলিল "নবীন ডাক্তারের কন্যা বীণার। সে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে।"

(২)

তখন ছিল সকাল বেলা। সুধীদের বাহিরের ঘরে একখানি আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটা সিগার মুখে 'Statesman' এর পৃষ্ঠাগুলো নিতান্ত অলসভাবে উল্টাইয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় বাড়ী হইতে তার পাইলাম "শীঘ্র এস।" তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে কাপড় চোপড় গুছাইয়া ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনে চাপিলাম। ট্রেন ছাড়িয়া দিল—রেলের রাস্তার দুইধারে কেবল জল—মাঠ, নালা, ডোবা, জলে ডুবিয়া গেছে। চাষীদের বাড়ীগুলো সেই জলরাশীর উপর দ্বীপের মতো দেখাইতে লাগিল। প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলাম না। নানারূপ দুশ্চিন্তা বুকে বাঁধিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম—দেখিলাম সকলে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, ছেলে মেয়েরা কানাকানি করিতেছে। আমার ছোট বোন নিরু একগাল হাসিয়া আমাকে বলিল "দাদা তোমার বিয়ে।" আমি ত এর রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এমন সময় মাতাঠাকুরাণী ও হাসিয়া আমায় বলিলেন "অমল, তোর বিয়ে ঠিক্ করেছি, আর আমার মনে কষ্ট দিস্ নি, এবার তুই বিয়ে কর, ওপাড়ার শ্যামাচরণ বাবুর মেয়ে হেমের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক্ করেছি এই ৭ই বিয়ে।"

করিয়া কি শেষে এক নোলক পরা, গ্রাম্য unaccomplished girlকে আমার প্রেম রাজ্যের রাণী করিতে হইবে! হায়! ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন! আমার এই বিদ্যা, এই শিক্ষা শেষে কি 'উলুবনে ছড়াইব?' কখনই হইবে না। মনের রাগ তখন মনেই চাপিয়া গেলাম।

খাওয়া দাওয়া করিয়া মাকে বলিলাম "মা! আমার সারাজীবন কষ্ট দেওয়াই কি তোমার উদ্দেশ্য? আমি হেমকে কখনো বিয়ে কর্‌বো না। প্রাণ থাক্‌তে না।" মা চমকিয়া বলিলেন "সে কি কথা রে! আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি!"

"আমার মত ছাড়া তুমি কেন কথা দিলে?"

পরে অনেক কথা হইল। মায়ের অশ্রু, মায়ের ক্রন্দন আমাকে রাজী করাইতে পারিল না। রাত্রির ট্রেনে আবার পুরী চলিয়া গেলাম। সুধী জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ীর সব ভাল ত? আমি বলিলাম "হাঁ।"

(৩)

আমার সঙ্গে বীনার আলাপ হইয়া গেছে। নবীন বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে ও সুধীকে বড়ই স্নেহ করিতেন। হুবহু তাঁহাদের বাসা হইতে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিত। বীনার হাতের তৈয়ারী চায়ের পেয়ালা তখন আমার নিকট এক বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিত। বীণা যখন বীণাঝঙ্কারবৎ বলিত "কেমন আছ" তখন আমি তাহার উত্তর করিতে পারিতাম না। মনে ভাবিতাম কি করিলে ভাল হয়, কি করি ভাবিতে ভাবিতে আর উত্তর দেওয়া হইত না—পরে হুঁস হইলে বড়ই লজ্জিত হইতাম। আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া বীণা ঠোঁট চাপিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিত। আহা সে হাসি কি মধুর!

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। একদিন মায়ের চিঠি পাইলাম—মা লিখিয়াছেন তাঁহার অসুখ—বাঁচিবার আশা নাই—একবার দেখিয়া আসিতে। আমার তখনো মেজাজ ঠাণ্ডা হয়

বীণার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার অন্তরায় কেবল মা, তিনি সরিলেই বাঁচি!

এদিকে আমিও সুধী বীণাদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে লাগিলাম। বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম—মায়ের অবস্থা খারাপ। মনে ভাবিলাম আমাকে বাড়ী নেওয়াবার এই আবার এক নূতন ফন্দি। আমি বাড়ী গেলাম না।

পরে যখন আমার মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম তখন একবার বাড়ী যাইতে মনস্থ করিলাম। বাড়ী যাইয়া মায়ের শ্রাদ্ধাদি করিয়া আবার পুরীতে ফিরিলাম—ফিরিয়া দেখি সর্ব্বনাশ! বীণার বিয়ে! কিন্তু আমার সঙ্গে নয়—বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার বি, ঘোষের সঙ্গে!

পরদিন সকালে যখন জাগিলাম তখন নবীন ডাক্তারের বাড়ী হইতে সানাইএর সাহানা রাগিণী শোনা যাইতেছিল। ভোরের আলো তখনো সংসারটাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এমন সময়ে নবীন বাবু সুধীদের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। আমার আগমন সংবাদে তিনি যার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিতে ভুলিলেন না যে তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাকে ও সুধীকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে।

আমি নানারকম ছুঁতা ধরিয়া রাজী হইলাম না। মনে ভাবিলাম আমার জীবন কাব্যের নায়িকা—আমার মানসসুন্দরীকে অন্য একজন কাড়িয়া লইবে আর আমি তাহাতে সাহায্য করিব! হায় অদৃষ্ট! তখন নবীন বাবুর বাড়ীতে সানাইর বেহাগ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। আমার মনে মায়ের স্মৃতি, হেমাঙ্গিনীর স্মৃতির সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। বাড়ী ফিরিলাম—হেমাঙ্গিনীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে। কিন্তু কোথায় হেমাঙ্গিনী!

শ্রীরঙ্গিনচন্দ্র হালদার।

নিকটে ও দূরে।

নিকটে যবে রহগো দেবি—তখনো বহুদূর
হৃদয়ে তোমা পেয়েও নহে মানস পরিপূর।
দূরেতে যবে রহগো তুমি—তখনো রহ কাছে,
নয়ন দুটী শাসন করি সকল কাজে আছে।
নিকটে যবে রহগো দেবি—জীবন আঁখিময়,
লক্ষকোটী নয়ন ছাড়া কিছুনা মোর রয়।
দূরেতে যবে চ'লয়া যাও—নয়নমন হারা,
আমার আর কিছু না থাকে, তোমার স্মৃতি ছাড়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

কাব্য ও সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যগগনে মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় অন্যান্য সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছেন কোন্ ক্ষমতা প্রভাবে? সমগ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে,—কি গদ্যে, কি পদ্যে, তিনি সমভাবে বিচরণ করিয়াছেন; এবং যাহাই তাঁহার প্রতিভাংশুমালা স্পর্শ করিয়াছে, তাহা যে শুধু নয়নবিমোহন স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহা এক অভূতপূর্ব্ব নবীনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চিরস্থায়ীভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যসাহিত্যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করেন। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কর্ত্তৃক বাংলা পদ্যের পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিকে সুললিত কবিতায় বঙ্গবাসীর মন নানারসে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, অপরদিকে বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে শিখাইয়াছেন। এরূপ সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভা জগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কোন কোন লেখকের কিন্তু ইহা সহ্য হয় না। ঈর্ষা কখনও

এ ক্ষেত্রে যে সে লক্ষণের অত্যন্তাভাব তাহা বলাই বাহুল্য। সে যাহাই হউক, এরূপ ব্যাপার সাহিত্যজগতে এই নূতন নহে। কালিদাস, শেক্ষপীয়র, ওয়াডসওয়ার্থ, কীটস্‌ প্রভৃতি মহাকবিগণের প্রত্যেকেরই এই অবস্থা হইয়াছে। আমরাও এই উপসর্গকে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যযুগের একটা সাময়িকবিকার বলিয়া নির্ব্বিকার ভাবে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। কাজেই দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমে জনৈক সমালোক রবীন্দ্রনাথের কাব্য আক্রমণ করিলেন। দুর্গটী বোধ হয় অত্যন্ত দুর্ভেদ্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দুর্নীতি নামক এক কল্পিত ছিদ্র আবিষ্কার করিয়া মহা আড়ম্বরে এক প্রকাণ্ড সমালোচনারূপ গোলক সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শব্দ হইল; কিন্তু ব্যস্‌, ঐখানেই শেষ; ভিতরে প্রবেশ করিল না; ছিদ্র থাকিলে তবেত! সমালোচকবর তখন কি করেন? তখনই একেবারে রণেভঙ্গ দিতে পারেন না। এদিকে তাঁহার নিজের প্রতিপত্তির পুঁজিটুকু লইয়া মহা টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি অন্য পথ ধরিলেন। এবার কাব্য ছাড়িয়া একেবারে গদ্যে হাত দিলেন; এবং রবীন্দ্রবাবু গদ্যে যাহাকিছু লিখিয়াছেন তাহা নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চিৎকর তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তল্লিখিত 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে ত জানান প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি pet theories আছে তিনি সেইগুলি লইয়াই সময়ে অসময়ে নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন।

মেঘদূতের সৌন্দর্য্য কবিবর রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উন্মথিত করিয়াছিল। তাই শুধু আজ নয়, বহু পূর্ব্ব হইতে ঐ অদ্বিতীয় বিরহ কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বনিচয় একাধিকবার তাঁহার সমক্ষে নূতন নূতন ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি যেন কিছুতেই সম্যক্‌ পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন না। তাই তিনি এই মহা সঙ্গীতের সঙ্গে

নিজের স্বর মিশাইয়া প্রতিবারেই নানা সৌন্দর্য্যের গুপ্তদ্বার উদঘাটিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণের প্রকৃতিই ত এই। তাঁহারা সামান্য বস্তুতেই কত চিরন্তন তথ্যের, কত অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান; সরোবর-বক্ষে দোলায়মান পদ্মের মৃণাল কোন কবিকে মানবজাতির ভাগ্য বিপর্য্যয় স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার কোন কবি পর্ব্বতোপরি primrose পুষ্পে মানবের মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন (Resurrection) লাভের চিত্র দেখিয়া আনন্দবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। কোকিলের কুহুস্বর শুনিয়া একজন কবি স্বপ্নময় বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হন, আর একজন কবি পরাধীন বাঙ্গালীর বিষাদভারাক্রান্তহৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের অভাব দেখিয়া অবসন্ন হন। আলোকে পতনোন্মুখ কাচপ্রতিরুদ্ধগতি পতঙ্গ ত অনেকেই দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা দেখিয়া 'কমলাকান্তের' চিত্ত-বিকার হয় কেন? যদি তীক্ষ্ণঅনুভূতি, উদ্দামকল্পনা ও ভাবপরম্পরার শৃঙ্খল কবিগণকে দৃশ্যমান বস্তু অথবা বাহ্যতঃ উপলব্ধ অর্থ হইতে বহু দূরে এক নূতন চিন্তারাজ্যে লইয়া যায়, তাহা হইলে মেঘদূতের ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্য যে কবিহৃদয়ে নানা নবভাবের উদ্রেক করিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

স্বীয় প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মেঘদূতের মধ্যে এই যে একটী ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ইহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাম দিতে চাই না কারণ ইহার সত্যতা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে; অন্য কোন সত্যতা ইহার আছে কি না তাহা কাব্যের প্রতিপাদ্য নহে; সুতরাং সেখানে ইহা তত্ত্বের মূল্যে বিকাইবে না, রসের দরেই ইহার আদর।" এইখানে ত কবিবর স্পষ্টই আমাদের বলিয়া দিতেছেন যে ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি মাত্র; যে ইহা 'হৃদয়েরমধ্যে' অনুভব না করে তাহাকে ইহার সত্যতা মানিয়া লইবার জন্য মাথার দিব্য দেন নাই। তথাপি অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হওয়া কতদূর শিষ্টাচারসম্মত তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। মেঘদূত-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ

হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল তাহা যেন কেহ না মনে করেন, রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করিতে কাহারও অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উপর্য্যুপরি বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণে লোকে আক্রমণকারীরই প্রকৃতমূর্ত্তি জানিতে পারিতেছে; আক্রান্ত বিষয়ের যে কোন ক্ষতিই সাধিত হইতেছে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা উপলক্ষ করিয়া সমালোচক মহাশয় যে কয়েকটী 'সাধারণ প্রতিজ্ঞা' উত্থাপন করিয়া বিস্তর কাগজ ও কালীর অপব্যয় করিয়াছেন, সেইগুলির দুই একটী আলোচনা করিবার জন্যই আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

লেখক স্বীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার প্রতিবাদকল্পে যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই এরূপ অর্থহীন অসম্ভব প্রলাপোক্তি যে সেরূপ আমরা কোন সুবিজ্ঞ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আশা করি নাই। সমালোচনার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :— "রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে ভালো কাব্যমাত্রেরই নানাপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমার বিবেচনায় ঠিক তাহার বিপরীত। প্রায় ভালো কাব্যমাত্রেরই একই অর্থ থাকে। নানাদিক হইতে দেখা যাইতে পারে বটে—'যেমন অন্ধের হস্তিদর্শন'। কিন্তু সমগ্র অর্থ একটী। কেবল যেকাব্যের অর্থ একেবারেই নাই, তাহারই অর্থ নানা ব্যক্তি নানা রকম বাহির করেন ও সেগুলি লইয়া আপনাদের মধ্যে বিতণ্ডা করেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার মতানুযায়ী গুটিকতক ভালো নাম করুন দেখি? Wordsworth এর Highland Girl হইতে Ode on the Immortality of the Soul পর্য্যন্ত, রামপ্রসাদের 'আর কারে মা ডাকবো শ্যামা' হইতে চিরঞ্জীব শর্ম্মার 'আমি জানিনা চিনিনা দেখিনা তাহারে তথাপি তাঁহারে চাই' পর্য্যন্ত, Homer এর Iliad হইতে Shakespear এর King Lear পর্য্যন্ত, ভালো কাব্যের একই অর্থ। অন্য অর্থ যদি কেহ বাহির করেন সে অর্থ কষ্টকল্পিত (যেরূপ অর্থ ইতরবিশেষ সবকাব্য হইতেই বাহির করা যায়)।"

বিষম Challenge! বিষয়টা একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রবাবু বাস্তবিক কি বলিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বলেন 'ভাল কাব্যমাত্রেরই একটী গুণ আছে তাহার মধ্য হইতে নানা লোক নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং তাহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, এবং সবগুলি-কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোন ক্ষতি নাই। বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কাব্যের এইখানে প্রভেদ।'

ভাল কাব্যের মধ্য হইতে যে নানালোকে নানাভাব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাই আমরা প্রথমে সংক্ষেপে দেখাইব।* আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি Oliver Wendell Holmes একদা প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—A child's reading of Shakespeare is one thing, and Coleridge's or Schlegel's reading of him is another' এবং ইহার ব্যাখ্যা ক্রমে বলেন—The saturation point of each mind differs from that of every other. But I think it is as true for the small mind which can only take up a little as for great one which takes up much, that the suggested trains of thought and feeling ought always to rise above—not the author, but the reader's mental version of the author, whoever he may be..................... we may happen to be very dull folks, you and I, and probably are, unless there is some particular reason to suppose the contrary. But we get glimpses now and then of a sphere of spiritual possibilites, where we, dull as we are now, may sail in vast circles round the largest

* লেখক স্বীয় প্রবন্ধে প্রধানতঃ ইংরাজ কবিগণেরই দোহাই দিয়াছেন বলিয়া আমাদেরও এই প্রবন্ধ ইংরাজী-কোটেশন-কণ্টকিত করিতে হইল। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। (লেখক)।

compass of earthly intelligences.' * প্রত্যেক মানবের মানসিক পরিণতি স্বতন্ত্র। তাই কোলরিজ কিম্বা শ্লেগেলের কাছে শেক্ষপীয়রের যাহা অর্থ একজন বালকের নিকট তাহা নহে। কিন্তু কি ছোট, কি বড় সকলেরই মনের এরূপ একটী সাধারণ গুণ আছে যে তাহা সমুদিত ভাবপরম্পরাযোগে উপলব্ধ অর্থ অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠে। তুমি আমি ভাবগ্রাহী না হইতে পারি; কিন্তু (শেক্ষপীয়র কিম্বা তদ্রূপ কোন উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ পাঠকালে) আমরা এমন অধ্যাত্ম জগতের আভাস পাই যাহা হয়ত ঐ সকল মহাকবিগণেরও চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নাই। যদি সাধারণ লোকের সম্বন্ধেই ইহা সত্য হয় তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির উপর মেঘদূতের ন্যায় কাব্যের কিরূপ প্রভাব প্রকটিত হইতে পারে তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির ধারণারও অতীত।

যদি বালকের—যথা আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীর—শেক্ষপীয়র পাঠ আর কোল্‌রিজ কিম্বা শ্লেগেলের শেক্ষপীয়র পাঠ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় (এবং এ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতানৈক্য হইতে পারে না) তাহা হইলে আর সমালোচক মহাশয়ের theory দাঁড়ায় কোথায়? কারণ তাঁহার মতে 'ভালো কাব্য মাত্রেরই একই অর্থ থাকে' অতএব ভাল কাব্য যিনিই পড়ুন না কেন, প্রত্যেকেই তাহা একই অর্থে গ্রহন করিবেন। সুতরাং অর্থগত কোন বিভিন্নতা থাকিবার কারণ নাই। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই যে, সমালোচক মহাশয়ের মেঘদূত পাঠ, আর রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত পাঠ, এক নহে এবং কখনও হইতেও পারে না।

এইত গেল সাধারণ রকমের কথা—যদিও ঐ আমেরিকান দার্শনিক শেক্ষপীয়রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সমালোচকমহাশয় রবীন্দ্রনাথকে গুটিকতক ভাল কাব্যের নাম করিতে আহ্বান করিয়া নিজেই কয়েকটী খণ্ড কবিতা গান

ও নাটকের নাম করিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে এগুলির 'একই অর্থ'। Wordsworth এর প্রায় অধিকাংশ কবিতাই 'Highland Girl' এবং 'Ode on the Immortality of the Soul' এরত কথাই নাই—কোন সময়ে এর কিরূপ অবস্থায় লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা তাঁহার জীবনী পাঠে জানিতে পারি; এমন কি কবিতাবিশেষ রচনা কালে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল তাহাও অনেকস্থলে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সকল কবিতার যে একই অর্থ তাহা কেহ কখনও অস্বীকার করেনা; এবং এমন কাহার মাথাব্যথা ধরিয়াছে যে এগুলির একাধিক অর্থ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইবে? কিন্তু আমরা এখানে জিজ্ঞাসা করি—রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত ব্যাখ্যা কালে রামপ্রসাদ সেন এবং চিরঞ্জীব শর্ম্মার সম্পূর্ণ পরমার্থিক গানগুলিও ভাল্‌কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন এরূপ অসম্ভব ধারণাও কি কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে? এই গানগুলিকে অধ্যাত্মজগৎ হইতে পৃথিবীতে টানিয়া আনিয়া অথবা অন্য কোনরূপে একাধিক অর্থে ভূষিত করা কি কাহারও উর্ব্বর কল্পনায় আসিতে পারে? কিন্তু আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। যিনি চিত্রাঙ্গদায় দুর্নীতির পূতিগন্ধ পাইয়াছেন এবং যিনি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গানগুলির মধ্যে তিনটীমাত্র দাম্পত্যপ্রেমের গান খুঁজিয়া পান নাই, তিনি যে কবিবরের উক্তি বিশেষের বিকটঅর্থ প্রকটিত করিবেন তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

হোমারের 'ইলিয়ড' এবং আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত একই শ্রেণীর মহাকাব্য। এগুলি 'নিছাক' কবিকল্পনামাত্র নহে; প্রত্যেকটীরই কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। এবং এগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্যসমাজের প্রতিকৃতি আমরা এই মহাকাব্যগুলিতে দেখিতে পাই। কাব্যবর্ণিত বিষয় ব্যতিরেকে ইহাই এগুলির বিশেষার্থ। যদি কোন প্রতিভাবান্ ভাবুককবি অথবা কোন চিন্তাশীল দার্শনিক এগুলির অন্য কোন

সুসঙ্গত অর্থ বাহির করেন তাহাহইলে আমাদের তাহা 'কষ্ট কল্পিত' বলিয়া নাসাকুঞ্চন করিবার কি অধিকার আছে? রামায়ণ ও মহাভারতের যে কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এইসকল ব্যাখ্যা যে এখনও শেষ হয় নাই, পরন্তু এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে তাহার একটা আধুনিক প্রমাণ 'বঙ্গদর্শনে'র 'তারাদর্শক'। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন গীতায় 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' এবং কবি নবীনচন্দ্রের নিকট 'কর্ম্মক্ষেত্রে' পরিণত হইয়াছিল; এখন এই বিংশশতাব্দীতে প্রতিপন্ন হইতে চলিল যে মহাভারত একটি বিরাট জ্যোতিষ শাস্ত্র!

রূপক-কাব্য সকল সাহিত্যেই আছে; কিন্তু রূপক নহে অথচ কবকর্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক একাধিক অর্থে রচিত এরূপ কাব্য সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্যে আছে কিনা জানিনা। উদাহরণ স্বরূপ 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যের নাম করা যাইতে পারে! ইহাতে যে কেবল একাধারে রামায়ণ ও মহাভারতের বস্তু-বিন্যাস আছে তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক শ্লোকই দ্ব্যর্থ বোধক। যদিও ইহা ঠিক আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত নহে, তথাপি ইহা হইতে সংস্কৃতের একটা প্রকৃতিগত বিশেষত্ব পাওয়া যায়।

প্রতিভা কবি কিম্বা দার্শনিককে কিরূপ দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে লইয়া যায়, তাহার এক জ্বলন্ত উদাহরণ দার্শনিক বেকন্। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন গল্পগুলির সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দিয়া তিনি যে Wisdom of the Ancients নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই আলোচনা করিতে গিয়া ভিন্ন মতাবলম্বী পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ Comparative Mythology নামক আধুনিক শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এই সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় 'কৃষ্ণচরিত্রে' শ্রীমদ্ভাগবদ্বর্ণিত কালীয়দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার যেরূপ সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা কি তৎপূর্ব্বে কাহারও কল্পনায় আসিয়াছিল? যে কৃষ্ণলীলা সাধারণ হিন্দুর নিকট কৃষ্ণলীলামাত্র, বৈষ্ণবের নিকট মানবাত্মা ও পরমাত্মার

পরস্পর প্রেমলীলা, এবং খৃষ্টান মিশনারিগণের নিকট অশ্লীলতার চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার যে অর্থ বঙ্কিমবাবু প্রকটিত করিলেন তাহা অনেক অভিজ্ঞব্যক্তির নিকট সমাদর লাভ করিবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। (কাব্যাংশে 'শ্রীমদ-ভাগবত' যে ঐ জাতীয় কোন গ্রন্থ হইতে নিকৃষ্ট নহে, তাহ বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।)

এই সকল ভাবিলে মনে হয় যে এই বৈজ্ঞানিক যুগে হয়ত কোনদিন ইলিয়ডের একটা নূতন অর্থ বাহির হইয়া পড়িবে।

শেক্ষপীয়র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার নাটক বিশেষের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন এস্থলে দেখিতেছি না। এই মহাকবির জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলির,—বিশেষতঃ তাঁহার tragedy গুলির প্রত্যেকটী অতল সমুদ্রপ্রায়। তিনশত বৎসর ধরিয়া জগতের যত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল কবি দার্শনিক ও সমালোচক এই সমুদ্রের তল পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি এই নাটকগুলির মধ্য হইতে নানা লোকে নানা ভাব গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে এত ব্যাখ্যা, এত সমালোচনা কেন? King Lear এ আমরা কি দেখিতে পাই? সন্তানস্নেহাকাঙ্ক্ষী, নির্ব্বোধ লীয়র প্রথমে স্বীয় অবিমৃশ্য-কারিতার জন্য ভীষণভাবে প্রতারিত হইয়া অবশেষে অন্তিমকালে কিরূপে প্রকৃত স্নেহের মর্যাদা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহা উপভোগ করিবার পূর্ব্বে স্নেহময়ী কন্যার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া জীবন-লীলার অবসান করিয়াছিলেন—এই হৃদয়বিদারক চিত্র, না, উপকৃত কন্যাগণের উপকারী বৃদ্ধ পিতার প্রতি পৈশাচিক অকৃতজ্ঞ ব্যবহার, না আর কিছু? ইহার 'সমগ্র অর্থ'ই বা কি? কোন্‌টী মুখ্য আর কোন্‌টীই বা গৌণ? আর এই সকল দারুণ শোকাবহ ঘটনা নিচয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই বা কি? এই গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া সমালোচক Dowden শেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন—"We guess at the spiritual significance of the great tragic facts of

the world, but after our guessing their mysteriousness remains" * বস্তুতঃ এখন পর্য্যন্ত কোন সমালোচকই সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই,—"ইহাই এই নাটকের একমাত্র অর্থ, এবং এতদ্ব্যতীত আর কোন অর্থ হইতে পারে না।" মহাকবির 'Venus and Adonis এবং 'Rape of Lucrece আখ্যান বস্তুতেই লোকের চিত্ত বহুকাল আকৃষ্ট ছিল; তৎপর কোলরিজ যখন দেখাইলেন যে, এই দুইখানি কাব্য পরস্পর সম্বন্ধ (Companion poems), এবং একটীতে পুরুষের প্রতি নারীর, এবং অপরটীতে নারীর প্রতি পুরুষের প্রবল স্বাভাবিক আকর্ষণ সূচিত হইতেছে, তখন পরবর্ত্তী অধিকাংশ সমালোচকই এই 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' সাহ্লাদে গ্রহণ করিলেন। শেক্ষপীয়র—নিহিত অর্থভাণ্ডার নিঃশেষিত হইতে যে এখনও বহুবিলম্ব তাহার প্রমাণ নানাস্থনে প্রতিষ্ঠিত Shakespeare Society.

মিল্‌টনের Paradise Lost এর অন্ততঃ তিনটী সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। প্রথম, কাব্যবর্ণিত বিষয়, দ্বিতীয়, কবির জীবনকালীন ইংলণ্ডের আন্তর্জ্জনীন বিদ্রোহ—রাজায় ও প্রজায় যুদ্ধ (প্রজাতন্ত্রবাদীকবি বিদ্রোহী সয়তানকে রাজরূপীঈশ্বর অপেক্ষাও সমধিক বীরত্ব, তেজ ও গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন); এবং তৃতীয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চিরন্তন সংগ্রাম এবং ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। টেনিসনের Idylls of the King এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাব—Sense at war with Soul—কবি নিজেই গ্রন্থশেষে Epilogueএ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই বলিয়া যদি কেহ ঐতিহাসিক 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের কোন গূঢ়ার্থ খুঁজিতে গিয়া নিরাশ হন তাহা হইলে কখনও বলিব না যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ভ্রমপূর্ণ।

আর একটী কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে

* Shakespeare, His Mind and Art. Page 273.

হস্তক্ষেপ করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ভাল কাব্যের অনেক অর্থ হইতে পারে। সমালোচকবর ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে রবীন্দ্র বাবুর মতে যাহার অনেক অর্থ হয় না, তাহা ভাল কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব "Shakspeare গেলেন!" আশ্চর্য্য যুক্তি বটে! ঠিক কি রকম যুক্তি তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিই। মানুষ হাঁটিতে পারে, অতএব যে হাঁটিতে পারে না সে মানুষ নয়। এমন কোন ন্যায়বাগীশ বোধ হয় এখনও ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই, যিনি এই যুক্তির সপক্ষে মত দিতে পারেন। আর তাঁহার আবিষ্কৃত এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও যে 'Shakespeare যাইতে পারেন' না, তাহা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

সুন্দরী। *

১

দেখেছি তাহারে অবোধ বালিকা
কুসুম-কলিকা প্রায়;
নীহার কোমল, অরুণের মত
উজ্জ্বল তাহার কায়।
টগর গোলাপ বেলা যুথী জাতি
তাহার খেলার সাথী;
তাহাদেরি মত অমল সরল
হাসিমুখ দিবারাতি!

২

দেখেছি তাহারে যুবতী রমণী
অধরে মধুর হাসি,

* নাইট রচিত একটি ইংরাজী কবিতার অনুকরণে।

নবীনা প্রেমিকা প্রেমে ঢল ঢল
অনুপম রূপরাশি !
ধবল জোছনা তৃষিত নয়নে
করিত সে রূপ পান ;
বচনে তাহার বাজিয়া উঠিত
মধুর বীণার তান।

৩

কতই বরষ গিয়াছে চলিয়া
নদীর স্রোতের মত ;
কুঁড়ি হ'তে ফুল ফুটিবার পর
ফলে হ'লো পরিণত !
দেখিলাম তা'রে স্নেহশীলা মাতা
চুমিছে শিশুর মুখ ;
প্রেম-বিগলিত নয়নে তাহার
উছলি উঠিছে সুখ।

৪

আর একবার দেখেছিনু তারে
মরণ শয্যা'পরে,
পতিসুত পাশে বিদায় মাগিছে
চিরজনমের তরে !
বেদনার রেখা উঠে নাই ফুটি'
তাহার শান্ত মুখে ;
মরণের ভয় বারেকের তরে
জাগেনি তাহার বুকে।
শিয়রে তাহার বসিয়াছিলেন
নিখিল জগত স্বামী ;
এমন শোভন উজ্জল তাহারে
দেখি নাই কভু আমি।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible]

পটল।

পটল একপ্রকার উৎকৃষ্ট সব্‌জী। আজকাল কলিকাতার বাজারে পটলের যথেষ্ট আদর। আলু পটলের ঝোল এখন কেবল কলিকাতায় নহে অনেক মফঃস্বল সহরেও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীবাবুদের প্রধান অবলম্বন। আমার জনৈক কলিকাতাবাসী বন্ধু রহস্য করিয়া বলিতেন যে ভোজন সম্বন্ধে আমরা এখন আয়ুর্ব্বেদিক ও হোমিও-প্যাথিক উভয় প্রথা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছি, যেহেতু আলু পটলের পাঁচনের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ডোজে মাছ খাই। বাস্তবিক মাছের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় এখন আলু পটলই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কিন্তু এমন দুর্দ্দশা ছিল না। তখন অপর্য্যাপ্ত মাছ পাওয়া যাইত ঘরে ঘরে দুগ্ধবতী গাভী ছিল সুতরাং আলু পটলের জন্য আমিষাহারী কাহাকেও কাহাকেও বড় একটা অভাব বোধ করিতে হইত না। অনেক দিন ধরিয়া অপর্য্যাপ্ত মাছ খাইয়া খাইয়া মুখে অরুচি ধরিলে তাঁহারা মাঝে মাঝে তরকারীর আবশ্যকতা অনুভব করিতেন বটে কিন্তু তজ্জন্য কখনও ঝাঁকা লইয়া বাজারে দৌড়িতে হইত না। স্ব স্ব ক্ষুদ্র বাগানজাত শাক সবজীই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। অভাব পক্ষে কখনও প্রতিবেশীর বাগান হইতে চাহিয়া লইতেন। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি কোনও জ্ঞাতির মৃত্যুতে অশৌচ হইলে অথবা পূজা পার্ব্বনের দিনে মাত্র তাহারা নিরা-মিষ খাইতেন। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে দধি দুগ্ধ ও ঘৃত থাকায় তরকারীর আবশ্যকতা খুব কমই অনুভব করিতেন।

কিন্তু এখন সে দিন আর নাই। একদিন বাজার হইতে তরকারী না আসিলে অনেকেরই নুনে ভাতে তৃপ্ত হইতে হয়। সকাল বেলা একবার শিয়ালদহ বা হাবড়া ষ্টেশনে গেলে কি পরিমাণ তরকারি এই কলিকাতায় রোজ আমদানী হয় তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয় তন্মধ্যে পটল প্রধান। মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহী হইতে প্রচুর পরিমাণে

তরকারীতে ব্যবহার করা যায়। পটল ভাজা একটী উৎকৃষ্ট জিনিষ। ডালনা ও ঝোলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পটল সিদ্ধ ও মন্দ নয়। খোসা ও বীচি ছাড়াইয়া, ভাল সরিষার তৈল, নুন, কাঁচা লঙ্কা আদা বাটা ও সরিষা বাটার সঙ্গে একত্রে মাখিয়া লইলে একটী উপাদেয় জিনিষ তৈয়ার হয়। ইহা মুখ রোচক ও উষ্ণবীর্য্য। পটলের বীচি কচি অবস্থায় বিশেষ অপকারী নহে, কিন্তু শক্ত বীচি অপচক সুতরাং তরকারীতে ব্যবহার করিবার সময় তাহার বীচি ছাড়াইয়া লওয়াই নিরাপদ। খোসা ও সহজে হজম হয় না। সুতরাং কুটিবার সময় বঁটীর বুক দিয়া পটলটা লম্বাভাবে চাঁচিয়া লইলে ভাল হয়। তাহাতে সিদ্ধ হওয়ার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হয়। নচেৎ পিঠ বা খোসার দিকটা ভাল রকম সিদ্ধ হইতে হইতে ভিতরের দিক বেশী সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। আজ কাল পটলের বহুল আমদানী হেতু তাহা খাওয়ারও অনেক নূতন নূতন সঙ্কেত বাহির হইতেছে।

এখন যে পটলের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলেও পাঠকগণের বিরক্তিকর হইবে না এই ভরসায় তাহার চাষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পটল এক প্রকার লতার ফল। পটললতাকে পলতা বলে। ইহার লতা ও পাতা তিক্ত। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

পটলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বর কাশ কৃমি প্রণুৎ॥

পলতা পিত্তনাশক অগ্নিদীপক; পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর কাশ ও কৃমি রোগ নিবারক। অন্যত্র উক্ত আছে—

পটলপত্রং পিত্তঘ্নং নালং তস্য কফাপহা।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচনং॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে পটলের পাতা, লতা, ফল, এবং মূল প্রত্যেক জিনিষই বিশেষ উপকারী। কোনও কঠিন ব্যারামের পর আহারে অরুচি জন্মিলে মুরল্লা টেংরা প্রভৃতি অল্প তৈল বিশিষ্ট

মাছের সঙ্গে কচি কচি পলতা পাতা ও ডগা দিয়া শুক্ত রাঁধিয়া দিলে রোগীর অরুচি দোষ শীঘ্র ২ সারে। ডগাগুলি চিবাইয়া ফেলিয়া দেওয়াতে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় ও জিভ পরিষ্কার হয়।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই পটলের জন্মস্থান। তাই বলিয়া দারুণ গ্রীষ্মে অনবরতঃ অনেক দিন ধরিয়া সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ ঢালিতে থাকিলে পটল গাছ বাঁচিতে পারে না। অতি কষ্টে বাঁচিলেও সুফল প্রদান করিতে পারেনা।

পটল দোআঁশ মাটীতেই ভাল জন্মে। শাকসবজী মাত্রেই দোআঁশ মাটীতে ভাল হয়। অধিক বেলে বা আঁটাল মাটীতে সবজী প্রায় হয় না। কদাচিৎ হইলেও তাহাতে সবজীর খাদ্যের পরিমাণ কম থাকায় গাছ ভাল বাড়িতে পারে না, বা একদম মরিয়া যায়। সুতরাং পটল বা অন্য কোনও রকম সবজীর চাষ করিতে জমির মাটী ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। বেশী আঁটাল বা বেলে মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিলেও ফসল ভাল জন্মিতে পারে না। কারণ আঁটাল মাটীর দোষ এই যে তাহার কণিকাগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। তজ্জন্য গাছ গাছড়ার কোমল শিকড়গুলি সহজে প্রবেশ করিয়া ছড়াইতে পারে না। গাছের গোড়াতেই জড়াইয়া থাকে, কাজে কাজেই যথেষ্ট পরিমাণ রস ও জল আকর্ষণ করিয়া গাছের পুষ্টি সাধন করিতে পারে না। আর এক কথা এই যে আঁটাল মাটী একবার টানিয়া গেলে এমন শক্ত হইয়া যায় যে তাহাতে জল ছিটাইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং গাছ মরিয়া যায়। অত্যন্ত বেলে মাটীর দোষ এই যে, তাহাতে জল মোটেই দাঁড়াইতে পারে না; বৃষ্টি হওয়া মাত্রই উপরের সারভাগ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নিম্নে চলিয়া যায়, এবং উপরের মাটী অল্পক্ষণ পরেই যেই ধুলা সেই ধুলায় পরিণত হয়। সুতরাং কৃষির পক্ষে অধিক বেলে বা অধিক আঁটাল মাটী ভাল নহে।

মাটী পরীক্ষা।

মাটী পরীক্ষা একটী কঠিন কাজ। আমাদের দেশে সাধারণতঃ মূর্খ লোকেরাই চাষের কাজ করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদের দ্বারা মাটী পরীক্ষার কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তবে দে আঁশ মাটীর পরিচয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে ইহা বেলে ও আঁটাল এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং ইহার রং সাধারণতঃ হরিতাভ। পলিপড়া আঁটাল মাটীতে ও পটলের চাষ চলিতে পারে কিন্তু জমিতে নানা রকমের মাটী থাকিলে তাহা ভাল রকম চষিয়া এক জাতীয় করার চেষ্টা করা উচিত। জমিতে যাহাতে প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত ও হাওয়া খেলিতে পারে এমন জায়গায় পটল চাষের জন্য জমি ঠিক করিতে হইবে। কোনও রকম আওতায় পটল ভাল জন্মায় না। এবং যাহা জন্মে তাহাও নিকৃষ্ট জাতীয় হয়। বাঁশের ঝাড় শাক সবজির একটী প্রধান শত্রু। বাঁশের ঝাড়ের নিকট কোনও শাক সবজিই জন্মিতে পারে না। বাঁশের শিকড় সরু কিন্তু অনেক লম্বা ও বিস্তৃত। যেখানে বাঁশের ঝাড় আছে তাহার অনেক দূরে ও মাটী খুঁড়িলে শিকড় পাওয়া যায়। ইহাদের শিকড় যতদুর পর্য্যন্ত যায় সেই স্থানের রস জল এমন ভাবে চুষিয়া খায় যে তাহাতে একটী দুর্ব্বাঘাস পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে না। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রের নিকট ইত্যাকার শত্রুকে কখনও স্থান দেওয়া উচিত নয়।

চাষ।

ভাল স্থান ঠিক করিয়া আশ্বিন বা কার্ত্তিকের প্রথমে জমি খুব ভাল করিয়া তিন চার বার চষিয়া দশ বারোদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে অনেকগুলি লাভ আছে; প্রথম চাপা মাটীর যে একটা বদ ভাঁপ্ আছে তাহা রৌদ্র বাতাসে নষ্ট হইয়া যায়। বাতাসের কার্ব্বনিক এসিড নামক গ্যাস্ মাটীতে সঞ্চিত হয়। মাটীতে

যে সকল সারবান পদার্থ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় চাপা পড়িয়া ছিল তাহা বাতাসের অক্‌সিজেন ভাগ টানিয়া লয় ও পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। জমিতে সার দেওয়ার আবশ্যক বোধ করিলে এই সময়েই সার ছিটাইয়া আরও দুই তিন বার উল্টাপাল্টা চাষ দিয়া সারগুলি মাটীর সঙ্গে ভাল রকম মিশাইয়া দেওয়া উচিত। জমির মাটী যে পর্য্যন্ত না বেশ আল্‌গা হয় সেই পর্য্যন্ত বার বার উল্টাপাল্টা চাষ ও মই দেওয়া আবশ্যক। মাটী আল্‌গা না হইলে গাছের কোমল শিকড় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং তন্মধ্যস্থিত সার পদার্থ উদ্ভিদের কোনও প্রয়োজনে আসে না। আমাদের চতুর্দ্দিকে অপর্য্যাপ্ত ধান গম পড়িয়া থাকিলেও জল ও অগ্নির সাহায্যে ভাল রূপ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন আমাদের আহারের উপযোগী হয় না উদ্‌ভিদ সম্বন্ধেও তাই মাটীর সার ভাগ যে পর্য্যন্ত জল ও বাতাসের সংসর্গে না আসে সে পর্য্যন্ত তাহা উদ্ভিদের কোন কাজে লাগে না। জল ও হাওয়া শূন্যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণ সারের ভিতর খুব উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়াও দেখা গিয়াছে তাহা আদৌ অঙ্কুরিতই হয় না। মাটী বেশ আল্‌গা না হইলে তাহার ভিতর জল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং প্রচুর সার থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদগুলি তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। ঠাকুরমার গল্পে শুনিয়াছিলাম যে ব্রহ্মদস্যির গলার পথ এত সরু যে, সে কোন কঠিন জিনিষই গিলিতে পারেনা, কেবল দুই এক চামচ দুধ ও জল অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এখন উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে এগুলি ও ব্রহ্মদস্যিরই মত কোন কঠিন জিনিষ গ্রহণ করিতে আদৌ অপারগ। সার পদার্থ যে পর্য্যন্ত জলের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে গলিয়া না যায় সে পর্য্যন্ত তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এমন কি সেই মিশ্রিত তরল পদার্থে সারের ভাগ যত কম হইবে উদ্ভিদের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা ততই সুবিধা। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে উদ্ভিদগুলি শিকড়দ্বারা যে তরল পদার্থ চুষিয়া লয়

তাহার এক হাজার ভাগে প্রকৃত সার জিনিষ দুই এক ভাগের বেশী প্রায়ই থাকে না। অবশিষ্ট ভাগ জল, সুতরাং উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য জল কত বেশী দরকারী তাহা বলাই বাহুল্য, জলের সামান্য অভাব হইলেই গাছ উপোস পড়িবে। জমির মাটী বেশ আল্‌গা ও গভীর ভাবে না খুঁড়িয়া দিলে তাহা সজল থাকিতে পারে না। বৃষ্টি বা সিঞ্চিত জল শক্ত মাটী ভেদ করিয়া নীচে যাইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাতে উদ্ভিদের কোনও উপকার হয় না। এই সমস্ত কারণেই মাটী যাহাতে বেশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গান।

সিন্ধু কানেড়া—মধ্যমান।

অয়ি যামিনী অভিমানিনী।
অয়ি বিবহমত্ত ব্যাকুল চিত্ত
ভামিনী উন্মাদিনী।
ঊর্দ্ধে এলায়িত জলদকুন্তল, ঝরে অবিরল আকুল আঁখিজল
নিশ্বাস চঞ্চল কানন তরুদল
সাগর নিঝর তটিনী,—
কেন কেন গো বিষাদিনী।
কান্তি আবৃত তিমির বসনে, কভু উঠে স্ফুটি দামিনী কম্পনে
উঠে গুমরি গুরু গর্জ্জনে
মেঘ মল্লার রাগিনী,—
বিরহ অনুগামিনী।

শ্রীকামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য।

কাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি।

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'প্রেম' আখ্যা দিয়া থাকি—একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায়— তাহা প্রেম নয়, প্রেমের আচ্ছাদনে আমরা কামকেই পূজা করিয়া থাকি। প্রেমের দেবতাকে পূজা করিতে আসিয়া আমরা কামের চরণে অর্ঘ্য দিয়া থাকি—ও মনে করি আমরা চরিতার্থ হইয়া গেলাম! বাস্তবিক 'প্রেম' জিনিবটা অতি সুন্দর, স্বর্গীয় সৌরভে মণ্ডিত। চণ্ডীদাস প্রেমের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই—

"বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি"
রসের সাগর, মন্থন করিতে
তাহে উপাজিল "রী"।
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি ?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার।

কিন্তু আমাদের দোষে আজ কাল 'প্রেম' কথাটারই মধ্যে কত লাম্পট্য, কত বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে! ইহা অবশ্যই বিস্ময় ও দুঃখের বিষয়। পুরাকালের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়—প্রেমের আবরণে আচ্ছাদিত এই কাম সামান্য বায়ুর ফুৎকারে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত কত শত শত মূল্যবান জীবন

স্রোত বেগে বহিতেছে! ইহার কারণ আর কিছুই নয়। বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়া আমরা প্রেমকে ধরিতে পারি না—কামকে পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য সুখানুভব করি—তারপর অনন্ত নরক। এই কারণেই পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান ছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। কাঁচা জিনিষ ভাঙ্গিয়া গড়া বড় সহজ। কিন্তু যাহা একবার শক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আর গড়া যায় না—গড়িতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যদি ব্রহ্মচর্য্য অবিচলিতভাবে পালন করা যায়—শত আঘাতেও সে গঠিত চরিত্র আর ভাঙ্গা যায় না। তাই ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য জীবন। এজীবনে আর অধঃপতনের আশঙ্কা নাই। কাম আর প্রেমেরবেশে এজীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে না। তাই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া কামের দেবতা দূরে সরিয়া যান। তিনি জানেন মহাদেবের ক্রোধাগ্নি একদিন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। বহুদিন হইল আমাদের দেশের সে সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত। যাহাদের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, বাল্যকাল হইতেই এখন তাহারা বিলাসিতা শিখিতে আরম্ভ করে, তারপর যৌবনে ঘোর ইন্দ্রিয়পরতায় লিপ্ত হয়। এই রকম করিয়াই আমরা আমাদের নিজের পায়ে কুড়াল মারিতেছি—এই রকম করিয়াই আমরা দাসত্বের শৃঙ্খল আরও ভারি করিয়া দিতেছি।

মহাকবি কালিদাসের অত্যুজ্জল রত্ন শকুন্তলা আমাদের জীবনে অনেক শিক্ষা দেয়। প্রথমদর্শনেই দুষ্যন্ত শকুন্তলার অনির্ব্বচনীয় রূপে মোহিত, শকুন্তলাও দুষ্যন্তের সুকুমার দেহের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ! এইস্থানেই কাম প্রবেশ করিল, প্রেমের স্থান হইল না। তারপর দুইজনেই কামের মোহে অন্ধ হইয়া পড়িল—কামের পীড়নে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। এটা খুব স্বাভাবিক। তপোবনপালিতা শকুন্তলা কোনও কালে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তির এ ক্ষমতার

কিন্তু পথিমধ্যে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, আজ শকুন্তলাও তাহার নূতন ভাবের পরিচয় পাইয়া সেইরূপ চমকিয়া উঠিল—তাহার সমস্ত হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা স্রোত বহিয়া গেল, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। তারপর প্রবল বাতাসে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এইভাব তাহার সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিল বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা ও লজ্জা তাহার বালিকাসুলভ চপলতার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু ইহার পরিণাম কখনই মঙ্গলময় হইতে পারে না। "যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেইজন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" তাই কবির দুর্ব্বাসার সৃষ্টি। এ সৃষ্টি অতি সুন্দর, শিক্ষাপ্রদ। শকুন্তলা কামের উৎপীড়নে যখন কর্ত্তব্য ভুলিয়া পথচ্যুতা—দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না—তখন দুর্ব্বাসার মুখ হইতে কুলীশ নিস্বনে বাহির হইল—

> "বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
> তপোধনং বেত্সি ন মামুপস্থিতম্।
> স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপিসন্
> কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥"

কাম চিরকাল এইভাবেই লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। কাম লোককে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করে, আর প্রেম মানুষকে চির-মঙ্গলালয়ে লইয়া যায়। কামে মনুষ্য সমাজে পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়, মনুষ্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, আর প্রেম মনুষ্য সমাজে পুণ্যের বাতাস বহাইয়া দেয়—মানুষকে কর্ত্তব্য শিখাইয়া দেয়। তাই শকুন্তলাকে কবি দুর্ব্বাসার দ্বারা অভিশপ্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে এমনি করিয়া কাম চিরকালই অভিশপ্ত হইয়া থাকে—প্রত্যেকেই প্রথমে শকুন্তলার মত এ অভিশাপ শুনিতে পায় না—তারপর কিছুকাল পরে লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত হইয়া অপার দুঃখার্ণবে আত্মপ্রদান করিয়া থাকে।

যেখানে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ আছে, সেখানে প্রেমের দেবতা যান না। সুন্দর জিনিষ দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়াও তৃপ্তি হয় না। জগতে এমন লোক অল্পই আছে যে সুন্দরকে ভালবাসে না। গুণের আদরের চেয়ে সৌন্দর্য্যের আদর জগতে বেশী। রূপের আকর্ষণে অসংযত হৃদয়গুলি শীঘ্রই পাপে নিমগ্ন হয়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কোন কালেই সৌন্দর্য্যের হাত হইতে মুক্তি পায়না। সে রূপের অনলে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়া নিজেই নিজের বিনাশ বহন করিয়া আনে। যাহারা কামকে জয় করিয়াছে—সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না—তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়া দেয়। তাহাদের ভালবাসা কামগন্ধ বিহীন, তাহারা জানে—

"পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥"

এই ভালবাসাই প্রেম। গুণের আকর্ষণেও অনেকে অনেককে ভাল বাসিয়া থাকে। সে ভালবাসা সময় সাপেক্ষ। রূপমুগ্ধ ব্যক্তির মত গুণমুগ্ধব্যক্তি এক মুহূর্ত্তে তাহার প্রিয়তমকে বাছিয়া লইতে পারে না। গুণমুগ্ধব্যক্তির ভালবাসা নির্দ্দোষ। অশিক্ষিত লোক কোন কালেই গুণের আকর্ষণে কাহাকেও ভালবাসে না—কারণ, সে গুণের আদর জানে না—কোন্‌টা গুণ কোন্‌টা দোষ তাহা তাহার বুঝিবারও সাধ্য থাকে না। তাই সে সৌন্দর্য্যের মোহে যত শীঘ্র অন্ধ হইয়া পড়ে—গুণের আকর্ষণ ততশীঘ্র তাহাকে মঙ্গলপথে লইয়া যাইতে পারে না। মহাকবি সেক্ষপীরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ডেসডেমোনা কাল মুর ওথেলোর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিয়াছিল। ডেসডেমোনা অতি সুন্দর সৃষ্টি। "সৌন্দর্য্য যেখানে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে, সেখানে বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিধান তাহাকে আর খাটে না। সেখানে আর ভূষণের

প্রয়োজন কি ? প্রেমের মন্ত্রবলে মন যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তাহাকে বাহ্য সৌন্দর্য্যের নিয়মে বিচার করা চলে না।" জগতের লোক ওথেলোকে কালমুর ভাবেই দেখিয়াছিল—কিন্তু ডেসডেমোনার চোখে তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্য বাহ্যিক কাল আবরণ ভেদ করিয়া সহস্র রশ্মিতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ডেসডেমোনা এই কালো মুরকে অবিচলিত ভাবে, প্রকৃত প্রেমিকার মত ভালবাসিয়াছিল—মৃত্যুর এক মুহূর্ত্ত আগে যখন এমিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"O ! who hath done this deed ?" তখনও ডেসডেমোনা প্রকৃত প্রেমিকার মত উত্তর করিল—

"No body; I myself; farewell; Commend me to my kind Lord. O ! farewell !"

একমুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা কিম্বা বিরক্তি আসে নাই। এইত প্রকৃত প্রেমের আদর্শ।

আমাদের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে প্রধান দুইজন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। প্রাচীন কবিদের গ্রন্থে আমরা প্রধানতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমে অনুরাগ তারপর মিলন ও বিরহ। এই বিরহেই প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হয়। যিনি প্রকৃত প্রেমিক তিনি এ বিরহে কাতর হইয়া পড়েন না—এই বিরহের মাঝে তিনি মিলনের সার্থকতা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যান। এই বিরহে যাঁহার প্রেম হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বরং বাড়িতেই থাকে—তিনিই প্রেমিক পদের অধিকারী হইতে পারেন। যে প্রেম দেহের সঙ্গসুখের আশায় অপেক্ষা করে—যাহা বিরহে কিছুদিন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তারপর চির নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা স্বার্থ মলিনতাগন্ধে ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় দূষিত। পাপে কোন দিন পুণ্য থাকিতে পারেনা —যাহা পাপ তাহা চিরকাল পাপই থাকিবে। পাপকে যাঁহারা পুণ্যের বেশে দেখিতে পান—তাঁহারা হয় অন্ধ, আর না হয় নিজেরাও সে দোষে দূষিত। প্রেম স্বর্গের জিনিষ, ইহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থাকিতে পারে না। এই প্রেমই হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তির আর একটা উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে নিষ্কামপ্রেমের বলে প্রেমিক জগৎজয় করিয়া ফেলেন, হিন্দুশাস্ত্রের তাহাই আদর্শ। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পুস্তক ও মাসিকসাহিত্য সমালোচনা।

The Devalaya. Its aims and objects. By Sitanath Tatwabhusan—Price 4 as.—Second edition.—এই পুস্তকে গ্রন্থকার দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশীপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং দেবালয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তিকায় শশী বাবুর কর্ম্মময় জীবনের আভাস মাত্র পাইয়াছি।

দেবালয়ের উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাতে কাহারো সন্দেহ মাত্র নাই—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এখানে ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আরাধনাই দেবালয়ের মূল সূত্র। সব ধর্ম্মই এক—জীবে প্রেম, স্বার্থ বিসর্জ্জন, নারায়ণে ভক্তি—ইহাই ধর্ম্মের মূল।

(Annual report) বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখিলাম Depressed Classes Missionএর চাঁদা তিন টাকামাত্র কিন্তু ওদিকে বাজে খরচ অনেক বেশী। দেবালয়ের পক্ষে, ইহা নিতান্তই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। আর্ত্তের সেবা, দুঃখীর দুঃখবিমোচন ইহাই দেবালয়ের মূলমন্ত্র হওয়া উচিৎ, নতুবা আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ অধঃপতিত দেশে কে আর এ কাজের ভার গ্রহণ করিবে? প্রার্থনা করি দেবালয়ের উদ্দেশ্য সফল হউক, জগতে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ লুপ্ত হউক, ন্যায়ের দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক, সাম্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক।

বঙ্গদর্শন—আষাঢ়—'টাইট্যানিকের তিরোধান' বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত। অনেক বক্তৃতার পর বিপিন বাবু বলিতে চাহিতেছেন যে 'টাইটানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান ও জগৎ লাভবান হইয়াছে।' 'নাহি সে' বড়াল কবির কবিতা। 'হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্রতা' হরিদাস ভারতী লিখিত উপভোগ্য প্রবন্ধ—কিন্তু সূচিপত্রে দেখিলাম ইহাও বিপিন বাবুরই লিখিত, বিপিন বাবু "হরিদাস ভারতী" এই বিচিত্র নাম কবে গ্রহণ করিলেন জানিতে উৎসুক রহিলাম। "ভারত, আয়র্ল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি"—ইহাও বিপিন বাবুরই লিখিত—সূচিপত্র দেখিয়া জানিলাম—কারণ ভিতরে নাম নাই। 'করুণ রবি'

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের পুষ্পাঞ্জলি—সমালোচনা নহে। "বিলাতী কথা" বিলাত-ফেরত লিখিত—সুখপাঠ্য কৌতুহলোদ্দীপক ভ্রমণকাহিনী—পাতা উল্টাইয়া সূচিপত্রে দেখি ইহাও বিপিনচন্দ্রেরই লিখিত! বিপিন বাবু এখন 'সাহিত্যের জুড়ী গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছেন'—এখন কবিতা এবং গল্পগুলিও তিনি লিখিয়া ফেলিলেই 'বঙ্গদর্শন' নিশ্চিন্ত হইতে পারে। বিপিন বাবুর ন্যায় শক্তিশালী লেখক সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়—বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। 'সভাপতির অভিভাষণ' সুরমোপত্যকা সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত—উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'ফলিত জ্যোতিষ' সুখপাঠ্য সুন্দর ছোট গল্প—বেচারী অনুকুলের জন্য আমাদেরও কষ্ট হইতেছে।

মুকুল—আষাঢ়। 'বর্ষা' কবিতাটি ছেলেদের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়াছে। 'মৃত্যুর সম্মুখে' প্রবন্ধটীতে ষ্ট্রসের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই—অথচ 'এষ্টর' এবং 'ষ্ট্রস' দুজনারই ছবি দেওয়া হইয়াছে। 'চাঁদ' প্রবন্ধটী বেশ। প্রসন্নময়ী দেবীর 'মাতৃস্নেহ' সুন্দর। "বৈদ্যুতিক ভোজবাজী" তথ্যপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ। 'মানুষের পরিচয়' সঙ্কলনটী প্রশংসার্হ। 'রাজা হতেম যদি' কবিতাটী সুন্দর। ইহার ছন্দ, ভাব ও ভাষা বেশ সরল। কবিতায় এমন শিক্ষাপূর্ণ গল্প ছেলেদের নিকট খুব উপাদেয় বোধ হইবে সন্দেহ নাই। বালকবালিকাদের পত্রিকায় এইপ্রকার লেখাই প্রকাশ করা উচিত। মুকুলে আজকাল এই শ্রেণীর লেখা বড় দেখিতে পাই না।

সাহিত্য সংবাদ—প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৯ "পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশানুসারে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত।" প্রথম প্রবন্ধটীর কোনও নামকরণ হয় নাই, তবে সূচীপত্রে ইহাকে 'সম্পাদকীয়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চেহারা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে বোধ হয় ইহাতে সাময়িক সংবাদ কিম্বা অন্য কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু পাঠ করিয়া দেখা গেল যে ইহা একটী সুন্দর সন্দর্ভ। ইহাকে ঘন ঘন

তারকাচিহ্ন দ্বারা শোভিত করা হইল কেন বুঝিলাম না। ইহাতে প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না—। প্রবন্ধের এক স্থানে আছে "দুঃখ নিবৃত্তিরই নামান্তর মুক্তি" ; সুখও কি মানুষের মুক্তির পথে যথেষ্ট বন্ধন নহে ?—'সহমরণ' প্রবন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষে পৌরাণিক যুগের ও বহু-পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। 'রামায়নিক কাল' 'মহাভারতিক কাল' ও 'বৈদিক কালে' উক্ত প্রথার প্রচলন সপ্রমান করিতে গিয়া লেখক রামায়ণ ও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়াছেন কিন্তু বেদ হইতে কিছুই উদ্ধৃত করেন নাই। উপসংহারে লিখা হই-য়াছে "সহমরণের প্রতি কাহারও অনুরাগ বর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের আদৌ নাই।" "আমরা বলি ভাল, কারণ আজকাল তেমন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণও ঘনাইয়া উঠে। 'নিরক্ষর কবি' সুখপাঠ্য। 'দিল্লী রাজধানী' 'প্রবন্ধাষ্টক' ও 'সাইরস' তথ্যপূর্ণ সুতরাং উল্লেখযোগ্য। 'প্রবন্ধাষ্টকের' রচনাভঙ্গী প্রশংসার্হ নহে। 'সাইরসের' লেখক আসিরিয়কে (Assyria) অসুররাজ্যে পরিণত করিলেন কেন ? 'মন্ত্রশক্তিতে' অনেক জানিবার বিষয় আছে। ইহার এক স্থানে পড়িলাম—"অল্পকাল পূর্ব্বে কলিকাতার মওলাবক্স নামে এক গায়ক আসিয়াছিল—তাহার স্বর মূর্চ্ছনায় ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিত।"— "বসন্তে" ও 'মহত্ব' কবিতা দুইটী বেশ ভালই লাগিল। ইহা ছাড়া দুইটী গল্প কয়েকটী কবিতা আছে।

'মনসদ আলি দেওয়ান শ্রীআলিমদাদখাঁ বাহাদুরের হাফটোন চিত্র আছে—কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার পরিচয় পাইলাম না।

আমরা এই মাসিকের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শিশু—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। 'ঘুমের ঘরের শিশু' তিনরঙ্গে ছাপা বিলাতি ছবির অনুলিপি সুন্দর হইয়াছে। 'ছাত্রজীবন' মহসীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিশেষ। 'পেটুকগদা' বাহদৃশ্যে কবিতা বটে—এমন

আসরে নামিয়া দরকার নাই। 'মাকড়সার জাল' নীতিবিষয়ক গল্প—চিত্রউত্তম। 'যেমন কে তেমন' মন্দ হয় নাই। 'হস্তহীন চিত্রকর' অধ্যাবসায়ের উজ্জল দৃষ্টান্ত। এইরূপ জীবনী প্রত্যেক মাসে দু'একটী করিয়া প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দক্ষিণা বাবুর 'পড়া' শিশুদের নিকট কিছু বেশী শক্ত ঠেকিবে। ভাষার চটক্ একটু কমাইলে ভাল হইত। 'লালিমা' Red Riding Hood এর অনুবাদ মন্দ হয় নাই। 'শশাবতা' রসিক বাবুর রসাল কবিতা বিশেষ। পদে পদে ছন্দ পতন—এমন কবিতাগুলি কেন যে ছাপান হয় বুঝিতে পারিলাম না। আষাঢ়ের তিনরঙ্গে ছাপা চিত্রের নাম—থির্থির্। Design ভাল হয় নাই। 'সাতখানা পিঠে' উপাদেয় কবিতা। 'উঠপক্ষী' জ্ঞানসূচক প্রবন্ধ। 'শ্রীমন্তসওদাগর'—মজাদার কবিতা। নমুনা দেখুন—প্রথমেই আছে—

"এই দেশে ছিলরে ভাই
ধনপতি সওদাগর,
বার বৎসরের তরে সাধু
গেলেন সফর।"

ইহাও নাকি কবিতা। যার ছন্দ জ্ঞান নাই তার কবিতা লেখার চেষ্টা বৃথা—বিশেষতঃ ছেলেদের জন্য। কবি লাজভয়ে আত্ম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। "বটুক" নরেন বাবুর গল্পবিশেষ উপভোগ্য! 'বাণীর মন্দির' মনোমোহন সেনের কবিতা। শিশুদের মাথায় ঢুকিবে না। 'সদুপদেশের ফল' কোমলমতি বালকবালিকাদিগের পক্ষে, উপাদেয় বটে। 'জল্লাদ ও প্রহ্লাদ' চলনসই নাতিপূর্ণ কবিতা। তবে 'শিশুর' অধিকাংশ কবিতাই সৃষ্টিছাড়া নিরস বাজে কথা। আশাকরি বরদাবাবু সেদিকে একটু খেয়াল রাখিবেন। 'বাহাদুর বিড়াল' Puss in boots নামক ইংরেজী গল্পের সুন্দর অনুবাদ। 'দুর্গ' উপদেশ সূচক গল্প। উদাহরণটী তেমন উজ্জল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।
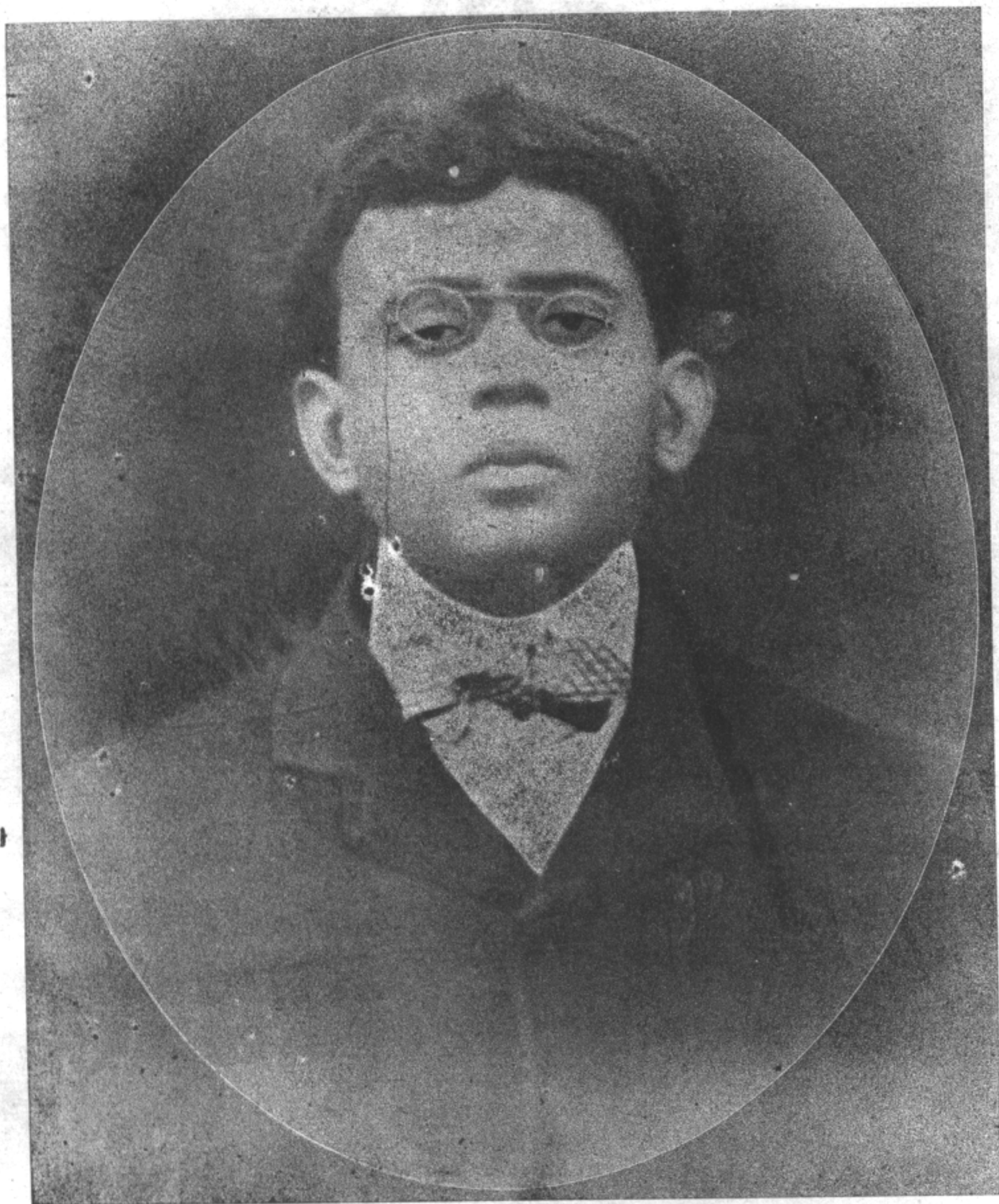
স্বর্গীয় হরিনাথ দে।
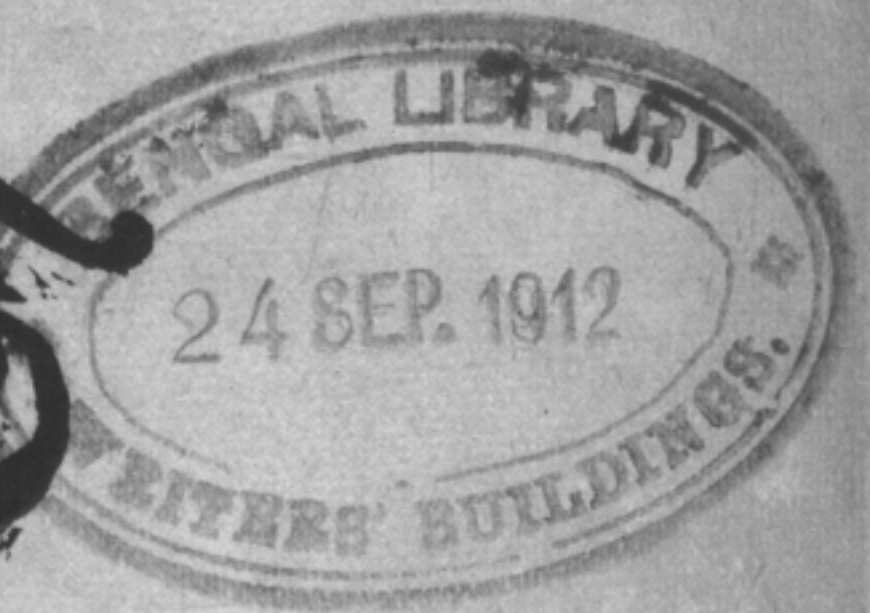
"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১৯ [৫ম সংখ্যা।

মানসী।

ঘন সেফালীর বনে, বসিয়া বিছানো ফুলে
কবির মানসী বালা রূপে ঢল ঢলে;
একাকিনী নিরজনে, মোহিয়াছে কি স্বপনে,
ভাবের কুসুমগুলি নয়নে উছলে।
পাতার আড়ালে থাকি, সুস্বরে গাহিছে পাখী,
নিরখিয়া দেববালা সেফালীর মূলে,
মধুর মৃদুল বায়, ফুলগুলি ঝরি গায়
পড়েছে তরঙ্গখেলি বসন আঁচলে।
অকলঙ্ক রূপ রাশি আননে রয়েছে ভাসি
হাসি হাসি চায় বালা মদির বিভলে;
কল্পনা বুকের প'রে পরশে কম্পন ভরে
মোহন মঞ্জিল গীতি নীরবে উথলে

চেয়ে ওই মুখ পানে শীতল সুরভি দানে
পবন ব্যজন করে চরণ কমলে
বনতরু লতাপাতা কি যেন কহিছে কথা
বালার ললিত তানে মেতেছে সকলে।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

কাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাশ্চাত্য কবিরা বিরহেই তাঁহাদের কাব্যের যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য কবিগণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। আমাদের সংস্কৃত কাব্যে বিয়োগান্ত নাটক এক রকম নাই বলিলেই চলে। প্রত্যেক কাব্যেই কবি নায়ককে ভয়ানক অগ্নিপরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—তারপর নায়িকার সহিত তাঁহার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন—জগতে অবিমিশ্র সুখ দুঃখ থাকে না। সুখের পর দুঃখ, ও দুঃখের পর সুখ—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যদি জগতে শুধু সুখ থাকিত তবে লোকে দুঃখকেত বুঝিতই না—আর সুখকেও সুখ বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তাই উভয়কে ঠিক বুঝিবার জন্যই উভয়ের সৃষ্টি। প্রেম সম্বন্ধেও ঠিক ইহাই খাটে। যদি মিলনেই প্রেমের চরম সার্থকতা সাধিত হইত, তাহা হইলে কেহ প্রেমকে বুঝিতে পারিত না—আর তাহা অনেক সময় ইন্দ্রিয়পরায়ণতায়ই সমাপিত হইত। প্রেমকে বুঝিবার জন্যই, মিলনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইবার জন্যই, বিরহের অস্তিত্ব। যাঁহাদের প্রেম এই বিরহ জনিত অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে ও এক গতিতে অবিরাম স্রোতের মত বহিয়া চলে—তাঁহারাই শেষে প্রার্থিতকে পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া যান। সে প্রেম তখন বিশ্বের অনুকণার মাঝে প্রিয়তমের ছবি দেখিতে পায়—সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়া ধন্য হইয়া যায়। বিরহের পর

এই যে মিলন—ইহাতে আর দেহের মিলনের দরকার হয় না, এ মিলন দেহ ছাড়িয়া ভাবের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। সমস্ত জগৎ এ মিলনের মাঝে আপনাকে হারাইয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের মধ্যেও আমরা ঠিক এই ভাবটিকে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের নামও গুণ শুনিয়া তাঁহার প্রতি' রাধিকার অনুরাগের সঞ্চার হইল। এই অনুরাগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সহস্র ঝড় ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া শেষে কি বিরাট মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই চণ্ডীদাস অতি সুন্দর ভাবে, সহজ ভাষায় দেখাইয়াছেন। প্রথমেই আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মাঝে বেশ একটা পার্থক্য দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ—তাহা গোড়ায়ই রূপের প্রাণ উন্মাদন কারিণী শক্তির প্রভাবে জন্মে নাই। এবং এই স্থানেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে প্রভেদ। চণ্ডীদাসের রাধা শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ শুনিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—তাঁহার প্রেম বাহ্য সৌন্দর্য্য ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্খায় অপেক্ষা করিয়া ছিল না। রূপের আকর্ষণের মধ্যে কি যেন একটা ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে যাহা গুণের আকর্ষণের মধ্যে নাই। কিন্তু গুণের সঙ্গে যদি রূপের সংমিশ্রণ থাকে তবে তাহা মণিকাঞ্চণ সংযোগের মত সুন্দর দেখায়। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদ্যপি জগত সুখের আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥"

প্রথম দর্শনের পর রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন সত্য—কিন্তু আমরা সে অস্থিরতার মধ্যেও একটা শান্তি দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে প্রেমের পূর্ণ পরিণতির সমস্ত চিহ্নই সে অস্থিরতার মধ্যে আমরা উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাই।

শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন বলিয়া রাধা অনেক তিরস্কার, গঞ্জনা খাইয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তিনি এ কথা আর কাহাকেও বলিতে পারিলেন না। তিনি জানেন—সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিবেন

যে প্রেম তাঁহার হৃদয়ের প্রতি শোণিত বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত লাঞ্ছনা তিরস্কার যদি এক সঙ্গে তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবুও তাঁহার প্রেম টলিবে না! কিন্তু এ অবস্থায় প্রিয়তমের নিকট হইতে একটু সহানুভূতি পাইবার জন্য প্রাণ স্বতঃই ব্যাকুল হয়। আজ সমস্ত বিশ্ব জগৎ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; যে এক কোণে তিনি অতি কষ্টে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পাপ পৃথিবী তাহাও গ্রাস করিতে উদ্যত! অমানিশার এ ঘোর অন্ধকারে তিনি যে একটি মাত্র দীপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার পথ চিনিয়া লইবেন, সে দীপটিও তাঁহার কিনা তাহা তাঁহার জানা নাই! দূর হইতে একটি দীপ দেখিতে পাইয়া বিনা বিচারে মনে মনে তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু এ রকম অবস্থায় একবার না বলিয়া থাকা যায় না—

"তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥"

শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বুঝেন। কিন্তু তবুও তাঁহাকে বুঝাইবার কি ব্যাকুল প্রয়াস! তিনি শুধু একটিবার শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শুনিতে চান, এ পৃথিবীতে তাঁহার দুঃখে 'আহা' বলিবার একটি লোকও আছে! শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তাঁহার সমস্ত দুঃখের বোঝা লইতে বলেন না—তিনি চান শুধু একবিন্দু সহানুভূতি!

বিদ্যাপতির রাধার সখীগণ একদিন তাঁহাকে বলিতেছেন—

"বেলি অবসান কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে॥"

এ বর্ণনা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি—বিদ্যাপতির রাধা শ্রীকৃষ্ণকে রূপ ফাঁদে ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। রূপের আকর্ষণে কি বিশ্বজয় করা

যায়? রূপ শুধু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে চিত্তমালিন্য জনক লালসা জন্মাইয়া দেয়। তাহা হৃদয় জয় করিতে পারে না। চণ্ডীদাসের রাধার কোনদিন আমরা এ চেষ্টা দেখিতে পাইনা—তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া, পাইয়াই সুখীও অত্মহারা। শ্রীকৃষ্ণ আবার ঠিক তাঁহাকে সেই পরিমাণে ভালবাসিতেছেন কিনা তাহা তাঁহার দেখাইবার অবসর নাই।

সাধকের মধ্যাবস্থাটা বড়ই বিপদ সঙ্কুল। এই অবস্থা পার হওয়া বড়ই শক্ত। এই অবস্থা হইতে যে সাধক একবার উত্তীর্ণ হইতে পারেন—যিনি এই অবস্থায় আসিয়া সম্মুখস্থ ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল বন-রাজি দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ না হইয়া তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন—তিনি শীঘ্রই তাঁহার প্রার্থিত বস্তুকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যান। মধ্যাবস্থায় আমরা চণ্ডীদাসের রাধার মুখ হইতে শুনিতে পাই—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥"

আবার শেষ অবস্থায় যে অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন—তাহারই উত্তেজনায় না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই—

"সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥"

চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমকেই জগৎ বলিয়া মনে করেন—তাই সে প্রেমের তুলনা হয় না। সে প্রেম অনন্তনীলাকাশের মত বাড়িতে বাড়িতেই গিয়াছে—কোথাও তাহার সীমা পাওয়া যায় না। যাহা বদ্ধ, তাহাই অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ যাহা তাহা আমাদিগকে সুখ ও শান্তি দিতে পারে না। আমরা চাই অনন্তের আস্বাদন—কিন্তু সসীম বস্তুর মধ্যে কি করিয়া অনন্তের আস্বাদন পাওয়া যায়? প্রথমে আমাদিগকে

সসীম জগতের বাহিরে যাইতে হইবে—তারপর যখন আমরা একবার তাঁহাকে লাভ করিব—তখন আমরা প্রতি অণুকণার মাঝে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাইব। চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম বাড়িতে বাড়িতেই চলিয়াছে—সমস্ত জগৎ ছাপিয়া ফেলিল—তবুও তাহার নিবৃত্তি হইলনা!—

নিতই নূতন পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণাম নাহি থায়।"

এ প্রেমের তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না! তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—কবি! "তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে!"

বিদ্যাপতির বর্ণনায় ভাষার লালিত্য আছে, অলঙ্কারের ঝঙ্কার আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের সে প্রাণ মাতানো ভাব নাই। তাঁহার রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে যে রকম অস্থির হইয়া পড়েন, তাহাতে আমরা প্রাণে দুঃখ অনুভব করি বটে—কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার বিচ্ছেদেও সহ্য গুণ দেখিয়া, মিলনেও প্রাণে অশান্তি ও ভয় দেখিতে পাইয়া আমরা এককালে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া যাই, আমাদের মনে হয় তাহা এ জগতের জিনিষ নহে তাহাতে পৃথিবীর পঙ্কিলতা নাই, সে প্রেম নিজের ঔজ্জ্বল্যে নিজে উজ্জ্বল। চণ্ডীদাসের রাধা—'নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি' মিলনেও তাঁহার সুখ নাই—ভয়ের কোনই কারণ নাই, তবুও কি যেন একটা আশঙ্কা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়! দেহের মিলনে তাঁহাকে সুখী হইতে দেখি নাই। যাঁহারা অন্তরের সুখ চান, তাঁহারা বাহিরের সুখে সুখী হইতে পারেন না। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যই অন্তরে দেখিতে চান, তাই তাঁহার ভয় শ্রীকৃষ্ণের দেহের বিচ্ছেদে তিনি যদি তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে না পান! এবং সেই জন্যই—

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"।

বিদ্যাপতির রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়েন, মিলনে

আনন্দে বিভোরা হইয়া থাকেন। বিদ্যাপতির প্রেম শুধু প্রিয়তমের সঙ্গ সুখের জন্য—চণ্ডীদাসের প্রেম তাহা হইতে অত্যন্ত গভীর, তাহা আমাদের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে। বিদ্যাপতির রাধার মুখে তাই মিলনে আমরা শুনিতে পাই—

"পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।"

এই স্থানে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে আকাশ পাতাল তফাৎ।

চণ্ডীদাসের প্রেম বড়ই কঠিন, দুঃখ বিনা এ প্রেম লভ্য নয়। নিজের সুখের জন্য যাহারা প্রেম করিতে চাহে তাহারা চণ্ডীদাসের এ বিশুদ্ধ প্রেম কোন কালে লাভ করিতে পারে না। চণ্ডীদাসের মতে দুঃখের মধ্য দিয়া সুখকে লাভ করিতে হইবে—দুঃখের পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া প্রেমের মধ্য হইতে চন্দনের সৌরভ বাহির করিতে হইবে। তাই চণ্ডীদাস এক স্থানে বলিতেছেন—

"কহে চণ্ডীদাস,　শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া　যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি!"

আমরা দেখিতে পাই চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম কি রকম করিয়া সারা বিশ্ব ছাপিয়া ফেলিল। রাধা অতি কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের রূপের সাদৃশ্য দেখিলে, তাঁহার চিত্তের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাই তিনি একদিন সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥"

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। বাহিরে বাহিরে অনেক সময় ইচ্ছা

আর যাহাতে না আসে তাহাই করিব।' কিন্তু মন যে সর্ব্বদাই প্রিয়-তমের কথা শুনিবার জন্য লালায়িত—এ মনের গতি কে রোধ করিবে? তাই রাধা না শুনিতে চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী রাধার কাণে 'রাধা রাধা' বলিয়া বাজিয়া উঠে—রাধার সমস্ত হৃদয় পুলকে অবশ হইয়া পড়ে। এ অপরাধের জন্য অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীই রাধার নিকট দোষী!

মুহুর্ত্তের জন্যও যখন রাধা অন্তর দেশে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া পান নাই, অমনি রাধা ভয়ে বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন—যেন কে তাঁহার অমূল্যরত্ন চুরি করিয়া লইয়াছে! অমনি তিনি ক্ষোভে, দুঃখে বলিয়া উঠিয়াছেন যে আমার জীবন স্বর্ব্বস্বকে কাড়িয়া লইয়াছে—

"আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে।"

সমস্ত জগত খুঁজিয়া তিনি আর কোন অভিশাপ পাইলেন না!

অনেক সাধনার পর রাধা বিশ্বের প্রতি লতাপাতায়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রতি অণুকলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। সাধারণ লোকে তাঁহার এ প্রেম বুঝিতে পারে নাই—আজিও কেহ বুঝিতে পারে না। কলুষিত চিত্তে তাহারা জগতে নির্ম্মলতা, পবিত্রতা দেখিতে পায় না, নিজেদের মতই তাহারা জগতকে দেখে। এ জগতে প্রেমিকের স্থান নাই। এখানে শুধু পঙ্কিলতা, প্রেমের বেশে কামের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আগে তাঁহার গুরুজনেরা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে গঞ্জনা দিতেন—এখন তাঁহারা স্বকর্ণে রাধার মুখ হইতে অনবরতই শ্যাম নাম শুনিতে লাগিলেন, তারপর তাঁহার যে অবস্থা হইল তাহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তিনি সমস্তই নিরবে সহ্য করিয়াছেন। এই স্থানেই আমরা রাধার প্রেমের গভীরতা দেখিতে পাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রেম টলে নাই—তাহা চিরকাল একই ভাবে ভাস্বর মূর্ত্তিতে রাধার হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল।

"গুরুজন আগে   দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল   দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥"

এ উক্তি শুনিয়া বাস্তবিকই আমাদের চোখে জল আসে। রাধার প্রেমের পূর্ণ পরিণতি সম্পন্ন হইয়াছে—আর তিনি দেহের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়েন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা বলিয়াছিলেন—

"তোমরা যে বল শ্যাম   মধুপুরে যাইবেন,
কোন পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিড়িয়া যবে,   বাহির করিয়া দিব,
তবেত শ্যাম মধুপুরে যাবে?"

তাঁহার পূজার শেষ। সাধনার শেষ সর্ব্ব সমর্পনে। রাধা এতদিন তাঁহার নিজেরই ছিলেন। আজ এক পুণ্য মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার স্বর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণে অঞ্জলি দিলেন। যে মন্ত্রে তিনি অঞ্জলি দিয়াছিলেন—তাহা চিরকাল প্রতি প্রেমিকের হৃদয়ে স্বর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। অনেক দিনের পর বহু কষ্টে লব্ধ প্রার্থিতকে পাইয়া তিনি বলিলেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে,   জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে   আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া   একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম,   এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ   সুধাইতে নাই

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।"

কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাধার প্রেম আজ চরম সার্থকতা লাভ করিল ! রাধা আজ প্রিয়তমের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। আজ আর তাঁহার হৃদয়ে বিরহের অনল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে না—আজ তিনি বিশ্বময় প্রিয়তমকে দেখিতে শিখিয়াছেন, এক হৃদয় হইতে তাঁহার প্রেম আজ সারা বিশ্বের প্রতি অনুকণার মাঝে বন্যার স্রোতের মত উথলিয়া পড়িয়াছে তাঁহার ভাষা আজ বন্ধ, এ ভাবের কাছে ভাষা চির কালই মুক। ভাবে প্রাণ ভরা, মুখ হইতে শুধু বাহির হইল—

"বঁধু কি আর বলিব আমি !
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈয় তুমি।"

বহুদিন হইল চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এ গান গাহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজিও সে বীণা ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে !

যতবার আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি পড়ি, তত বারই আমাদের কাছে তাহারা নূতন বলিয়া বোধ হয়। পুরাণ হওয়া দূরের কথা, প্রত্যেক বারই যেন আরও মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া বোধ হয়। "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই, বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকে জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ।" বিদ্যাপতি কবি আর চণ্ডীদাস ভাবুক—বিদ্যাপতি রূপের

দেখাইয়াছেন। দুইই অতি সুন্দর—অতি উপাদেয়। বিদ্যাপতির লেখার মধ্যেও যথেষ্ট প্রেমের বিকাশ আছে। বিদ্যাপতি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা আর চণ্ডীদাস ভাবে মাতোয়ারা। তাই বিদ্যাপতি অপেক্ষা "সহজ ভাষার সহজ কবি" চণ্ডীদাসকেই আমাদের একটু বেশী ভাল লাগে।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার নন্দী।

প্রকাশ।

(তখন) শ্রান্ত তপন
গগন প্রান্তে
বিথারে স্বর্ণ শয়ন,
সন্ধ্যা ধূসর
মলিন আকাশে
বহিছে মন্দ পবন,
তরু পল্লব
মঞ্জরী লোল,
গুঞ্জরে অলিদল,
মৃদু কল্লোলে
উপলে উপলে
ঝরিছে নির্ঝর জল।
কাজল বরণ
শিলাখানি'পরে
ব'সে তারা পাশাপাশি
পরাণের কথা
পরকাশ তরে
ফুটিছে না ভাষা আসি।

সহসা তাদের
অধরে কপোলে
হয়ে গেল মিশামিশি
ধরণী মাঝারে
অমরা আসিল
মধুর মধুর নিশি।
এতদিন তারা
আছে কাছে কাছে
কেহত কহেনি কথা
(আজ) শুধু একবার
অধর পরশে
পরকাশ সবব্যথা।

শ্রীঅনুপমচন্দ্র রায়।

পানওয়ালী।

রাস্তার মোড়ে তার দোকান; শীতের রাত্রে কাপড় মুড়ি দিয়া তখন সে তন্দ্রাভরে ঢুলিতেছিল।

একজন যুবক আসিয়া পানের থালায় তাহার সম্মুখে একটী পয়সা ফেলিয়া দিল, সেই শব্দে রমণী জাগিয়া উঠিল। এক-টুকরা কাগজে চারিটি খিলি মুড়িয়া যুবকের হাতে দিবার সময় তাহার হাতটি একটু কাঁপিয়া উঠিল। যুবার চম্পক অঙ্গুলিতে সুন্দর আংটী প্রদীপের আলোতে জ্বলিতেছিল। এত সুন্দর হাত! পানওয়ালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—ক্রেতার স্থির-দৃষ্টি তাহারি উপর নিবদ্ধ। লাজভরে মাথা হেঁট করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে সে বসিয়া রহিল। যুবকের স্পর্শ তাহার শিরায় বিদ্যুত প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছিল।

যুবকও নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সে

ভাবিতেছিল পানওয়ালীর আঙুলের কথা। কি সুন্দর সে! পান সাজিতে সাজিতে হাতে দাগ পড়িয়াছে—কিন্তু তাহার মনে হইল যেন হাত দুটি তার আলতাপরা আর সেই সরলদৃষ্টি!—কাল কাল বড় বড় চোখদুটি কেমন সরস!

রাত্রে তার ভাল ঘুম হইলনা। শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিল—সে একটী পুকুরের তীরে দাঁড়াইয়া আছে আর অপর পাড়ে একটী রমনী। কেসে? ভাল করিয়া চেনা যাইতেছিলনা কিন্তু বুঝা গেল তার আকৃতিটা সেই পানওয়ালীরই মত। রমনী স্থির দৃষ্টিতে তাহারি দিকে চাহিয়াছিল; সে কি করিবে—বুঝিতে পারিলনা। ভাবিল সাঁতার কাটিয়া ঐ পারে যাইবে—এমন সময় কে সহসা পিছন দিক হইতে টানিল—হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত আঘাতের মধ্যে সে জাগিয়া উঠিল।

পানওয়ালী স্বপ্ন দেখিল যেন প্রকাণ্ড এক নদী দিয়া ছোট্ট একটী নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে,—নৌকায় আর কেহ নাই—সে নিতান্ত একা;—স্রোতমুখে তরী ভাসিয়া চলিয়াছে কখন যে অতলে তলাইয়া যাইবে সেই ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করিতেছিল। তীরে যাইবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—উৎসুক নেত্রে তীরের পানে চাহিয়া দেখিল একটী মনুষ্যমূর্ত্তি তাহারি দিকে তাকাইয়া আছে। মুখে কথা সড়িল না কিন্তু এমনি ব্যগ্রভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল যে মনে হইল—তীরবর্ত্তী ব্যক্তি তাহার নীরব প্রার্থনা শুনিতে পাইয়াছে;—পুলকশিহরণে তাহার শরীরে একটা হিল্লোল খেলিয়া গেল;—মানুষ নাই—সম্মুখে অনন্তবালুকাময় প্রকাণ্ড মরুভূমি—অন্ধকারে ধূ ধূ করিতেছে। কুটিরবাসিনী ঘামিয়া জাগিয়া উঠিল।

পরদিন নিত্যকার মত বিকিকিনিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে—রাজপথে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল—নানারূপ সুন্দর পোষাক পরিয়া নরনারী সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গেল। অনেকরাত্রে লোকচলাচল যখন বিরল হইয়া আসিয়াছে—তখন হঠাৎ সেই যুবক

ভাবে ক্রেতার দিকে একবার চাহিয়া পানের মোড়ক তাহার হাতে তুলিয়া দিল। উভয়ের তড়িতপ্রবাহ রক্তপ্রবাহ চঞ্চল করিয়া তুলিল। যুবক মুখে দিয়া দেখিল—খিলি অতি চমৎকার, এমন পান ত সে জন্মে আর খায় নাই। রসে সৌরভে তাহার দেহ মন ভরিয়া উঠিল।

হোটেলের পান খাইয়া আর তাহার তৃপ্তি হইত না। সে ভৃত্যকে এই পানওয়ালীর সন্ধান বলিয়া দিতে যাইতেছিল – হঠাৎ থামিয়া গেল —যেন সে কি এক মহাগোপনকে প্রকাশ করিতে যাইতেছিল। ভাবিল—সে আর কতদূর— একটু হাঁটিলে নিজেইত সেখানে যাওয়া যায়। রওনা হইয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিল—দিনের তীব্র আলোকে সেখানে সে কোন মতেই যাইতে পারিল না।

রমণী সমস্ত দিন রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত নিতান্তই কলের পুতুলের মত। তাহাতে তার না ছিল আনন্দ—না ছিল উৎসাহ যেন সে কাহার অপেক্ষায় প্রহরের পর প্রহর গণিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। নিশার আঁধার যখন ধীরে ধীরে সংসারে নামিয়া আসিত –তখন তাহার হৃদয়মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। সমস্তদিনের পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তের আনন্দমিলনে সার্থক করিয়া পান-ওয়ালী দোকানপাট গুছাইয়া বাড়ী ফিরিত। তাম্বুলির সমস্ত অন্তর দীর্ঘদিবসব্যাপী ধৈর্য্যের ভিতর এক মিলন মুহূর্ত্তের আশায় আনন্দ বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিত। আর যুবক!—সে সমস্তদিন মনের বেদনায় গুমরিয়া মরিত; তাহার প্রধান দুঃখ অপেক্ষা করিবার তাহার কেহ ছিল না; আপনার অপেক্ষায় আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত কিন্তু কতদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইত।

যুবক ভাবিল—যে আমাকে প্রতিদিন এমন আতর গোলাপ সিঞ্চিত তাম্বুল—তার প্রাণের রসে রসাল করিয়া দান করিতেছে, —তাহাকে দিবার মত আমার কি আছে?—কিছুইত নাই!— তবু যা' পারি—তা আমি দিব। চিত্রকর আমি একখানি ছবি তাহাকে উপহার দিব।

যুবক দিন ভরিয়া ছবি আঁকে ;—তন্ময় হইয়া ভাবে আর তুলির আঁকে পটের উপর তার মানস সুন্দরীর এক একটী রেখা টানে। তাকে ত সে কোন দিনই ভাল করিয়া দেখে নাই, তবু আঁকিতে তার কষ্ট হয় না। যেটুকু দেখিয়াছে—তাহার উপর হৃদয়ের আলো ফেলিয়া তাহাকে রঙিন করিয়া তোলে। তাহার আবেগ চঞ্চলতা এখন সুমৌন ধ্যানের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে ;—তৃপ্তির শান্তিতে আকাঙ্ক্ষার উদ্দামতা ডুবিয়া মরিয়াছে। রাত্রে যখন সমস্ত পৃথিবীটা ঘুমাইয়া পড়ে-তখন সে পান আনিতে যায় ;—গিয়া দেখে পানওয়ালী চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। তারি অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া দুইটী বিনিদ্র প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। আনন্দপুলকে তাহার হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠে। তাহাদের সঙ্কোচ তখন পরিচয়ের মুক্তিতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দিবসের মধুর পরিশ্রম নৈশ আলাপের মধুর নেশায় আর তাম্বুলের সুগন্ধী রসে রঞ্জিত হইয়া তাহার জীবনের চারিদিকে এক বিচিত্র রাগিণী বাজাইয়া তুলিয়াছিল।

অনেকদিনে চিত্রটী শেষ হইল। আপনার কৃতিত্বে আপনি মুগ্ধ হইয়া সে মনে মনে বলিল—'সাবাস শিল্পি!—এত দিনে তোর শিক্ষা সার্থক, প্রশংসা তার নিপুণতার নয়—প্রশংসা তার চিত্রের। এত সুন্দর সেই মূর্ত্তি যে তারি সৌন্দর্য্যের নেশায় মুগ্ধ হইতে হয়,—শিল্পির কথা ভাবিবার আর অবসর থাকে না। এত সুন্দর সে কেমন করিয়া আঁকিল? তুলিতে কখনো এমন ছবি আঁকা যায় না। এ ছবি আঁকিয়াছে তার হৃদয়। রমণীর বদনে যে আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে—অনুরাগের অঞ্জন ব্যতীত তেমন লালিমা নিতান্তই সুদুর্লভ।

চিত্রকর মহা বিপদে পড়িয়া গেল। কি বলিয়া সে চিত্র দিতে যাইবে?—ভাবে,—ভাবিয়া ভাবিয়া উপায় ঠিক করিতে পারে না। তারপর আরেক বিপদ! চিত্রটী না থাকিলে তাহার দিন কাটিবে কেমন করিয়া?—এতদিন যাহাকে ঘিরিয়া তাহার দিনগুলি সার্থক হইয়া উঠিতেছিল—তাহার অভাবে সে কেমন করিয়া কি করিবে?

পড়ে। তার শুধু মনে হয়—সে মহা স্বার্থপর, অতি নির্লজ্জ। পান কিনিতে তাহার পা' চলিয়া চলেনা। রমণী তাহাকে কি মনে করে? সে দিনের পর দিন এমন ভাবে অমৃত সম্ভারে তাহাকে অমর করিয়া তুলিতেছে—আর সে এই অনুগ্রহের যোগ্যতাটুকুও দেখাইতে পারিল না।

পানওয়ালী আর কিছু ভাবে না। রাত্রির অপেক্ষায় তার দিন কাটে,—পানের খিলিতে তার সমস্ত যত্ন ভালবাসা ঢালে। তার অন্য কোন শক্তি নাই—অন্য কোন কাজ নাই, তাহার যাহা কিছু সব ঐ পানের খিলিতে পর্য্যবসিত। তাহার বেদনাতুর হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দন—তার নারীহৃদয়ের সমস্ত আবেগ—তার অনন্ত অব্যক্ত কামনা খিলির পরতে পরতে মাখা থাকে। বনের ফুল সে—গোপনে ফুটিয়াছিল গোপনেই ঝরিয়া যাইত। যদি কোন পথিকের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ও তার দিকে আকৃষ্ট হয়; তাহাতে শুধু তার জীবনের সার্থকতা নয়—উহা তাহার নিকট অযাচিত সুদুর্লভ দান।

কিন্তু তাহার ভিতর তখন এমন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে আপনাকে আপনি আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার হৃদয় পলকে পলকে দুলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ গুজিয়া পান সাজা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না; শুধু সেই তরঙ্গের কাহিনী পানের খিলিতে রসে গন্ধে এক শব্দহীন প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা থাকিত।

কল্পনায় জল্পনায় দিন ডুবিয়া রাত্রি হইল,—অপেক্ষায় অপেক্ষায় পূবের তারা পশ্চিমে গেল,—তবু যুবক সে দিন আসিল না। পানওয়ালীর চোখে ঘুম নাই,—সে পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশাক্লিষ্ট হৃদয়ে আকাশের দিকে চাহে। নীল আকাশ দেখিয়া ক্লান্ত চক্ষু শান্ত হয়, তখন আবার পথের পানে চাহিয়া থাকে।—ওগো আর কতকাল সে এমন ভাবে চাহিয়া থাকিবে? দীর্ঘ পথ কতকাল এমন পথিকহীন রহিবে?—কতকাল তার অপেক্ষা করিতে হইবে?—শুকতারা যখন অস্তরেখার কাছে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল তখন অভাগিনী

পরদিন দুপুর বেলা পবনদেব রাস্তার ধুলি লইয়া অগ্নিবাণ হানিতে ছিল; পানওয়ালীর অন্তর বাহির তখন এক অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় যুবক পাগলের মত হঠাৎ কোথা হইতে ছুটীয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়াই পানওয়ালীর বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না, সাজা পান হাতে তুলিয়া দিল; যুবক শুধু বলিয়া গেল—কাল রাত্রে তার পিতা আসিয়াছেন—তাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যা সময় যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে পান লইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কোন কথা হইল না। যুবতী তাহাকে কত কথা বলিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না বলিয়া আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়াও শান্তি পাইতেছিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আগামী কল্য যেমন করিয়াই হউক মুখ ফুটিয়া কথা বলিবে। কিন্তু সে যদি আজই বাড়ী চলিয়া যায়। যাইবার আগে একবার বলিয়া যাইবে না কি?

অনেকরাত্রে রমণী কুটীরে ফিরিল। মৃদু দীপালোকে সে ঘরে বসিয়া কি করিতেছিল—এমন সময় দরজায় আঘাত পড়িল। পান-ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল—কে?—কোনও উত্তর আসিল না। ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দেখিল—সেই যুবক!! কিছুক্ষণ উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তার পর যুবতী চিত্রকরকে ঘরে বসাইল। যুবক অনেক চেষ্টা করিয়া তবে মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিল। কিন্তু একবার যখন বলিতে আরম্ভ করিল—তখন আর কিছুতেই থামিল না,—সকল কথা নিঃসঙ্কোচে অনর্গল বলিয়া গেল। সে বলিল এবারে তার বিবাহ হইবে—সেই জন্য তাহার পিতা তাহাকে নিতে আসিয়াছেন। আগামী কল্যই তাহাদিগকে যাইতে হইবে। কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ী যাইবে না, বিবাহে তার সম্পূর্ণ অমত। পানওয়ালী বুঝিল—সে বাসা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল তার পর তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইল। রমণীর সানুনয় উপদেশের নিকট যুবকের

কোনও যুক্তি টিকিল না অবশেষে বিবাহ করিতে সে সম্মত হইল। ছবি খানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল—তাহা দেখিয়া যুবতী বলিল—আমার ছবি দিয়া আমি কি করিব? যুবক বলিল—তবে তোমায় আরেকখানি ছবি দিব এখানি আমার কাছেই থাক্। রমণী কতক্ষণ কি ভাবিল—তার পর বলিল না—এ আমিই নিব,—আমার ওতে দরকার আছে।" দুজনে আরও অনেক কথা হইল, যাইবার সময় যুবক পানওয়ালীর হাত ধরিয়া বলিল "তবে আসি"—যুবকের তপ্ত অশ্রু রমণীর হাতে গড়াইয়া পড়িল। সে চাহিয়া দেখিল যুবক কাঁদিতেছে ; রমণী কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। যুবক হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যুবতী কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যুবকের স্পর্শ তাহার স্নায়ুগুলি অবশ করিয়া দিয়াছিল। কিছুক্ষণ পর চাহিয়া দেখিল—যুবক সেখানে নাই তখন সহসা তাহার সমস্ত রুদ্ধ অশ্রু ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল,—রমণী ধূলিশয্যায় বিস্রস্ত বসনে লুটাইয়া পড়িল।

* * * * * *

অনেকদিন পর যুবক বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল,—তাহার হৃদয় তখন তুমুল সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গিয়া দেখিল—সেখানে পানের কোনও দোকান নাই,—কুটীরে গিয়া দেখিল—শূন্য কুটীর অন্ধকার। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—পানওয়ালী কিছুদিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। যুবক উদ্দেশ্যহীনের মত পথের জনপ্রবাহের সাথে একদিকে ভাসিয়া গেল।

গান।

পিলু—খেম্‌টা

মম মানস-কুঞ্জে আজি কাহার বংশী বাজে,
কে গো নীরবে ডাকিছে মোরে কোন জগত কাজে।
মম সকল শূণ্য করেছে পূর্ণ
তাহার চরণ ভাতি
ধন্য মম দৈন্য আজি
লভিয়া তাহারে সাথী,—
আমার মাঝে তাহার লাগি
নূতন জগত উঠেছে-জাগি
ঝঙ্কারে নব উৎসব বীণা
নীরবে আমার মাঝে।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

পাটল।

বীজ নির্ণয়।

কৃষি কার্য্যে বীজ নির্ণয় একটী অতি আবশ্যকীয় বিষয়। কৃষক মাত্রেরই ইহাতে ভাল রকম অভিজ্ঞতা থাকা দরকার বীজ ভাল না হইলে গাছ ও যে ভাল হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। যৎ বীর্য্য স্তৎ পরাক্রম কথাটা উদ্ভিদ জগতেও ষোল আনা খাটে। পিতা মাতা রুগ্ন বা দুর্ব্বল হইলে সন্তান যেমন প্রায়ই বলবান হইতে দেখা যায় না বীজ সম্বন্ধে ও ঠিক সেইরূপ। বীজগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় বা কীটদষ্ট হইলে প্রায়ই তাহা অঙ্কুরিত হয় না এবং অঙ্কুরিত হইলেও গাছটি নিতান্ত দুর্ব্বল ও তেজোহীন হয় সুতরাং তাহাতে মনোগত ফল পাওয়া অসম্ভব। এমন কি দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশু গুলি যেমন যথেষ্ট যত্ন না পাইলে বা সামান্য অনিয়ম ঘটিলেই নিতান্ত কাতর হইয়া

অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় ; নিকৃষ্ট বীজের তেজোহীন গাছগুলি ও ঠিক সেইরূপ সামান্য যত্নের অভাবে ও আবহাওয়ার সামান্য ব্যতিক্রমেই মরিয়া যায়। কাজে কাজেই জমি প্রস্তুতের পূর্ব্বেই ভালবীজের সন্ধান করিয়া রাখা উচিত। পটলের বীজ হইতে বীজ হয় না মূল হইতে বীজ হয়। পটল লতার গুড়ির মাটীখুড়িলে মিঠা আলুর মত মূল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুলি হইতেই বীজ হয়। পটলের লতা প্রতিবৎসরই মরিয়া যায়, কিন্তু বিশেষ কোনও উপদ্রব না ঘটিলে মূল গুলি নষ্ট হয় না। পর বৎসর প্রথম বৃষ্টিপাতের পরই ঐ মূল ফুটিয়া গের বা চারা বাহির হয়। সেই চারাগুলিকে যত্ন করিয়া লতাইয়া যাইবার মত ঝাপ বা বেড়া বাঁধিয়া দিলে কতক ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে ক্ষেত্রে মূলের সংখ্যা বেশী থাকায় লতাও এত বেশী হয় যে সকলগুলি একত্র জড়া বাঁধিয়া জঙ্গল হইয়া যায় ; কাজে কাজেই উপযুক্ত রৌদ্র, হাওয়া ও স্থানের অভাবে কোনওটাই ভাল ফল প্রদান করিতে পারে না। আর এক কথা এই যে পটলের লতা সকলগুলি ফলবান হয় না। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ জাতিভেদ আছে। পুরুষ জাতীয় লতাগুলি দেখিতে স্ত্রী জাতীয় গুলিরই মত কিন্তু তাহাদের কেবল ফুল হয়। সেই ফুল হইতে কোনও ফল হয় না। ফুলগুলি ফুটিয়াই ঝরিয়া যায়। আমরা যখন ফলের জন্যই চাষ করিব তখন যাহাতে বেশী ফল পাওয়া যায় সেই আমাদের কথা। গাছ গাছড়া বা লতা পোষিয়া পুণ্য সঞ্চয় করার মতলব আমাদের নাই সুতরাং পুরুষ জাতিয় লতাগুলিকে বাগানে স্থান না দিয়া, তাহাদের স্থানে স্ত্রীজাতীয় গুলিকে পোষণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। প্রতি বৎসর চষিয়া মূলগুলি তুলিয়া না ফেলিলে এই দোষ হয় যে পর বৎসর পুরুষ জাতীয় লতাগুলি অনর্থক বাগানে বৃদ্ধি পাইয়া জমির স্থান দখল করিয়া বসে। অবশ্য তুলিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া মূল রোপন করিলেও এইগুলি হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া যায় না বটে তবে সংখ্যায় অনেকটা কম হয়। যখন পটল ধরিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই কোনটা

রাখা কর্ত্তব্য এবং পর বৎসর বীজ সংগ্রহ করিবার সময় সেই পুরুষ জাতীয় গুলিকে সম্যক্ পরিত্যাগ করা উচিত। অন্য লতাগুলির কোনও অনিষ্ট না করিয়া সেই বৎসরই এই গুলিকে তুলিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্ত্রী জাতীয় লতাগুলি সচ্ছন্দে তাহাদের স্থান দখল করিয়া পুষ্টি লাভ করতে পারে।

বীজের জন্য খুব মোটা পুরাতন মূল কখনও সংগ্রহ করিবে না। অনেকে মনে করিতে পারেন মূলগুলি যতই পুরাতন ও মোটা সোটা হইবে, গাছও তদনুরূপ তেজস্কর হইবে। তাহা ঠিক নয়। সকলেই জানেন যে অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী ও বলিষ্ঠা রমণীগণ প্রায়ই নিঃসন্তানা হইয়া থাকে। ইহাই প্রাণী জগতের সাধারণ নিয়ম। উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে ও এই নিয়ম কতকটা খাটে। দুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল রোপন করিলে গাছ অত্যন্ত তেজস্কর হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহাতে কোনও ফল ধরে না। পটলের জমি প্রতি বৎসর চষিয়া আবার নূতন করিয়া বাছা বাছা মূল রোপনকরার ইহাও একটী অন্যতম উদ্দেশ্য তাহাতে নিজের পছন্দ মত মূল রোপণ করা চলে। মূল সংগ্রহ করার সময় যেগুলি ছোট অথচ তেজস্কর এবং যাহাতে কোন প্রকার পোকা ধরে নাই এমন মূল বাছিয়া লইতে হয়। অন্যগুলি বেশ ভাল করিয়া ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিবে। যখন সকলগুলি গাছই ফল দিতে আরম্ভ করে তখন কোন কোন গাছ উৎকৃষ্ট জাতীয় ফল অধিক পরিমাণে দিতেছে তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হয় এবং পর বৎসর কেবল সেই চিহ্নিত গাছগুলির মূল হইতেই বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

জমির তদ্‌বির।

কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই রোপণের কাজ সমাধা করিয়া ও বাদা তৈয়ার করিয়া জমির চতুর্দ্দিকে বেশ ভাল করিয়া বেড়া দিয়া ফেলিবে। যেন গরু ছাগল ইত্যাদিতে জমি মাড়াইয়া অপচয় না

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পৌষ মাঘ মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হইলে এবং ক্ষেত্র বিশেষ টানিয়া গিয়াছে মনে হইলে এই সময় একবার জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অতিরিক্ত জল দিলে নূতন কোমল গেড়গুলি পঁচিয়া যাইতে পারে। আর নৈসর্গিক কারণে বৃষ্টি হইলে যাহাতে জমিতে জল দাঁড়াইতে না পারে এমন ভাবে সমস্ত পয়ঃনালি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে পটল গাছের গোড়ায় জল বসিলে তাহার মূল পঁচিয়া যায়। যখন নূতন চারা অনুমান এক ফুট দেড় ফুট উচ্চ হইবে তখন কাস্তে বা কুদালি লইয়া তাহাদের গোড়ার জঙ্গল আস্তে আস্তে পরিষ্কার করিয়া দিবে। বেশী নাড়াচাড়া পড়িলে কোমল সরু শিকড়গুলি ছিঁড়িয়া বা লতার কোমল অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গাছের অনিষ্ট হইতে পারে। তখন যাহাতে গাছের গোড়ায় প্রখর রৌদ্র না লাগিতে পারে তজ্জন্য বাদায় নূতন করিয়া কিছু খড় পাতা দিয়া দেওয়া ভাল। এবং চারাগুলি লতাইতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের পাশে পাশে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুতিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে ঐগুলি ধরিয়া গাছ লতাইয়া উপরদিকে উঠিতে পারে তদবিষয়ে যথা সম্ভব সাহায্য করা দরকার। তৎপরে লাইনে একটী বেড়া বা ঝাপ বাঁধিয়া দিবে, গাছ আপনা হইতে ঐ ঝাপে লতাইতে আরম্ভ করিলেই গৃহস্থ ফলের অনেকটা আশা করিতে পারে। তখন গাছের জীবন সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এর পর আর সারাদিন পটল ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিয়া গাছের তদ্বির করিতে হয় না—কেবল মাঝে মাঝে হাল্কা কুদালি দ্বারা কোপাইয়া আগাছা গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়; এবং যাহাতে মাটী সরস থাকে তজ্জন্য কয়েক দিন পর পর কিছু কিছু জল ছিটাইয়া দিতে হয়। কিন্তু মাটী সরস আছে বিবেচিত হইলে জল ছিটানের কোনও দরকার করে না। যদি প্রত্যেক লাইনে ঝাপ বাঁধিয়া দিবার সুবিধা না থাকে বা অধিক খরচ পরে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে গাছের এলোমেলো ডালপালা ও খড় কুটা ছড়াইয়া দিলেও তাহা অবলম্বনে গাছ লতাইয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে

একটা অসুবিধা এই হয় যে সমস্ত লতা একত্র জড়াজড়ি হইয়া যায় তাহাতে পরে ক্ষেত্রের তদ্‌বির অর্থাৎ জল ছিটান জঙ্গল পরিষ্কার করা ও গোড়ায় মাটি কুপাইয়া হালকা করিয়া দেওয়ায় অসুবিধা হয় এবং লতাগুলি মাটির সঙ্গে লাগিয়া থাকায় বৃষ্টি হইলে পঁচিয়া যাইতে পারে।

তিন চারি বৎসরের বেশী এক জমিতে পটল ভাল জন্মে না। তখন একবার সমস্ত মুল তুলিয়া জমি পরিষ্কার করতঃ তাহাতে অন্য একটী নূতন ফসলের আবাদ করা ভাল তাহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ চাষকে পাল্টা চাষ কহে। পাল্টা চাষের গুণ অনেক। এক জমিতে অনেকদিন ধরিয়া একই ফসলের আবাদ হইতে থাকিলে তাহাতে ঐ ফসলের আহারীয় দ্রব্যের অভাব পড়িয়া যায় যদিও প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ সার দিলে ভূমির অনুর্ব্বরতা ততটা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বটে কিন্তু তাহাতে গৃহস্থের ক্ষতি হয়। কারণ মানুষের বা পশু পক্ষীর ন্যায় উদ্‌ভিদেরও জাতিভেদে খাদ্য ভেদ আছে। সাধারণতঃ সারের মধ্যে উদ্‌ভিদের যে সমস্ত খাদ্যোপযোগী জিনিষ আছে তাহার সকল গুলি সকল উদ্‌ভিদের দরকার হয় না। তারপর এক জাতীয় উদ্‌ভিদে কোনও একটা জিনিষ যে পরিমাণ খায়, তাহা অন্য জাতীয় উদ্‌ভিদ খায় না, এমন কি অনেক সময় এই পরিমাণের ন্যূনাধিক্যে উদ্‌ভিদের অনিষ্ট ও হইয়া থাকে মনুষ্য জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অবশ্যই ইহা অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজে কাজেই একই ভূমিতে বরাবর একই ফসলের আবাদ হইতে থাকিলে, একদিকে যেমন তাহাতে সেই ফসলের আহারীয় দ্রব্যের অভাব পড়িয়া যায় পক্ষান্তরে সারের যে সকল অংশ সেই উদ্‌ভিদের দরকারে আসে নাই তাহার পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে সুতরাং এক জমিতে এক ফসল বেশী দিন আবাদ না করিয়া পাল্টা চাষ করিলে সারের সকল অংশই উদ্‌ভিদের কাজে লাগিতে পারে। বাংলা দেশে

উৎকৃষ্ট হয় না। যাহার উপরের খোসা কোমল ও পাতলা এবং বীচি ছোট সেই গুলিই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য বড় হওয়াটা একটা বিশেষ গুণের অন্তর্গত। তাহা ছাড়া মিষ্টতা এবং সহজে সিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আছে, সেই গুলি প্রায়ই জমিণের মাটীর প্রকৃতি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। দেখা যায় যে কোনও রকম ছায়ায় বা আওতায় খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় মূল রোপণ করিলেও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় না। ছায়ার পটল প্রায়ই পান্‌সে কখনও কখনও বা তিক্ত আস্বাদ বিশিষ্ট হয় এবং সহজে সিদ্ধ হয় না কাজল এবং পাটনাই পটলই তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ধনি এবং মাকড়া পটলও উৎকৃষ্ট। এইগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ভাল জাতীয় পটল আছে কিন্তু তাহাদের তেমন কোনও নামাকরণ হয় নাই। মানুষ যেমন একদেশ হইতে অন্য দেশে গিয়া অনেক দিন ভিন্নজাতীয় আবহাওয়ায় বসবাস হেতু ক্রমে ক্রমে সেই দেশীয় হাবভাব ও চালচলন অনুকরণ করতঃ একটা নূতন জাতের সৃষ্টি করে, উদ্‌ভিদ্‌ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। নূতন জায়গায় আসিয়া নূতন জল বায়ুর দরুণ ক্রমে ক্রমে এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে এগুলিকে আর পূর্ব্বের গুলির এক জাতীয় বলিয়াই বোধ হয় না। এ রকম ভাবে এখন অনেক জাতীয় পটলের সৃষ্টি হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে কে জানে।

পটলের ফুল হইতে জালি জালাইবারপর আটদশ দিনের মধ্যেই খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ধান সরিষা তিল বা আম জাম প্রভৃতির মত পটলের ফুল বা ফল একবারে হয় না। এক গাছেই প্রতিদিনই ফুল ফুটে পুরাতন ফুল হইতে জালি হয় এবং জালি বড় হইয়া পাকিতে থাকে। এইরূপে ফাল্গুন চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত পটল জন্মে প্রতিদিন জমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাওয়ার উপযুক্ত পটলগুলি পাড়িয়া ফেলিতে হয়। পটল পাকিয়া গেলে কেবল যে আস্বাদ কম হয় তাহা নহে কতকটা অপাচ্যও

পটল চাষে লাভ ক্ষতি।

হিসাব করিয়া দেখাগিয়াছে পটলের চাষে জমি তৈয়ার করা অবধি বেড়া দেওয়া ও ফল তুলা পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত কানিপ্রতি পঁচিশ টাকার বেশী খরচ পড়ে না। অবশ্য স্থান বিশেষে মজুর ও হালের মূল্যের ন্যূনাধিক্য বশতঃ খরচ ও কিছু কম বেশী হইতে পারে। উৎকৃষ্ট জাতীয় মূল রোপণ করিলে এবং কোনও প্রকার দৈবদুর্ব্বিপাকে না পাইলে প্রতি কাণিতে সচরাচর ৫০ হইতে ৭০ মন পটল পাওয়া যায়। কোনও ভাল জমিতে ১০০।১২৫ মন পর্য্যন্ত পাইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রতি মন পটলের মূল্য গড়ে দুই টাকা হিসাব ধরিলে ন্যূন ফলের৭৫৲ টাকা লাভ থাকার আশা করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ের জন্য যাহারা চাষ করিবে, তাহাদের উচিত কয়েক কাণি জমি এক সঙ্গে চাষ করা, তাহাতে অনেক বিষয়ে খরচের লাঘব হইয়া থাকে। পটল ক্ষেত্রে পটলের কোনও প্রকার অনিষ্ট না করিয়াই আরও কয়েকটী লাভবান ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পটল গাছ পাঁচ ছয় হাত অন্তর লাইন বা কেইল করিয়া রোপণ করিতে হয়, এবং প্রত্যেক লাইনে একএকটা ঝাপ বা বেড়া দিয়া দুই দিক হইতে তাহাতে লতা তুলিয়া দিতে হয়। মাঝে যে স্থান টুকু পড়িয়া থাকে তাহাতে যে সকল ফসলের গাছ বেশী বড় হয় না এবং আশ্বিনের পূর্ব্বেই ফসল তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় এমন কোনও প্রকার ফসল করিতে আপত্তি কি? মরিচ ও তামাক কার্ত্তিক অগ্রহায়ন মাসে রোপন করিতে হয় এবং চৈত্র অগ্রহায়ন মাসেই ফসল তুলা শেষ হইয়া যায়। সুতরাং পটলের মূল রোপনের সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরেই লাইন বা কেইলের মধ্যস্থ ঐ ফাকা যায়গা গুলিতে মরিচ বা তামা-কের চারা রোপণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নানাজাতীয় কচু মুখী প্রভৃতি যে অনায়াসে করা যাইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। পটল ক্ষেত্রের বেড়াতেও কোন কোন আবশ্যকীয় ফসল করা যায়। করল্লা বা উধইয়া এক রকম ফিত-

আস্বাদ বিশিষ্ট ফল। তিক্ত হইলেও তরকারী স্বরূপে তাহার যথেষ্ট আদর আছে। আয়ুর্ব্বেদে করল্লার অনেক গুণের কথা লেখা আছে। ইহার লতা ও পাতা ফলেরচেয়ে অনেক বেশী তিক্ত। তজ্জন্য গরু ছাগল ইত্যাদি কোনও পশুই করল্লার লতা বা পাতা প্রায় খায় না। সুতরাং এইগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে ক্ষেত্রের বেড়ায় তুলিয়া দিলে দুই কাজই হইতে পারে। প্রথম বেড়া খুব মজবুত না হইলে লতা পাতা জড়াইয়া থাকায় কোনও বুভুক্ষিত পশুরই লোলুপ দৃষ্টি বাগানের ভিতর পড়িতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাহা হইতে আর একটী নূতন অথচ বেশ আবশ্যকীয় ফসল পাওয়া যায়। করল্লার আদরও পটলেরচেয়ে কম নহে সুতরাং ইহা দ্বারাও গৃহস্থ কতক পরিমাণে লাভবান হইতে পারে। এই রকম ভাবে মাথা খাটাইয়া কাজ করিলে কৃষিকার্য্য যে খুব লাভবান ব্যবসা তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু হায়! যে দেশের এমনই দুর্দ্দশা যে সাহেবের বাগানে চাকরী করা সম্মান কিন্তু নিজে বাগান করিয়া শাকসবজি বিক্রি করা নিন্দাজনক তাহার আর আশা কি?

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কাব্য ও সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"মানুষ একটী দূর স্বর্গ হইতে প্রভু শাপে নির্ব্বাসিত, এ কথাটা অনেকদেশে অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কারণ যে জিনিষ কোথাও নাই, এবং যাহাকে কখনও কিছুমাত্র পাই নাই তাহার জন্য কান্না আসে না। যাহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি তাহাকেই আমরা নানাদিক হইতে নানা ভাবে খুঁজিয়া মরিতেছি। একটী অমৃতলোকে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সার্থকতা আছে তাহা হইতে আমাদের বিচ্ছেদই নীলাকাশে এবং শ্যামল ধরণীতে বনেঅরণ্যে নদীতেনির্ঝরে পর্ব্বতেসমুদ্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।"

"আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা স্বতন্ত্র, আমরা নিজের দ্বারা নিজে পরিবেষ্টিত, আমাদের অমৃতময় মিলনের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমরা যোগভ্রষ্ট ;— যেখানে আনন্দের ম্লানিমা নাই, যেখানে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নাই জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া গিয়া সমস্তকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া সেইখানে আমাদের যোগস্থাপনা হইলে তবেই সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মানবচিত্তের এই চিরন্তন কথা সকল বিরহের মূলগত। এই অনীর্ব্বচনীয়তাটীই মেঘদূতকাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।"

কবিবরের এই স্বাভাবিক কবিত্বপূর্ণ অথচ সারগর্ভ উক্তিটীর কোন প্রতিবাদ কি কাহারও কল্পনায় আসে? কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক-মহাশয় ইহা কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেখুন। "অভিশাপে" যে মানুষ মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এরূপ প্রবাদ আমি শুনি নাই—থাকিতে পারে। * * * * তাহার পরে, আমরা যে Fallen angels, এ ধারণা শয়তানের পতনের অনুরূপ বটে, কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মেরও অনুযায়ী নহে (?)। * * * * পৃথিবীর সম্বন্ধে, মানুষের সম্বন্ধে এত খারাপ ধারণা কবিজনোচিত কি না, বলিতে পারি না। Wordsworth, Browning প্রভৃতি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন। * * * * আমি ত বিবেচনা করি যে মর্ত্ত্যের মানুষ একটা মহামহিমান্বিত সৃষ্টি। সে ধূলিরউপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্য্যেরপানে চাহিয়া বলিতে পারে—'তুমি সূর্য্য বটে কিন্তু তুমি মানুষ নও'। মানুষের স্নেহদয়া কৃতজ্ঞতা, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ত্যাগ—পরম সুন্দর। তাহার কাছে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছার। আমরা অভিশপ্ত? * * * সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের ধারণার বিপরীত এই ধারণাই আমার বিবেচনায় অভিশপ্ত ব্যাধি গ্রস্ত হৃদয়ের কল্পনা—কবির কল্পনা নহে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক, দেখিলেন সমালোচকবরের কিরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। "পৃথিবীরসম্বন্ধে, মানুষেরসম্বন্ধে এতখারাপ ধারণা" রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে যাহাতে তিনি ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া হঠাৎ রঙ্গালয়ের অভিনেতার ন্যায় হুঙ্কার

হৃষ্কার ভীষণ মন্তব্যের সৃষ্টি। প্রসঙ্গান্তরে * যেখানে রবীন্দ্রনাথের সমালোচকের মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয় নাই, সেখানে তিনি কি বলিতেছেন শুনুন—"বাস্তবজীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া যাইত না। * * * * মনুষ্যজীবনে দেখা যায় যে ধর্ম্ম অনেক সময়ে আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম্ম শেষপর্য্যন্ত শির উচ্চ করিয়া চলিয়া যায়। যীশু খৃষ্টের জীবন ও Martyrদের জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।" হায় ঈর্ষা! মানুষকে তুমি সাময়িক কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইরূপেই আত্মগোপন করিতে শিখাও বটে! কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? কোন্ সময়ে যে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বীয় আন্তরিক ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে তাহা তুমি নিজেই জানিতে পার না। যে পৃথিবী 'ক্ষুদ্রতা স্বার্থ ও প্রতারণায় 'ছাইয়া' রহিয়াছে, যে 'বাস্তব জীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়,' যে 'মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম অনেক সময়ে শির অবনত করিয়া থাকে এবং অধর্ম্ম শেষপর্য্যন্ত শির উচ্চ করিয়া চলিয়া যায়, সেই পৃথিবীকে যদি প্রভুনির্দ্দিষ্ট প্রবাস, এবং সেই মনুষ্য জীবনকে যদি 'যোগ-ভ্রষ্ট' মানবাত্মার নির্ব্বাসন বলা যায় (রবীন্দ্রনাথ এতদ্ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই), তাহাই 'অভিশপ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়ের কল্পনা', না, যিনি পৃথিবী ও মনুষ্য জীবনের উক্তরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া শুধু প্রতিবাদের খাতিরে এতৎসম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা করিতে পারেন, তাহারই 'অভিশপ্ত হৃদয় দুরারোগ্য ঈর্ষা—'ব্যাধিগ্রস্ত'? পৃথিবীর এই 'ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ ও প্রতারণা'র তুলনায় 'স্নেহ-দয়া কৃতজ্ঞতা'ও 'ত্যাগ' কতটুকু! 'ধর্ম্ম যখন অনেক সময়ে আমৃত্যু শির অবনত করিয়া থাকে, তখন কয়জন মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা "ধূলির উপর দাঁড়াইয়া সদর্পে সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিতে পারেন— "তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও?" তবে যদি কোনরূপে আমাদের স্বাভাবিক চেতনা ও অনুভূতি তীব্র মাদকতা দ্বারা আচ্ছন্ন, অভিভূত ও

অসার হইয়া যায়, তাহা হইলে সংসারের দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা করিয়া থিয়েটারের ঢঙ্গে বলিতে পারা যায়—‘সূর্য্য, তুমি সূর্য্য বটে, কিন্তু মানুষ নও।’ কথাটা এতই সাদা যে ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায় তাহাই বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলি প্রধান ধর্ম্ম মানবজাতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অনুসৃত হইয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটীরই চরম লক্ষ্য এই আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ক্লিষ্ট পৃথিবী হইতে মানবের মুক্তি সাধন এবং প্রত্যেক ধর্ম্মই মানবের সম্মুখে এক চিরসুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গলোকের আদর্শ ধারণ করে, ‘যেখানে আনন্দের ম্লানিমা নাই, যেখানে সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নাই” এবং যাহা কেবল মৃত্যুর পরই লব্ধ হইতে পারে, ভগবান্ বুদ্ধ ব্যাধি-জরা মৃত্যু মানবজীবনে সুখশান্তি অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই না মনুষ্যকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন ?

পরে যখন দেখি সমালোচকবর Wordsworth এবং Browning-কে স্বমতের পোষকরূপে খাড়া করিয়া বলিতেছেন, ইঁহারা মানুষের ‘উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন—’ তখন হাস্যসম্বরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল (লেখকের হাস্যরস উদ্রেক করিবার ক্ষমতা বাস্তবিকই অতুলনীয়), কারণ আমরা জানিতে পারিলাম যে তিনি Wordsworth বুঝেন নাই, এবং Browning পড়েন নাই। তিনি বোধ হয় জানেন যে ইংরাজীতে যাহাকে Optimist বলে, Wordsworth তাহাই ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই প্রতিভাত হইয়াছিল ; ইহার যে আর একটা বিপরীত দিক আছে, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। এই জন্য কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে একদেশদর্শী বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। একজন সমালোচক Wordsworth সম্বন্ধে বলিয়াছেন*—The burning Sirocco, the overwhelming avalanche, the dreary skeleton strewn Sahara,the frozen solitudes of the people,the tiger's cruel beauty, and the death-rattle of the snake—all these,

* Chapter on Comparative Mythology.

and such as these, he ignores. Hence arises the tone of complacent optimism that pervades his poems.' এ হেন কবি যে মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তিনিও গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—

And much it gives my heart to think
What Man has made of Man.

এবং তিনিও প্রকৃত সুখ আশা করেন মৃত্যুর পরে—"And hope for higher raptures when life's day is done", এবং এমন এক স্বর্গলোকে যেখানে চিরবসন্ত ('Eternal Summer') বিরাজমান। তারপর Browning এর কথা। এই কবি তাঁহার 'Men and Women' গ্রন্থেই মনুষ্য-চরিত্র বিশ্লেষণে শেক্ষ্‌পীয়রের ন্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন যে এই কাব্যান্তর্গত কবিতাগুলিতে বর্ণিত প্রায় সমস্ত চরিত্রই এরূপ জঘন্য যে শুধু ঐ গুলি মাত্র পাঠ করিলেই স্বতঃই মানবজাতির প্রতি এক দুর্দ্দমণীয় বিরাগ উপস্থিত হয়। একটী কবিতায় (Artemis Prologuises) কবি জিতেন্দ্রিয় আদর্শপুরুষের চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কবিতাতেই আবার ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রা, ভীষণ-প্রতিহিংসাপরায়ণা পৈশাচিক নারীচরিত্র দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন ঈর্ষাবিষ জর্জ্জরিত Pictor Ignotus, পুরুষকার হীন, ভাগ্যবাদী, দুরাচার Johannes Agricola, ঘোর নারকী Bishop of St. Praxed's Church, দুর্ব্বলচিত্ত, স্ত্রৈণ Audrea Del Sarto, এবং তাঁহার ভ্রষ্টা পত্নী Lucrecia, উচ্ছৃঙ্খল সন্ন্যাসী Fra Lippo Lippi, এবং স্বেচ্ছাচারী অধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজক Blongram—এই সকল মানুষের 'উজ্জ্বল ছবি' নাকি? পরন্তু উল্লিখিত কোন চরিত্রেই একটীমাত্র সদ্‌বৃত্তিরও ক্ষীণ আভাস পাই না।

সাধারণ পাঠকের Browningএর সহিত পরিচয় অতি অল্প হইলেও, সমালোচক যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি অতিমাত্র হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। 'পৃথিবীর

সম্বন্ধে খারাপ ধারণা কবিজনোচিত কি না' তাহার উত্তর শেক্ষপীয়র, টেনিসন্ এবং শেলী'তেও পাওয়া যায়। মহাকবি শেক্ষপীয়র যে নিরবচ্ছিন্ন 'উজ্জ্বলছবিই।অঙ্কিত করেন নাই, তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন তাঁহার tragedy গুলি। আর তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সৃষ্টি Prosp ro পুরা বৈদান্তিকের ন্যায় যখন বলিতেছেন—

We are such Stuff
As dreams are made of, and our little life
Is rounded with a Sleep.

তখন এই মহাকবির মানবজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা জানিতে পারি। তারপর টেনিসন্ কি বলিতেছেন শুনুন—

For Nature is one with rapine,
A harm no preacher can heal ;
The May-fly is torn by the Swallow,
The Sparrow spared by the Shrike,
And the whole little wood when I sit
Is a world of plunder and prey.

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—'এ যে প্রাকৃতিক নিয়ম, জীবন সংগ্রামের চিত্র, সত্যই ত তাই। কিন্তু যেখানে প্রতিনিয়ত এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে, যেখানে দুর্ব্বলেরবিনাশ অবধারিত যেখানে 'জোর যার মুলুক তার' সেই পৃথিবীতে কি কবিচিত্ত সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? পরন্তু মৃত্যুই যে মানুষকে প্রকৃত সুখের অধিকারী করে তাহা কবি তাঁহার মুমূর্ষু May Queenএর মুখদিয়া বলাইয়াছেন—

For ever, and for ever, with those
blessed Souls and true ;—
And what is life that we should moan ?
Why make we such ado ?

*　　*　　*　　*

শেলীর Prometheus Unbound সমগ্র মানবজাতি ও মানবসমাজের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহ। নানা অত্যাচারে প্রপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত

মানবজাতি তাঁহার ধারণানুসারে কিরূপে মুক্ত ও প্রকৃত সুখী হইতে পারে তাহারই চিত্র তিনি অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।*

পরিশেষে সমালোচকবর অপরিসীম শ্লেষ ও ব্যঙ্গচেষ্টার সহিত রবীন্দ্রনাথকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—"ব্যস্ত হইবেন না। ইহার ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু ইহার উত্তর পাইবেন দর্শনে, কবিতায় নহে।" সমালোচক মহাশয় এখানে একটা 'বেফাঁস' কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। দর্শন জিনিষটা কি? প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান, এবং আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোকিত করাই যদি দর্শনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আর দর্শনে ও কাব্যে অহি নকুল সম্বন্ধ হইবার কারণ কি? পরন্তু যে সকল সারসত্য দার্শনিকগণ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য জটিল যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল সত্যই নানারূপে সরস, সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকটিত করা কাব্যের চরমোৎকর্ষ নহে কি?† এইজন্যই না জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্ষপীয়র জগতের শ্রেষ্ঠদার্শনিক? অতএব দর্শন ও কাব্যের সমন্বয় পরিহাসের বিষয় নহে। (তবে যিনি জীবনের ludicrous side টাই প্রধানতঃ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র)। কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিবার যদি ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাহা লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া বিরক্তি ও উপহাসের পাত্র না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

---

* আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে এই সকল কবি পৃথিবীতে এবং মানবজীবনে ভাল কিছুই দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও সেরূপ কোন অভিযোগ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে কোন কোন কবির কাছে এই পৃথিবী—A richer Paradise than Adam saw, এবং সমালোচকও স্বচ্ছন্দে এই মত পোষণও ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু অপরকে গালি দিয়া নহে।

† এ সম্বন্ধে আমরা অনাবশ্যক যুক্তিজাল বিস্তার কিম্বা প্রমাণ প্রয়োগ করিতে চাই না। তথাপি সমালোচকের মনস্তুষ্টির জন্য আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজীসাহিত্য হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম।—

(ক) The poet's eye, in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to Earth,
from Earth to heaven

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ?' রবীন্দ্রনাথের ছিদ্রান্বেষণই যাঁহার ব্রত হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে এত কথা বলিয়াই বা লাভ কি ? কবি ও কাব্যের নির্ভীক সমালোচনা ও স্বাধীন মত-প্রকাশ কখনও নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই এককালে এইরূপ বহু করিয়াছেন। কিন্তু সমা-লোচনা মাত্র উপলক্ষ করিয়া যেসমালোচক ঈর্ষাদ্বেষবিজড়িত অকারণ গাত্রদাহ প্রকাশ করিতে থাকেন, তিনি যে শীঘ্রই সাধারণের অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

১৩১৭, আষাঢ়।

(খ) The poet in a golden clime was born
　　With golden stars above,
Dowered with the hate of hate, the scorn of scorn,
　　The love of love.

He saw through life and death, through good and ill,
　　He saw through his own soul ;
The marvel of the Everlasting Will
　　An open scroll
Before him lay.—*Tennyson.*

(গ) In a Roman mouth the graceful name
　　Of prophet and of poet was the same.—Cowper.

(ঘ) —Poets, that our mystic world
　　Alone interpret.—Montgomery.

(ঙ) Poetry is in itself a thing of God
　　He made His Prophets poets.—Baile.

(চ) Poetry, the language of the Gods.—Rogers.

(ছ) Poetry is at bottom a criticism of life—Mathew Arnold.

(জ) Virtue sinks deepest into the heart of man, when it comes recommended by the powerful charms of poetry. * * * Thus the whole soul is insensibly betrayed into morality by bribing the fancy with beautiful and agreeable images of those very things that in the books of the *philosophers* appear austere, and have at the best but a kind of forbidding aspect.—Steel (in the Tatler)

(ঝ) We are beholden to poets more than to philosophers' works.—Bacon.

(ঞ) The poet is indeed the right popular philosopher.

ফ্যান্‌সী চিন্তা।

দেখুন, সাপ বুকে ভর দিয়া হাটে ; খলতা নিষ্ঠুরতায় সে অদ্বিতীয়। মাটীরটান তারমধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই মাটীর টান (যাহাকে রাস্কিন বলেন earth power) অথবা জড়ত্ব যাহাতে যত বেশী সে তত নিম্নস্তরের জী। জীবশ্রেণী মধ্যে সাপই হইল তবে নিকৃষ্টতম—রাস্কিন ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য এই কথা মানিয়া লইতে—আমরা মানুষ—আমাদের কোন প্রমাণই দরকার পড়ে না। শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ—মানুষ দুইপায়ে খাড়া হইয়া অনন্তের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাপ হইল শায়িত সরল রেখা, আর মানুষ দণ্ডায়মান সরল রেখা। এই উভয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ Mystical quadrant টির মধ্যে নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম জীবের দিকে একটি অব্যাহত ক্রমাভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমার্সন্ এই রহস্যচিত্রটি কোনো কবিত্বসম্পদবিশিষ্ট ব্যবচ্ছেদতাত্ত্বিকের নিকট হইতে আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। এই চিত্রটিতে সর্পের সর্ব্বনিম্নতা এবং মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চতা প্রকাশ পাইয়াছে—নয় কি ?

আচ্ছা—জীবের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে ? না, জড়ত্বের ত্যাগে, অথবা যাহা একই কথা আত্মার প্রকাশে। ঘটে-পটে ইটে-কাঠে সাপে-বাঘে দানবে-মানবে আত্মা একই, বৈজ্ঞানিকেরা এখনো স্বীকার না করুন, আমরা হিন্দু, আমরা স্বীকার করি—তবে তফাৎটা শুধু আত্মার প্রকাশের বেলায়। জড়ত্বের তারতম্য অনুসারে এই প্রকাশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। প্রচলিত মত অনুসারে মনুষ্যের মধ্যে এই প্রকাশ স্ফুটতম।

এই প্রকাশের লক্ষণটা কি দেখা যাক্। পাপে ও জড়তায় সম্বন্ধ আছে,—মানেন ত ? প্রমাণ দেখুন তমোগুণ জড়তার আকর, তাম-

—কাজেই জড়ত্বই পাপ। হুগোর সাক্ষ্য গ্রহণ—"All that is earthly is subjected to sin, for it is a gravitation." জড়ত্ব অথবা পাপের অবস্থান নিম্নে, গতি নিম্নদিকে,—প্রমাণ ইট-কাঠ পাথরের স্বাভাবিক অবস্থা, শূন্যে রাখিলে নিম্ন গতি; প্রমাণ, পাতালে নরকের অবস্থান; প্রমাণ, সাপের বুকে হাটা এবং মানবের পায়ে হাটা। তেমনি, পুণ্য অথবা আত্মার গতি উর্দ্ধে; দুই পায়ে ভরদিয়া উঠিয়া শূন্যে মানবের মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো-টাই তার প্রমাণ; পুণ্যাত্মাগণের স্বর্গে অবস্থান এবং আমাদের উর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বর্গ-দেখানোর কথাটা পাঠক মনে করিবেন।

জড়ত্ব জিনিষটা ভারি এবং আত্মা জিনিষটা হাল্কা তাহা বুঝাই যাইতেছে। আত্মার প্রকাশ মানে সভ্যতার প্রকাশ। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষের শরীরের ওজন কমিতেছে তাহা ক্রমস্ফুটমান আত্মার প্রকাশকেই সূচিত করিতেছে আমি এই রূপই বলিব, এবং তত্ত্বকথাও এইরূপই বলে—আপনারা চেঁচামেচি করিলে চলিবে কেন? হুগো তাঁহার এক নারীচরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা আমাদের মতেরই সায় দিবে,—"What had been thinness in her youth had become in her maturity, transparency; and through this transparency the angel could be seen, She was rather a spirit than a virgin. She seemed to be a shadow; there was hardly enough body for a sex to exist; She was a little quantity of matter containing a light; large eyes always lowered; an excuse for a soul to remain upon the earth."

সব দিক দিয়াই মিলিয়া যাইতেছে, এবং মিলাই ত উচিত! কিন্তু মানুষ এবং পাখীর কথা উঠিলে মানুষ যখন বলে আমিই শ্রেষ্ঠ তখনই ত সব উল্টাইয়া যায়। এখন প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা হইয়াছে কে শ্রেষ্ঠ? মানুষ অথবা পাখী? পাথরের নিশ্চল নির্জ্জীবতা হইতে গাছের নিশ্চল সজীবতা শ্রেষ্ঠতর। নিশ্চল সজীবতা হইতে

জীবশ্রেণীর সচল সজীবতা যে বড় এ কথা মানিয়া লইতেও আমাদের কিছুই বাধে না। কিন্তু পড়িয়া থাকার চেয়ে নড়িয়া-চলা যেমন উন্নততর, নড়িয়া-চলার চেয়ে উড়িয়া-ফেরাটা যে তেমনি উন্নততর এ কথা মানিতে আমাদের বাধে কেন? মানুষ বেলুনে আকাশে উড়ে বটে; তা' সাপও ত সময় সময় ল্যাজের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে! আর চিল আকাশে বিহার করিয়াও ভাগারের দিকে দৃষ্টি রাখে এরূপ বলিলে চলিবে কেন? বরং এ কথা বলিব যে চকোর আকাশে উড়ে, চন্দ্রের সুধা না হইলে তাহার অনন্তের ক্ষুধা মিটে না; চাতক আকাশের ধারাপাতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, মৃন্ময়ী ধরণীর পঙ্কিল তাড়াগ পল্বল-বারি তাহার পবিত্র অনন্তের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিবার উপযুক্ত নয়।

মোট কথা পাখী এই "mystical quadrant" এর অন্তর্গত একটি জীব হইলেও সে প্রতিনিয়তই ইহাকে ছাড়াইয়া যায়, এবং এই ছাড়াইয়া যাওয়াটা তাহার স্বভাব। জড়তাবন্ধনমুক্ত মানবাত্মার রূপক এই পাখী, মানবাত্মার শরীরী প্রতিমূর্ত্তি, রাস্কিনের ভাষায় "হাওয়ার শরীর"। এই পাখীতেই শেলী আপনার কবিপ্রকৃতি তথা চিত্তপ্রকৃতিকে অশরীরী সঙ্গীতের স্বর-লহরীতে, অম্বর-গলা আলো-প্লাবনে এবং সৌন্দর্য্য-সুষমার অলকায় উধাও করিয়া দিয়াও অবয়ব দান করিয়াছেন; এই পাখীতেই, এই পাখীরই গগনবিহারে এবং ভূমিবিহারে ইংলণ্ডের ঋষিকবি আত্মার স্বর্গে-ও-মর্ত্ত্যের,—অধ্যাত্ম-ও-বাস্তবলোকের মিলনলীলার স্বরূপটিকে প্রকাশ করিয়াছেন; সৌন্দর্য্যস্বপ্নমগ্ন কবি মার্ভেল এই পাখীরই সঙ্গে আপনার আত্মাকে তুলিত করিয়া বলিয়াছেন যে প্রেমাভিসারের পূর্ব্বে শাখায় বসিয়া চঞ্চুকণ্ডূয়নে তাহার প্রসাধন চলিতেছে, অনন্তের পথে শুভ্রপূত আলোকযাত্রার পূর্ব্বে আপন পালকে বিচিত্ররঙ্গিন পার্থিব ব্যাপারের ঢেউ-খেলানো হইতেছে, অথবা কল্পনার (Imagination) কল্পলোক-প্রয়াণের পূর্ব্বে কবি-আত্মার কলচঞ্চল রঙ্গখেলা (Fancy) হইতেছে মাত্র। এই পাখীতেই যে মাটীর টান (মাধ্যাকর্ষণের টান) সুব

চেয়ে কম এবং "breath of spirit" এর অভিব্যক্তি সব চেয়ে বেশী তাহা ত দেখাই যাইতেছে।

দুই চারটি মানবাত্মার পক্ষে দেহপিঞ্জর এড়াইয়া গোলোকবিহার সম্ভবপর বটে কিন্তু তাহার প্রসারই বা কত দূর! নাটাইয়ের টান এড়াইয়া ঘুড়ি কত দুরই বা যাইতে পারে! আর ঘুড়ি-উড়ানোটাওত সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব নয়!—পৃথিবীতে সদ্য-আগত কয়েকটা মানব শিশুর, Dickens এর Dick এর ন্যায়, কবি অথবা ধর্ম্মপাগলের ন্যায় কয়েকটা বৃদ্ধ-শিশুরও স্বভাব হইতে পারে মাত্র। সেই সংখ্যাও আবার দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। আমরা ঘুড়ি উড়াইয়া, প্রজাপতির পাছে দৌড়িয়া দিন কাটাইয়াছি। এখনকার ছেলেরা মাটীর খেলায় মন দিয়াছে। এই মাটীর খেলার বন্ধন ঘুচাইয়াও দুই একটা খেলোয়াড়ের আত্মা 'মাছি'র মত বন্ বন্ করিয়া শূন্যে উড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু মাটী ঘেষিয়া যাহাদের আত্মা ছুটে তারাই নাকি আজকালকার 'রণ জিতি'য়া থাকে!

মানুষ এবং পাখী, স্বরূপ বুঝিয়া কে বড় এ উত্তরটা আমাকে কে দিবে? বুদ্ধিবিচার-করিয়া-পায়ে-পায়ে মাটি-মাড়াইয়া-চলা মানুষ, না ডানা-কাঁপাইয়া-সবিতৃরাজ্যের-জ্যোতির্জোয়ারে-ভাসিয়া-ফেরা বিহঙ্গ-রাজি?

জ্যোতি পিপাসু।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী, শ্রাবণ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'জীবন স্মৃতি'র পাঠকদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তিনি সবে মাত্র খাসমহালের দরজারকাছে আসিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃই সেই দরজা আর খুলিল না। তিনি লিখিয়াছেন "তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।" আমরা তাঁহার এই শক্তি হীনতার কথা বিশ্বাস করি না। যিনি সমস্ত জীবন নরনারী জীবনের প্রত্যেক দরজাজানালা খুলিয়া সেখানকার অতি নিভৃত

প্রদেশেও আলোকরেখাপাত করিয়াছেন, যিনি বিশ্বমানবের সমস্ত "সুখদুঃখ, ভালমন্দ, ভাঙাগড়া, জয়পরাজয় ও সংঘাত সম্মিলনে"র বিচিত্র ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি যে তাঁহার স্বীয় জীবনের অধ্যায় গুলি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে পারেন না একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?—তবে দেখিয়াছি তাঁহার জীবনকথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে তিনি চিরদিনই ইতস্ততঃ করেন। এতদিন জীবন স্মৃতিতে তিনি যাহা লিখিয়া আসিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁহার কবিজীবনের ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাই কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জীবনের কোনও সুস্পষ্ট ইতিহাস পাই না। অবশ্য কবিকে তাঁহার কাব্যে আমরা যেমন করিয়া পাই আর কোথাও তেমন করিয়া পাই না। কিন্তু কাব্যকে বাদ দিয়া আমরা যেমন কবিকে বুঝিতে পারি না, তাহার সাংসারিকজীবনকে বাদদিয়াও তেমনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারি না। সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁহার সংসারজীবনের ছায়াপাত করিয়াছেন মাত্র এবং তাহাও ক্রমশঃই চাপা হইয়া আসিয়াছে। শৈশবের কথা তিনি যত বলিয়াছেন, তাঁহার কৈশোর কিম্বা যৌবনের কথা তত বলেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার প্রথম যৌবনেই তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। এত দিন তিনি "চাদরের প্রান্তে এক মুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল বাঁধিয়া ক্ষ্যাপার মত বেড়াইয়াছেন," সবে মাত্র এই অধ্যায়টী শেষ হইয়াছিল। যখন "লোকালয়ের ভিতর দিয়া সমস্ত ভালমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্য দিয়া" তাঁহার জীবনের যাত্রা সুরু হইবে তখন তিনি অকস্মাৎ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি তাঁহার বিচিত্রঘটনাপূর্ণ এবং শিক্ষাপূর্ণ বহুদর্শী জীবনেরইতিহাস পাঠকরিবারজন্য আমাদেরমনে শুধু আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে তৃপ্তকরিবার কোন আশা কিম্বা পথ দেখাইয়া দিয়া যান নাই।

চারু বাবুর 'পূজার ঘণ্টা' পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। ধর্মপ্রাণ, করুণহৃদয়, সরল পূজারী ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া একটি অন্যায় করিয়া

ফেলিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে অনুতাপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। যখন সমস্ত অভিমান চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পাপের আনুষঙ্গিক কপটতা দূরীভূত হইয়াছে, নির্ভীকতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তখনই নূতন ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে। ইহাতে বেশ কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাইলাম। কিন্তু চারু বাবুর'মতো' 'তাপুস্‌নয়নে' বোধ হয় কেহ কাঁদিতে সম্মত হইবেন না। গল্পের প্রশংসাটুকু কি চারুবাবুরই প্রাপ্য না যাঁহার অনুসরণে লিখিত হইয়াছে তাঁহার? আমি বলিতে চাই "Let both divide the crown" এখন কোন জন্‌সন্ বলিয়া না বসেন "The conclusion is vicious". 'জল ও স্থল' প্রবন্ধে রবিবাবু বলিতে চাহেন যে যাহারা স্থলেরমধ্যে সীমাবদ্ধ তাহারা স্থিতিশীল, তাহারা তৃপ্ত তাহাদের লক্ষ্য'চরম'; কিন্তু যাহারা 'সমুদ্রকে বরণ করিয়াছে, তাহারা গতিশীল তাহারা অতৃপ্ত তাহাদের লক্ষ্য বিকাশ।" "যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা অপঘাত মৃত্যুর মুখে ছুটিতেছে, আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবল চরমকেই মানিতে চায় তাহারা নির্বীর্য্য ও জীর্ণ হইয়া মরিতেছে। সুতরাং, এই উভয়ের সম্মিলন ব্যতীত মানব সভ্যতা বিচিত্র ভাবে সার্থক হইয়া উঠিবে না। 'দুই ইচ্ছা"য় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন মানুষের দুইটি ইচ্ছা আছে, একটি প্রয়োজনের ইচ্ছা, আরেকটী অপ্রয়োজনের ইচ্ছা, একটী দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা আরেকটী দুঃখজন্মাইবার ইচ্ছা একটী সুখের ইচ্ছা, আরেকটী আনন্দের ইচ্ছা, এই "আরোর ইচ্ছাই" মানুষের "পরমইচ্ছা" মানুষের এই পরম গতিকে যাহা বাধা দেয় তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই মহতী বিনষ্টি।" অজিত কুমার চক্রবর্ত্তীর "ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ" গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ। তবে আরেকটুকু কম ফেনাইলে ভাল হইত। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' নামক উপন্যাস খুব সুন্দর হইতেছে। টাইটানিকের 'হিসাব নিকাশে' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যকথা বলিয়াছেন—তবে তাহা অপ্রিয় সত্য।

সাহিত্য, শ্রাবণ। 'বংশানুক্রম' প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য। 'বিদেশীগল্প' ভাল লাগিল না। ভোজন-লোলুপ বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ কুকুরের অবস্থাই মনেপড়ে মানুষের নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের যাহা প্রাণ ইহার মধ্যে সেই কলানৈপুণ্যেরই সম্পূর্ণ অভাব। লেখক রসিকতা করিতে যাইয়া স্থানেস্থানে প্রায় অশ্লীলতারপরিচয়

দিয়াছেন যথা—"তিনি (পাইমন্ রাদেঁভ) পল্লীগ্রামে বসিয়া কেবল সন্তান উৎপাদন করিতেছেন," "তিনি কেবল সন্তানের জননী—তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্যকোন কার্য্য অথবা চিন্তা নাই"। "মিষ্টান্ন গুলির প্রতি এমন লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, যেন এক একটা মিঠাই এক একটী সুন্দরী যুবতী" ইত্যাদি। বড়াল কবির 'বর্ষাপ্রাতে'র ভিতর একাধারে খাঁটি বাঙ্গলা ও কবিত্ব পাইলাম। 'সাহিত্যে উন্নতির বাধা'র ভিতর ঠিককথাই বলা হইয়াছে কিন্তু লেখক স্বয়ং মনে রাখিবেন যে Example is bettr than precept.'ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুপ্রাস' ললিত বাবুর লেখনী প্রসূত। চতুর্দ্দিকেই অনুপ্রাসের অট্টহাস্যে ভীষণ হট্টগোল উপস্থিত হওয়াতে কর্ণ বধির হইয়াছে এখন লেখকের সাধারণ মন্তব্যটা জানিতে পারিলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। "পল্লী পলিটিক্‌স্" খুব সুন্দর হইয়াছে ; গ্রাম্য জীবনের এরূপ বিশ্বস্ত চিত্র আজকাল-কার বাজারে বিরল। আশা করি অবশিষ্টাংশও এইরূপই হইবে। ইহা মোপাসাঁ বা দিলা ফোঁসোর মর্ম্মানুবাদ নহে। ইহা কাহারও ছায়া অবলম্বনে লিখিত নহে। লিখিত নিজের আলোক অনুসরণে। 'সাগরিকা' তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

ভারতী, শ্রাবণ। সত্যেন্দ্রনাথ নিজের বাল্যকথা লিখিতে বসিয়া নগেন্দ্রনাথ ও গিরিন্দ্রনাথের কথাটীও সঙ্গে সঙ্গে শেষকরিয়াছেন, এখন আরবাকী দুইএকজনের কথা জানিতে পারিলেই ঠাকুর পরিবারের সম্পূর্ণ Encyclopædia সঙ্কলিত হইতে পারে। 'বাগ্‌দত্তা' বড়ই diffuse বোধ হইল ইহাতে পাঠকের আগ্রহ কখনও বিক্ষিপ্ত নাহইয়া পারে না। 'শঙ্করের সিদ্ধান্ত' বেশ লাগিল। 'চিঠি' একটী romantic গল্প। ইহাতে কমাটৈপুণ্যের পরিচয় পাইলাম। প্রকৃত significance টা সকলে বুঝিলেই ভাল। 'অন্তর বাহির' এ রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের উপর সত্যের আধিপত্য ঘোষণা করিয়াছেন। 'বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা বিচার' অতিশয় সুখপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ ও সুন্দর প্রবন্ধ। ইহা সকলেরই পড়া উচিত। "বৈজ্ঞানিক জীবন." ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও লেখকের বর্ণনাশক্তিতে সকলেরই প্রিয় হইবে। এরূপ প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন। 'ভারতের সহিত জাপানের সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধে যদুবাবু বলিতেছেন যে জাপান রুষযুদ্ধে জয়লাভ করারপর ভারতবাসীদিগকে ঘৃণা করে, ভারত এখন তাহাদের নিকট বর্ব্বর ও অসভ্য। যাঁহারা জাপানীপণ্য স্বদেশী

মাতৃস্নেহ ।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারদ লক্ষ্মী।

আজি শান্ত শারদ প্রভাতে মঙ্গলময়ী জননী।
হেরিনু তোমারে নব অরুণ-কিরণোজ্জ্বল বরনী॥
বিকশিত নব মাধুরী আস্যে,
দিক পুলকিত বিমল হাস্যে,
স্নেহ পরশে, আকুল হরষে,
হাসিয়া উঠেছে ধরণী॥
দোলে সমীরণে শ্যামল অঞ্চল,
শোভে পদতলে শত শতদল,
বরষা বিহ্বল ঊর্ম্মি চঞ্চল
হাসে খল খল তটিনী॥
তরুণতপন-খচিত কিরিট চুমিছে ঊর্দ্ধ গগন,
জাগিছে করুণ আলোক পরশে মোহ-তিমির-মগন,

নিখিল বিঘ্ন বিপদ হর,
দশ দিকে দশ অভয় কর,
জলদ-কাল চিকুর জাল, ভালে মলিন নিশামণি ॥
অঞ্জলি পুরি কানন-তরু ঢালিছে কুসুম চরণে,
ভরেছে ভুবন মধুর গন্ধে মোহন শত বরণে,
অযুত বিহগ উদার ছন্দে
প্রেমানন্দে চরণ বন্দে,
নাশি নিরাশা আশার ভাষা শুনাও ভুবন পালিনী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

— —

রজনীকান্ত।

আজ দুই বৎসর অতীত হইল, রজনীকান্ত জগতের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আজ সেই পরলোকগত কবির পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া, তাঁহার বিষয়ে ২।১ কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সামান্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সময়বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবেনা। কবি, সাহিত্যিক জগতের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইয়া যায়, তাঁহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করা কখন সময়-সাপেক্ষ নহে, তাহা চিরদিনই নূতন। জগত চিরকাল ধরিয়া তাঁহাদের সেই পুণ্যস্মৃতি পুষ্পবিল্বদলে পূজা করে।

রজনীকান্তের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমাদের সত্য সত্যই মনে হয় যে কবির জীবনের উপর জগদীশ্বরের একটা অভিসম্পাত আছে। জগতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইটালির ইতিহাসে Danteর জীবন চরিত পাঠ করিয়াছি,—তাঁহাকে একদিন উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টনকে দেখিয়াছি—প্রাণপাত পরিশ্রমে মাতৃভাষার সেবা করিয়া, কবির শেষ জীবন অন্ধতার পুরস্কারে

বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। কবির হৃদয়ের সেই লুক্কায়িত দুঃখের উচ্ছ্বাস, তাঁহার বহুকাব্যে, বহু কবিতায় পাওয়া যায়। তার পরে কবিকুলশিরোমণি সেক্ষপীর,—তাঁহার জীবনের খুব একটা সঠিক ইতিহাস যদিও দুর্ল্লভ,—তথাপি তাঁহার জীবনও যে শান্তিপূর্ণ ছিল না, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। আমাদের দেশীয় কবিদিগের জীবনের এরূপ শোকাবহ পরিণামের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মহাকবি মাইকেলের পরিণাম দেখিয়াছি — এখনও নবীনচন্দ্রের সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন মনে পড়ে—

"কি বলিব হায় হায়, শুনে বুক ফেটে যায়,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ!"

হেমচন্দ্রকে দেখিয়াছি। আমাদের কবি নবীনচন্দ্রের জীবনও অতিশয় সাংসারিকঅশান্তিপূর্ণ ছিল—আর সর্ব্বশেষে দেখিলাম—রজনীকান্তকে। হায় মা বঙ্গজননী, তোর একি প্রকৃতি মা! মা ভারতি, তোর যে সন্তান অকাতরপরিশ্রমে তোরই সেবা করিয়া আসিতেছে, তার প্রতি তোর এ কঠোর ব্যবহার কেন মা?

রজনীকান্তের সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় কিছু ছিলনা। তবে তাঁহার মেডিক্যাল কলেজ কটেজ ওয়ার্ডে অবস্থিতি কালে, আমি মধ্যে ২ তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। সেই সামান্য ২।১ বার দর্শনেই তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি এবং আমার সহাধ্যায়ী প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার কটেজ ওয়ার্ডে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তিনি তাঁহার শয্যার উপরে অতি কষ্টে কয়েকটি বালিশ বুকে দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। উৎকট গণ্ডমালা রোগে বহুদিনই তাঁহার বাকশক্তিরোধ হইয়াছিল, তাই কবি কাগজে লিখিয়া তাঁহার মনোভাব আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া রোগত্রাসজর্জ্জরিত দেহেও কবির মানসিক স্ফূর্ত্তি এবং উদাম একটুও হ্রাস পায় নাই। কবির লেখনী তখনও অবিরাম

গতিতে চলিতেছে। কিয়ংক্ষণ পরে কবি তাঁহার অদূরস্থিত হারমোনিয়মটি :নিকটে আনিয়া তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীকে "আনন্দময়ী" হইতে তাঁহারই স্বরচিত একটি গান গাইতে আদেশ করিলেন। "আজি নিশা অবসানে উমা মা মোর শ্মশানে যাবে''—যখন সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গায়কের কণ্ঠস্বর শান্ত গৃহখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল, তখন কবির যে এক অভিনব ভাববিহ্বল, ভক্তি-পুলকিত চিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। দেখিলাম কবি নিমীলিত নেত্রে সঙ্গীতের তালে ২ হস্ত ফেলিতেছেন, আর ভক্তি অশ্রুতে তাঁহার সমস্ত বক্ষ প্লাবিত হইতেছে। আহা সে কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! তখন বাস্তবিকই মনে হইল হায় মা বঙ্গজননী তোমার কবি এমন কোকিল-কল-কণ্ঠ পাইয়া সহসা আজ নীরব হইল কেন। রাত্রি ৮টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম—সে দৃশ্য তখনও আমার চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর ২ দিন পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার শারীরিক অবস্থা প্রশ্ন করায় কবি কম্পিত—হস্তে কাগজে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন—"আর আমার জন্য মায়া কেন ভাই? আমায় পরিত্যাগ কর। বড় যন্ত্রনা—আর সহ্য হয় না। এখন মার নিকট যাইতে পারিলেই সুখ"! ভক্ত কবির সে আকুল ক্রন্দন বুঝি মার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল, তাই মা বোধ হয় অত শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন।

কবি রজনীকান্ত ১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদও অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। পিতার সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। রজনীকান্তের হৃদয়ে কবিত্বের অঙ্কুর অতি বাল্যকাল হইতে দেখা যায়। সামান্য ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তিনি কবিতা রচনা করিতে অত্যন্ত
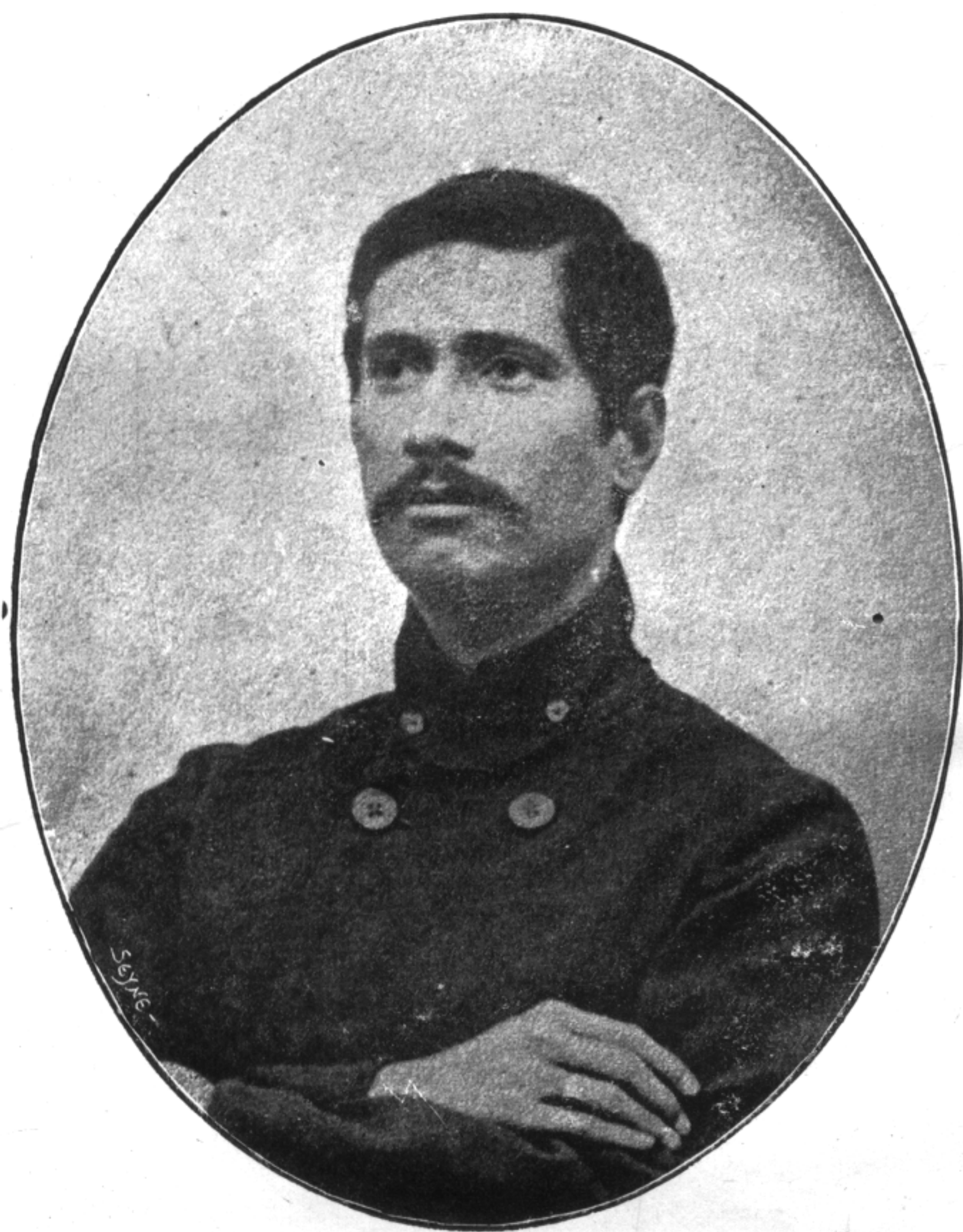
রজনীকান্ত সেন।

ভাল বাসিতেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় তিনি শৈশব হইতেই দক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার স্বর অতিশয় সুললিত ছিল।

কিন্তু কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার কাব্যে। বহু গবেষণায়, বহু অনুসন্ধানে আমরা কবির যে মানসিক ভাবটুকুর পরিচয় না পাই, কাব্যে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। রজনীকান্তের কাব্যজীবন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। "বাণী" এবং "কল্যানী" তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কাব্য—। এই সময়ে রজনীকান্ত রাজসাহীতে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। এই দুইখানি কাব্য প্রকাশ হইবার পর রজনীকান্তের লেখনী কিছু দিনের জন্য নীরব ছিল। তাই ইহার পর বহুদিন ধরিয়া তাঁহার আর কোন পুস্তক পাঠ করি না। তাঁহার অবশিষ্ট ৪খানি কাব্য—"অমৃত", "অভয়া", 'আনন্দময়ী', এবং "বিশ্রাম"— তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাকালে লিখিত—তখন তিনি উৎকট গণ্ডমালা রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রজনী-কান্তের মানসিক গুণাবলীর পরিচয় তাঁহার কার্য্যে যথেষ্টই পাওয়া যায়। রজনীকান্ত কেবল যে দীনভক্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি আবার সুরস - রসিকও ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁহার ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি আবার তাঁহার কবিতায় হাস্যরসের একটা অপূর্ব্ব হিল্লোল দেখিতে পাই। কবি যেমন একদিকে গাহিয়াছেন—

"প্রভু বিশ্ববিপদ হন্তা—
তুমি দাঁড়াও রোধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে যাও মোরে
মত্ত বাসনা নিভায়ে

আবার অন্যদিকে গাহিয়াছেন—

"মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই— যে পুরো পাঁচহাত লম্বা,
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় তাহারে রম্ভা।,,

একদিকে যেমন অতুল আত্মবিসর্জ্জন, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব্ব হাস্য-রসের প্রস্রবন!

রজনীকান্ত বাণীর সূচনাতেই লিখিয়াছেন—

"সেথা আমি কি গাহিব গান
যেথা গভীর ওঙ্কারে, শ্যাম ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূরবিমান।"

* * * * * * * * *

তার পরে বুঝি সেই ওঁকারপূর্ণ, শ্যামগানমুখরিত সেই পূণ্যভূমি ভারতের আজ এই অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, কবির হৃদয়ে দুঃখের একটা করুণ ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, তাই কবি আবার গাহিয়াছেন—

"আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি ভারতে আছে সে মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ—
আর কি আছে সে প্রাণ।"

রজনীকান্তের হৃদয় ভগবানের প্রতি অপূর্ব্ব ভক্তি-রসে পূর্ণ ছিল। সে ভক্তির সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার বাণীতে রহিয়াছে। রজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

"আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে,
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।"

ধন্য কবি, ধন্য তোমার লেখনী। তোমার এই পবিত্র উচ্ছ্বাস, অভক্তি-পূর্ণ নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তির পূতমন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে।

"বাণীতে" রজনীকান্তের যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই, কল্যাণীতেও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। তাঁহার ভগবৎপ্রেম এবং ভগবদ্ভক্তি বাস্তবিকই অতীব শিক্ষনীয় পদার্থ। যত দিন জগতে বঙ্গভাষার আদর থাকিবে, যতদিন মানব সমাজে কাব্য এবং

কবিতা আদৃত হইবে, ততদিন রজনীকান্তের কবিতাবলী জগতের লোককে প্রেম, ভক্তি এবং প্রীতি শিক্ষা দিবে। তাঁহার—"কেন বঞ্চিত হব চরণে",—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে "—ইত্যাদি পাঠ করিয়া কাহার মন একটা বিপুল পুলক-স্পন্দন অনুভব না করে?

আমাদের রজনীকান্ত কেবল যে—ভক্তিপরায়ণ বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি আদর্শ স্বদেশ প্রেমিকও ছিলেন। তাঁহার স্বদেশ ভক্তি, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্ছ্বাস, তাঁহার বহু কবিতায় বিদ্যমান্ রহিয়াছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কবিতাগুলি যেন এক এক খানি নিখুঁৎ চিত্র। সে চিত্র দর্শনে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। সে কবিতা পাঠে মন যেন কি একটা মন্ত্র শক্তির প্রভাবে আপনা আপনি আর্দ্র হইয়া উঠে। ভক্ত প্রাণ কবি লিখিয়াছেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
　　　　মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
　　　　এর বেশী আর সাধ্য নাই।"

কবি আবার গাহিয়াছেন—

"আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আছি সাতকোটী ভাই জেগে ওঠ।"

এমন স্বদেশপ্রাণতা, স্বদেশভক্তির এমন তীব্র উচ্ছ্বাস আর কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় কি?

সুরস রসময় কবিতা রচনায়ও রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'পুরোহিত' 'উকিল,' 'হাকিম' 'ডাক্তার' প্রভৃতি এক একটী রসিকতার অক্ষয় ভাণ্ডার। তাঁহার—"যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত' বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিকট পরিচিত। কিন্তু এই হাস্যপরিহাসের মধ্যেও রজনী-কান্ত আমাদিগকে গভীর তত্ত্বোপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন সে উপদেশ জগতে দুর্লভ। তাই তাঁহার 'মোক্তার' শীর্ষক কবিতার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শুনেছি সেখানে চলেনা ফাঁকি,
মোরা শিখায়েছি কত দোষীর জবাব
মোদের জবাবটা কি!"

সব হাস্য পরিহাস দুই কথায় শেষ হইয়া গেল! কবির এ প্রশ্ন বাস্তবিকই একটা গবেষণার বিষয়। ইহা এক মহৎ শিক্ষা!—

আজ রজনীকান্তের মৃত্যুতে আমাদের দীনা বঙ্গ ভাষা আরও দীনা। বঙ্গভাষা রজনীকান্তের নিকট হইতে আরও অনেক জিনিষ প্রত্যাশা করিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা পূর্ণ হইল না। যাও কবি—শোকতাপময় সংসারের জ্বালা এড়াইয়া স্বর্গে অনন্তসুখ অনুভব কর। স্বর্গের পাপভ্রষ্ট দেবতা তুমি, দুদিনের জন্য জগতে আসিয়াছিলে, তাই দুদিনেই জগৎকে মোহিত করিয়া উজ্জ্বল প্রভায় চলিয়া গিয়াছ। স্বর্গীয় নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্প তুমি, তাই বুঝি ধরার বাতাস তোমার সহিল না! কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তুমি গিয়াছ বটে কিন্তু ধরাতলে তোমার কীর্ত্তি রহিয়াছে। তোমার 'বাণী' চিরকাল জগতে ভগবানের অভয়-বাণী প্রচার করিবে। তোমার 'কল্যাণী চিরকাল ধরিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিবে। তোমার "অভয়া" ভগবানের আশীর্ব্বাদের ন্যায় মানুষকে অভয় প্রদান করিবে। তোমার "অমৃত" শিশুপ্রাণে পীযুষ ধারা সঞ্চার করিবে। আর তোমার "আনন্দময়ী" আবহকাল ধরিয়া জগতে লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। তুমি গিয়াছ বটে, কিন্তু আজও তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তির মধ্যে তোমার অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই আর সঙ্গে সঙ্গে Cowperএর ভাষায় বলিতে পারি—

"Time has but half succeeded in his theft,
Thyself removed, thy power to soothe us left."

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল।

সে কোন্ দেশ।

ওগো সে কোন্ দেশ ?—
যেথায় গেলে মানুষেরা
যায় গো ভুলে ঘরে ফেরা,
অবাক্-চোখে আত্মীয়েরা
—চেয়ে নির্নিমেষ!
ভিজে-চোখে যায়না দেখা,
ওগো সে কোন্ দেশ ?
ঐ দেখ ঐ ছায়ার রথে,
কত জনা যায় সে পথে ;
কেউ ফেরে না সেথা হ'তে,
— নাই কি মায়া লেশ!
মন ভুলিয়ে মানুষ ধরা,
ওগো সে কোন্ দেশ ?
সন্ধ্যা হ'লে মায়ের কোলে,
ছুটে আসে যে-সব ছেলে,
তারাও সেথা আছে ভুলে
—একি নূতন দেশ!
মায়ের চেয়ে মায়া যাহার,
কেমন তাহার বেশ ?
ঐ গো সেথায় বাঁশী বাজে,
যাবার যা'রা সবাই সাজে,
আমায় এ কোন্ মিছে কাজে
—রাখ্‌লে পরমেশ!
ভিজে-চোখে যায়না দেখা,
ওগো সে কোন্ দেশ ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

মিল্‌টন সম্বন্ধে আলোচনা।

ইংলণ্ডের পিউরিটান নামধেয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্মপুস্তক ভিন্ন অন্যরূপ কাব্যপাঠ, নাটকাভিনয়-দর্শন, নৃত্যগীতাদি প্রমোদে যোগদান, চিত্র-ভাস্কর্য্যাদি সুকুমার-কলানুশীলন প্রভৃতি পরিহার করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, পবিত্র ধর্ম্মের সহিত এগুলির সম্পূর্ণ অসঙ্গতি। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ভজনালয় হইতে সুকুমার কলার চিহ্নসকল দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং এইরূপে কঠোর ধর্ম্মশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মানব-সমাজের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত সুকুমার কলার ধর্ম্মোপাসনা হইতেই উদ্ভব, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই কাব্য-নাটকের, নৃত্যগীতবাদ্যের প্রথম সৃষ্টি, এমন কি গণিত জ্যোতিষ প্রভৃতি যে সমস্ত নীরস বিষয় এখনকার দিনে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত সেগুলিও ধর্ম্মানুমোদিত যাগযজ্ঞহোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহায়তার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল, ইহা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ-মাত্রেই অবগত আছেন। ফলকথা, মানুষ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভাবলে যাহা কিছু প্রচারিত করিয়াছে তৎসমস্তই ধর্ম্মের সহিত জড়িত ; ধর্ম্মরসে সিক্ত হইয়াই মানবতরুর নানাশাখা গণিত জ্যোতিষ কাব্য নাটক নৃত্যগীতবাদ্য চিত্র শিল্প ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি ফলফুল প্রসব করিয়াছে। তবে অনেকে এই কথা বলেন যে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কলা ও সাহিত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এই গুলিতে অনেকরূপ দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তির পোষকতা করিতেছে, ইহাদের প্রয়োগ অত্যন্ত তরল (light) ও হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে পিউরিটানদিগের মতের নিন্দা করা চলে না। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে ধর্ম্মভাবের শিথিলতা ঘটাতেই এরূপ বিষময় ফল হইয়াছে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন।

কিন্তু আমার বোধ হয় আদিম মানব প্রথম উৎসাহে নানারূপ কলাচর্চ্চাদ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করাই চরমসুখ মনে করিয়াছিল ;

পরে যখন কলাচর্চ্চায় সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল, তখন কেবল এক ভাবে সমস্ত প্রতিভা ব্যয়িত না করিয়া নানা উদ্দেশ্যে কলা-কুশল প্রতিভা নিযুক্ত করিল এবং তাহার ফলে কলাচর্চ্চার ক্ষেত্রের পরিসর বাড়িয়া গেল এবং কালে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ে প্রতিভাবিকাশই অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। বিধাতার কমনীয় সৃষ্টি ফুল দেবতার চরণে অর্ঘ্যরূপে ব্যবহৃত না হইয়া রূপসীর কবরীতে, বিলাসীর গলদেশে, ধনীর বৈঠকখানার টেবিলে, বা শৌণ্ডিকের সরাপখানায়, শোভা পাইল! কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ফুলের অনাদর করে? সেইরূপ কলাবিদ্যার অপব্যবহার ঘটিয়াছে বলিয়া কি সুধীজন তাহাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিবেন এবং 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিবেন? বাস্তবিক কলাপ্রয়োগের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়, ততই মানুষের কৃতিত্ব। বর্ব্বর অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় আসিয়া মানুষের কার্য্যকরী ক্ষমতা কত বাড়িয়া গিয়াছে, কতদিকে তাহার প্রতিভা বিকাশ পাইতেছে এবং কতভাবে পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করি-তেছে, তাহা দেখিয়া মন যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। যেখানে কলাকৌশলের প্রয়োগে দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছে সেখানেও বলিতে হইবে যে কলাপারিপাট্যে দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তির নগ্নতা ও কুৎসিতত্ব কতকটা পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে (under which vice itself loses half its evil by losing all its grossness)।

তাহা হইলেই বুঝা গেল, কলাকৌশলের প্রয়োগে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-সৃষ্টি মানব-প্রতিভার একটি মহৎ কার্য্য। মানুষ যে পরিমাণে এ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, সেই পরিমাণেই সে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তবে যিনি সেই প্রতিভা দেবসেবায় নিয়োজিত করেন, তিনি ত বিশেষভাবে মানব-সমাজের উপকারক। আবার সভ্যতার আমলে যিনি প্রতিভার শতমুখী ধারা নিরোধ করিয়া তাহাকে এক অনন্তের দিকে প্রবাহিত করিয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিব, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ-

কবি মিল্‌টন এই কৃতিত্বের অধিকারী। এবং তিনি যে পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও কাব্যালাপ বর্জ্জন না করিয়া কাব্যকলার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাহাকে দেবভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার অমৃত ফল। এই জন্যই মিল্‌টন সুধীসমাজের প্রগাঢ় ভক্তির পাত্র।

মিল্‌টন যে কেবল মাত্র কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। হিন্দুজাতির আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্মসাধনায় হিন্দুজাতি চিরদিন গৌরব লাভ করিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ঋষি কবি, ব্যাসবাল্মীকি প্রভৃতি পুরাণেতিহাস-প্রণেতা, জৈমিনি পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিক, অত্রিহারীত-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকার ইত্যাদি প্রাচীনগণের কথা ছাড়িয়া দিলে আধুনিক কালেও রামপ্রসাদ, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতি সাধকগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই সাধক কবিগণের গীতাবলি আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য-রত্ন। ইংরাজী সাহিত্যেও ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের রচিত স্তোত্র (psalms, hymns) প্রভৃতির অভাব নাই। কিন্তু সাধক কবির রচিত মহাকাব্য আধুনিক কালে সকল সাহিত্যেই নিতান্ত বিরল। অবশ্য বাঙ্গলা সাহিত্যে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডী প্রভৃতি মহাকাব্যের ধর্ম্মের সহিত নিবিড় সংযোগ আছে সন্দেহ নাই, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্যই এগুলি রচিত এবং দেবদেবীর মহিমা প্রকটন করাই এগুলির উদ্দেশ্য। রামায়ণ, মহাভারত, শিবায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে এসব কথা ত আরও খাটে; কিন্তু ঘনরাম, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতি কবিগণকে ঠিক সাধক বলা চলে না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতিকে সাধক বলিতে অগ্রসর হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা গীতিকাব্য লিখিয়াছেন, মহাকাব্য রচনা করিয়া যান নাই। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থকে ঠিক মহাকাব্য বলিতে প্রস্তুত নহি, সেগুলি পদ্যে লিখিত মহাপুরুষজীবনী বই আর কিছুই নয়, কেননা সেগুলি আর্টের দাবীদাওয়া কিছুই রাখেনা। তাহা হইলেই কথাটা

দাঁড়াইতেছে এই যে, আধুনিক কালে কেবল-মাত্র মিল্‌টনই একাধারে সাধক ও মহাকাব্য-প্রণেতা। ইহাও মিল্‌টনের আর এক বিশিষ্টতা এবং এই জন্যও কবিশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকাব্য-প্রণেতারা যে সাধক ছিলেন এ বিষয়ে ওকালত্‌নামা বোধ হয় কেহই লইবেন না। একে তো আধুনিক কালে মহাকাব্য রচনা করাই একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার, তাহার উপর ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনা এবং সেই মহাকাব্যকে সাহিত্যসংসারে স্থায়ী স্থান লাভ করান আরও দুরূহ ব্যাপার। মিল্‌টন এই অনন্যসাধারণ যশের একমাত্র অধিকারী।

বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোট

এ জগতে আমি শুধু ছোট ভালবাসি—
ছোট মুখ, ছোট কথা, ছোট ছোট হাসি।
স্নেহের প্রতিমাগড়া ছোট ভাই বোন,
ছোট ছোট মধুমাছি, মৃদু গুণগুণ ;
ছোট তটিনীর সেই মৃদু কলতান,
ছোট কোকিলের সেই মৃদু কুহুগান,—
বিশ্বঘেরা চারিধারে যত ছোট মুখ
সতত আমার যেগো জুড়ায়েছে বুক।
অসহায় দরিদ্রের ক্ষুদ্রদুঃখকথা,
স্পন্দিত করিয়া তুলে—বড় পাই ব্যথা।
পল্লীবাটে কৃষকের ছোট কুঁড়ে ঘর,
জীর্ণ বাসে সুখী সেই সরল অন্তর ;
ছোট ছোট সংসারের নিত্যকর্ম্মখেলা,
হট্টগোল-পূর্ণ-বিশ্বে তুচ্ছঅবহেলা ;
পল্লীগ্রামে ছোট ছোট জীবন মরণ,

মহাশান্তি এনে দেয়, মগ্নজাগরণ।
ইচ্ছাকরে ত্যজি এই সহর প্রাচীর
বহুদূর পল্লীবাটে বাঁধিগে কুটীর!
কাননের ছোট ফুল হেসে হেসে চায়,
মৃদুস্নিগ্ধ গন্ধরাশি নীরবে বিলায়।
অনন্ত আকাশে ওই ছোট তারা গুলি
নীরবে চাহিয়া থাকে ছোট চোখ মেলি'।
আমার রচিত এই ছোট ছোট গান,
মহাসুখ মহাশান্তি করে মোরে দান।
সরসীর ছোট ঢেউ ভেসে চলে যায়,
মহত্ত্বের মাঝে ছোট আপনা হারায়।
ছোটতে মাখান যেন মোহ-সুধারাশি;
বুঝি আমি ছোট, তাই ছোট ভালবাসি॥

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

ভারত চক্ষে ইমার্সন।*

উনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অগ্রণী লেখকগণের মধ্যে যে মহাত্মাগণের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কারলাইল এবং ইমার্সন ইহাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই দুইটী সুপ্রসিদ্ধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা কাল্পনিকতাকে হয় নিতান্ত গৌণ স্থান প্রদান করিয়াছেন নতুবা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, যে সত্য সুদূর অতীতের স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাচ্য মনের উপর গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার সঞ্জীবন-মন্ত্র প্রাচ্য প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তির সহিত উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে সেই বাস্তবতার উপরে তাঁহারা অত্যধিক অভিনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। রক্ষণশীল (গোঁড়া) খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের সমর্থক-স্বরূপ না হইলেও মানব-

* 'Harvard Theological review' হইতে শ্রীমহানন্দ সিদ্ধান্ত সরস্বতী-

সাধারণকে সান্তে অভিব্যক্ত অনন্তের উপলব্ধির জন্য জাগরিত করিয়া বাহ্য ও অন্তর্জগতে ভগবৎসত্তার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অনুপ্রবেশের অনুভূতি উদ্দীপিত করা হেতু "Ecclesiastical Sonnets" এর সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক শিক্ষকরূপে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সত্যের এই জীবন্ত আদর্শেই শেলীর মহত্তম কাব্যাংশের বহুস্থল অনুপ্রাণিত; কার্লাইলের গরিষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে সেই সত্যেরই বিকাশ; এবং আধ্যাত্মিকতাশূন্য জগতের প্রতি ইমার্সনের শুভ সন্দেশে সেই সত্য চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ইমার্সন প্রাচ্য মানব-মনের উপর এত অধিক আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা আর্য্য-ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ক্রমে যাহা সামগানে উদ্গীত করিয়াছিলেন ইঁহারা আধুনিক মার্জ্জিত ভাষাতে তাহারই ভাষান্তর করিয়াছেন মাত্র। ইঁহারা আমাদিগের অতি প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসে নবজীবন ও নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন এবং ভগবৎকৃপালোকসমুদ্ভাসিত বা বর্ত্তমান-ভাবানুমোদিত প্রশস্ততর উদার বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা উন্নমিত বহ্বায়াসলব্ধ মহার্ঘ সত্যকে ইহার সহিত অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেই প্রাচীন বিশ্বাসের স্থিতি-স্থাপকতা ও উন্নতির স্থিরনিশ্চয়তা সন্বিধান করিয়াছেন। প্রাচ্য জগতের শিক্ষার সহিত মহামতি ইমার্সনের মনের আধ্যাত্মিক সংহতি সবিস্তার প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের যথার্থ মর্ম্মবোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা তদীয় বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করিতেছি।

শিক্ষকের ভাব ও নীতি প্রচারের সফলতা, উপপাদ্য প্রমেয়ের যুক্তিতর্ক ও বিচার কুশলতা অপেক্ষা উহার মজ্জাগত নিজস্ব—প্রকাশকালীন ঐকান্তিকতা এবং ভাব ও কল্পনানুক্রমণ জাগাইয়া তুলিবার কুশলতার উপর নির্ভর করে। যুক্তিবলে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সমর্থন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ভাব ও কল্পনার দ্বারে আঘাতকারিগণই জনসমাজে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

ইমার্সন্ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কতিপয় মহীয়ান্ ভাবের প্রচারক স্বরূপ, তিনি যুক্তি তর্ক ও বিচার কৌশল অপেক্ষা ভাব-নিবহের গুরুত্বের প্রতি অধিকতর আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া এবং তৎপ্রচারিত সত্যের স্বতঃপ্রামাণ্যকল্পতা ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভূয়োদর্শন-মূলকতা-হেতু সুরক্ষিত যুক্তিজাল বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থাও ইহার অন্যতম কারণ। তিনি বলেন,—

" I do not know what arguments mean in reference to any expression of a thought. I delight in believing what I think, but if you ask how I dare say so, or why it is so, I am the most helpless of mortal men."

তিনি সুকৌশল যুক্তিপ্রণালী অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টির মূল্য অধিক বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে,—

"It was a grand sentence of Emanuel Swedenborg, which would alone indicate the greatness of that man's perceptions, it is no proof of a man's understanding to be able to confirm whatever he pleases ; but to be able to discern that what is true is true, and that what is false is false, this is the mark and character of intelligence."

ইমার্সন স্বয়ং অসাধারণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া অপরের এই গুণকে এত অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা কার্লাইলের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের পর স্বীয় অভিমত প্রকাশকালে বলিয়াছিলেন যে তাঁহা অপেক্ষা অল্পধীশক্তিশালী অথচ উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। তাঁহার প্রকৃতিগত ব্যষ্টিত্ব যেন কথায় মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিত ;—

"We know truth when we see it, from opinion, as we know when we are awake that we are awake"

বিচার-পরাঙ্মুখ অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার স্পর্দ্ধাসহকৃত আশ্বাসপ্রোৎসাহিনী বাণী নিম্নলিখিত আকার ধারণ করিয়াছে ;—

"Trust the instinct to the end though you can render no reason. Why should I give up my thought because I can not answer an objection to it ?"

তাঁহার মতে—

'With consistency a great soul has nothing to do."

তিনি কার্লাইলকে বলিয়াছিলেন,—

"To great results of thought and morals, the steps are not many. and it is not the masters who spin the ostentatious continuity."

যথোচিত যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া যখন একটী কথাও বলিবার উপায় ছিল না, সূক্ষ্মবিচার প্রণালী যখন বুদ্ধিমত্তার চরম নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইত,—প্রজ্ঞাবাদী ইমার্সন সই ঘোর সংশয়-যুগের বিষম তর্ককোলাহলে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যে কেবল বিচারশক্তিশীলতা ও অভ্রান্ত যুক্তিপ্রণালী উপেক্ষা করিয়া সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুভব-প্রবণতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এমত নহে, তিনি বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে স্বীয় অভিমত সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গুরুর ন্যায় আত্মস্বরূপের ঐশী প্রজ্ঞা বা সংস্কার তাঁহার নিকট "The fountain light of all our day" জ্যোতিপ্রস্রবণস্বরূপ ছিল।

ভাষাচাতুর্য্য ও বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শনে বিরত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বাক্যাবলী গভীর ধর্ম্মতত্ত্বে গঠিত থাকিলেও, কোনও বিশেষ মত দ্বারা রঞ্জিত হয় নাই। আধ্যাত্মিক তথ্যানুসন্ধানে তাঁহার নিস্পৃহা বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইত। বিঘ্নসঙ্কুল আধ্যাত্মিক সমস্যা-সমূহ কার্য্যক্ষেত্রে কাহারও সম্মুখীন হয় না—

"Never darkened across any man's road, who did not go out of his way to seek them"

—এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল বলিয়া তথাকথিত আধ্যাত্মিক সমস্যা-বিঘ্নবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার কোনও সহানুভূতিই ছিল না। আদি-পাতক, পাপোৎপত্তির হেতু বা অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি প্রহেলিকাময়ী প্রশ্নমালা তাঁহার নিকট আত্মস্বরূপের—"mumps and measles and whooping coughs—" বলিয়া পরিগণিত ছিল; তিনি তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন

"A simple mind will not know these enemies."

প্রত্যেক পদার্থকেই ব্যষ্টি সমষ্টি, কার্য্যকারণ এবং ভাষা ও ভাবের পারম্পর্য্য সম্বন্ধানুসারিনী দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দর্শন করিবার অপ্রতিহত ও নিত্যস্থায়ী প্রবৃত্তি, ইমার্সন্-মনের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। যাহা কিছু কোনও এক বৃহৎ সম্বন্ধের দ্যোতক, তাহাই তাঁহার পক্ষে আকর্ষণের বস্তু। মানবজাতিকে সৌরজগতের সহিত এক অচ্ছেদ্য গোত্রবন্ধনে বদ্ধ করে (— 'tied man"—) বলিয়া খগোল-বিদ্যা তাঁহার এত প্রিয় ছিল। "Instead of an isolated beggar, the farthest star felt him, and he felt the star."
জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডকৃত বর্ত্তুলক্ষেত্র, তাঁহাকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঞ্চারমার্গের উদ্দীপনা করিয়া দেয়। তদীয় সুহৃদ্-প্রেরিত পত্রাবলীর সুদীর্ঘ অবকাশসময়গুলি তাঁহাকে অধীর ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিলেও—"but that they savour always of eternity"—তাঁহার জন্য, দেশ ও কালের অতীত এক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বন্ধুত্বের শুভসংবাদ বহন করিয়া আনিত। "circles" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সূচনাও, তিনি তাঁহার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের সহিতই করিয়াছেন।

—"The eye is the first circle, the horizon which it forms is the second, and throughout nature this primary figure is repeated without end.' যাহার কেন্দ্র সর্ব্বত্রই অবস্থিত কিন্তু কোথাও পরিধি নাই এরূপ একটী বৃত্ত রূপে সাধু Augustine যে ঐশী প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তাহারই ইঙ্গিত

—তাহারই বাহ্য প্রতীক সন্দর্শন করিয়াছেন। এই মহান্ ভাবের জ্যোতিঃ তাঁহার আত্মাকন্দর এরূপ সমুদ্ভাসিত করিয়া ফেলিত যে, উহা মানস-পটে গৃহীত প্রত্যেক পদার্থদ্বারাই প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিত। সুতরাং সামান্য ত্রাসরেণুর ন্যায় নগণ্য ও ক্ষুদ্রতম বস্তুনিচয়ও তাঁহার প্রাণে **নিত্য** ও **অনন্তের** ভাব এইরূপে জাগাইয়া তুলিত। পরমাত্মা 'oversoul' হইতে 'কৃষিব্যবসায়' পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয়ই তাঁহার প্রসঙ্গ বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রসঙ্গের বিষয় যাহাই হউক না কেন, তাহার নিজের প্রিয় ভাষায় বলিতে গেলে তিনি তাঁহার সন্দর্ভ শকটকে প্রবল আকর্ষণে কোনও এক নক্ষত্রের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে সমুপস্থাপিত করেন 'hitches his wagon to a star"—এবং আধ্যাত্মিক আলোক-প্রবাহে তাঁহার অতি সাধারণ বিষয়টীকেও জ্যোৎস্নাবিধৌত করিয়া লয়েন।

সেই লোক-লোচনান্তরালস্থিত অদৃশ্য চৈতন্য-সত্তার উদ্দীপন ব্যতীত ইমার্সনের-নিকট জড় দৃশ্যপ্রপঞ্চের কোনও 'প্রতিষ্ঠানতা' (finality) ছিল না। জীবনের দৈনন্দিন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার সমূহকেও তিনি আধ্যাত্মিক সত্যালোকে ব্যাখ্যা করিতেন। পণ্যজীবের সঞ্চয়নিষ্ঠা, তাঁহার নিকট আত্মার সঞ্চয়শীলতার অমার্জ্জিত ও অস্ফুট প্রতীক—"a coarse symbol of the soul's economy. It is to spend for power and not for pleasure. It is to invest income; that is to say, to take up particulars into generals; days into integral, eras,—literary, emotive, practical,—of its life, and still to ascend in its investment."

যে সকল স্ত্রী ও পুরুষের আকার প্রকার, হাব-ভাব, ভাষা ও আচার ব্যবহার তাঁহাকে আকর্ষণ করিত তৎসমুদায়ই তাঁহার নিকট "a largeness of suggestion"—ভাবের বিশালতাব্যঞ্জক ছিল এবং তৎসমুদায়ই—"carry a certain grandeur like time and justice."—কাল ও ন্যায়পরতার ন্যায় কোনও এক অভাবনীয় মহত্ত্ব-দ্যোতক ছিল। প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার নিকট দ্যোতক (Suggestive)

এবং প্রতীকযুক্ত (Symbolic) বলিয়া বোধ হইত। প্রত্যেক বৃত্তের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-ক্ষেত্রস্বরূপ অপর এক বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে, এই তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে ভূমার অপ্রাপ্যত্ব জাগাইয়া তুলিত ;—

"The moral fact of the Unattainable, the flying Perect, around which the hands of man can never meet."

ইহজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতানিচয় তাঁহার নিকট পরলোকের ভাবী শুভাশীষপূর্ণ অভিজ্ঞতার পূর্ব্বাস্বাদ ও নিশ্চয়তাজ্ঞাপক-স্বরূপ ছিল বলিয়া, তিনি বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের আলোকে দর্শন করিতেন। তাঁহার মতে, Milton পূর্ব্বাহ্নেই Swedenborg এর ভাবের ভবিষ্যৎ প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

"What if earth
Be but the shadow of heaven and things therein,
Each to the other like, more than on Earth is thought?

এই ভাব তাঁহার চিন্তাপ্রণালীতে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত বলিয়া Swedenborg এর প্রতিভাকে তিনি এত সহানুভূতির সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার নিকট পরমার্থিক বা আধ্যাত্মিক জগতেরই মাত্র সত্তা আছে দৃশ্যমান বাহ্যজগৎ, দর্পণ প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় উক্ত মৌলিক বাস্তবতার প্রতিকৃতি, উক্ত কারণের কার্য্য এবং পরমসত্তার আভাস মাত্র। প্রত্যেক প্রাকৃত পদার্থের সহিত কোনও এক বিশেষ অতিপ্রাকৃত ঐশীতত্ত্বের সংযোজন ব্যাপারে তিনি কিন্তু Swedenborg এর প্রতিবাদ করিয়াছেন; কারণ তিনি বলেন,—

"—each individual symbol plays innumerable parts," and "in the transmission of the heavenly waters, every hose fits every hydrant."

বাহ্যজগতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সারবত্তার প্রতি ইমার্সনের সুগভীর অনুরাগ, তাঁহার Shakespeare এর সমালোচনায় বিশেষভাবে
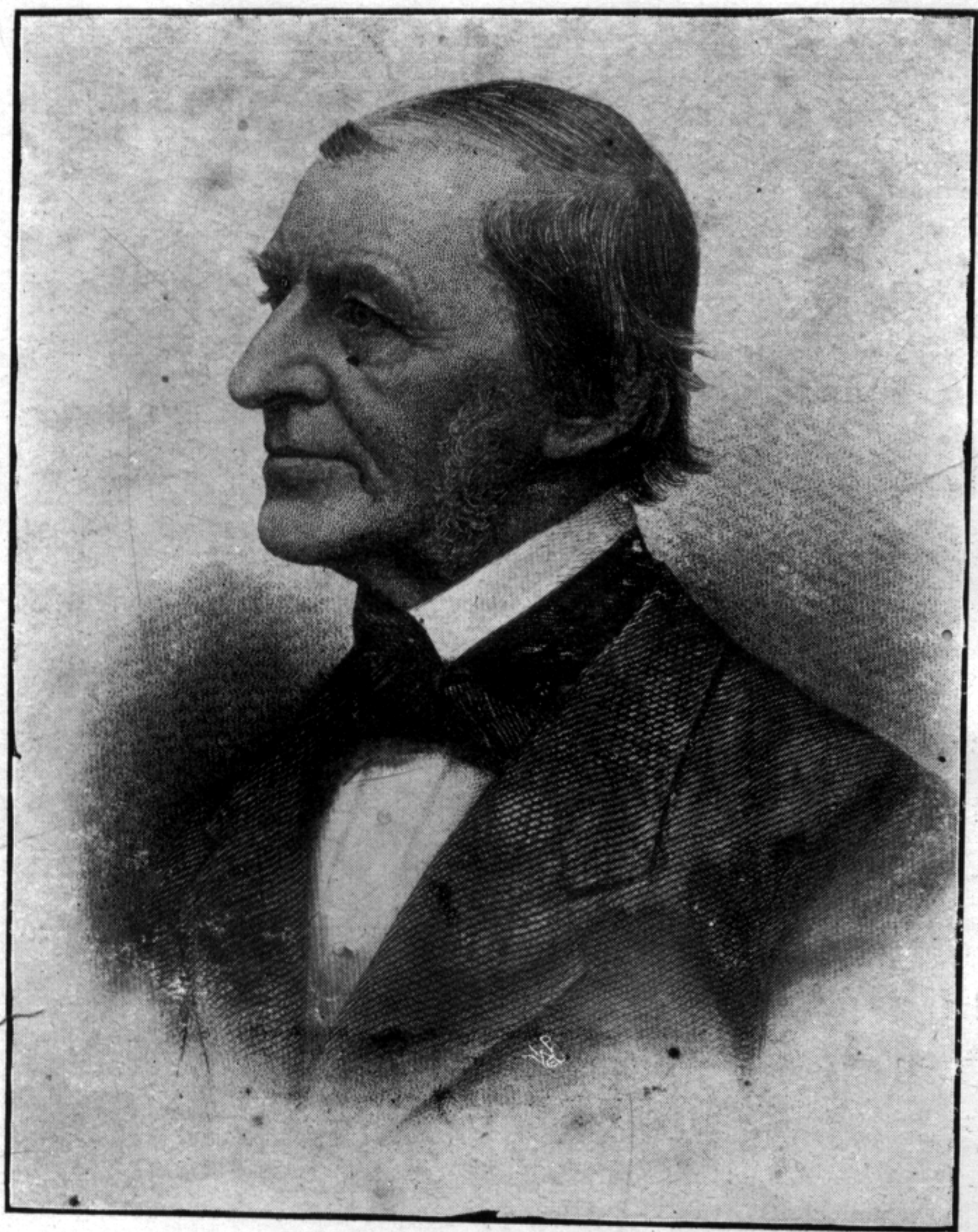
এমার্সন।

পরিস্ফুট হইয়াছে। Shakespeare সম্বন্ধে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে তিনি আধ্যাত্মিক রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনে বা উচ্চতর সোপানাধিরোহণে যত্নশীল না হইয়া একমাত্র বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য লইয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন। Shakespeare সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তপ্রচার যে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নাট্যকারের চাতুর্য্যময়ী প্রতিভা যে, সে কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে, তাহা তিনি হয় ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ইমার্সনের পক্ষে বস্তুতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যান সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ—

'it is a leaven that leaveneth all his thoughts.' ইমার্সন ও কার্লাইলের চরিত্রগত সাধারণ বিশেষত্বের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তাঁহারা উভয়েই অনন্তের সর্ব্বব্যাপকতার অনুভূতি ও অন্তঃকরণে অচল দৃঢ় বিশ্বাসকেই পরম সত্তা বলিয়া জানিতেন। সঙ্গীত, এক জনকে অনন্তের সমীপবর্ত্তী করিয়া দেয়, লাবণ্য-পিচ্ছল সুন্দর মুখচ্ছবি, অপরের নিকট বিশ্ব-রহস্যের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। একজন অর্ণবপোতকে স্কটদেশীয় কর্ম্মকারের বিশ্বসঞ্চরণশীল সাগরগামী ভাবনিবহ স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন, অপরে আবার পোতনির্ম্মাতাকেই বাস্তব-পোতরূপে ('true ship') ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে প্রত্যেক বস্তুকেই ভাবে বিশ্লিষ্ট এবং প্রত্যেক পদার্থকেই ব্যতিরেক-পর্য্যায়ে উহাদিগের বিকাশের মূল-কারণ—অন্তঃকরণে পরিণমিত করিয়া থাকেন। রসায়ন-শাস্ত্র, উদ্ভিদ্, ধাতু ও জীব জন্তু ইহারা সকলেই তাঁহাদিগের নিকট শ্রীভগবানের অমৃতময়ী বাণী।

অনন্তের প্রতি এই প্রকার জীবন্ত বিশ্বাস, অপ্রত্যক্ষের বাস্তবতায় এই প্রকার প্রযোজক (insistent) ভাব, ইমার্সনকে একজন মহীয়ান্ রহস্যবাদী (Mystic) করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। Jowett বলেন -

"By mysticism we mean not the extravagance of an erring fancy, but the concentration of reason in feeling,

the enthusiastic love of the Good, the True, the One, the sense of the infinity of knowledge and of the marvel of the human faculties." ইহাতে আরও কিছু সংযোজন আবশ্যক,—'He is the mystic to whom the invisible is more real than the visible, who is haunted and waylaid by the thought of the Unseen, who yearns for the Infinite with a passionate yearning. It is mysticism to see more than most men into the depths of life, into the hidden things of the Universe.' ইমার্সন বলেন,—"Men live on the brink of mysteries and harmonies into which they never enter and with their hand on the door-latch they died outside." কিন্তু এই বাক্যাবলীর লেখক বহির্ভাগে জীবন ত্যাগ না করিয়া বিশ্ব-ছন্দের ঐক্যলয়ে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এইকারণেই রহস্য-বাদ তাঁহার নিকট এত মাধুর্য্য ও আকর্ষণের বিষয় ছিল। লণ্ডন নগরী কল্পনার প্রসারে তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের স্থান হইবার কারণ এই যে,—in such a vast variety of people and conditions we can believe there is room for persons of romantic character to exist, and that the poet, the mystsic, the hero, may hope to confront their counter-parts. সাধারণতঃ সুইডেনবর্গীয় সম্প্রদায়, মহাত্মা Æsop প্রবর্ত্তিত নীতি গ্রহণ না করিয়া কবল উহার নিবন্ধাংশ গ্রহণ করেন বলিয়া ইমার্সন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেও he finds them deeply interesting and thinks they must "contribute more than all other sects to the new faith which must arise out of all."

শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

অচেনা সুহৃদ্।

১

কেগো আমায় ডাকে !
হাওয়ার মতন, না জানি কোন্
কুঞ্জবনে থাকে !
ডাক্‌লে ত তার পাইনা সাড়া,
কে উদাসীন এমন ধারা,
রয়না দূরে, পাছে ঘুরে,
জড়ায় মায়ার পাকে,
নিরালা কোন্ নিলয় থেকে
কেগো আমায় ডাকে !

২

'নাই সে কাছে' 'নাই সে কাছে'
ভাবি যখন তা'রে,
কেমনে, নবীন রবির কিরণ মাঝে
দেখায় আপনারে !
সহসা, মেঘ ভাঙ্গা জোছনার মত,
এসে, ভাঙ্গে আমার মৌন ব্রত,
বিশ্ব প্লাবন কে সে আমার
খুঁজ্‌ব কোথায় তাকে !
চিনি নাইত নিমেষ তরে,
আড়াল থেকে ডাকে !
আমি, মলিন মুখে ফিরাই আঁখি
যখন অভিমানে,
কাছে সে, ছায়ার মত দাঁড়ায় কখন
কেউ তা নাহি জানে !

বারে বারে বাজায় সে বীণ.
"তিলেক আমি নই উদাসীন,"
লুকিয়ে কোন্ শেষ বরষার
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে!
ভেবে' ভেবে' সারা হলেম
কে সে আমায় ডাকে!

শ্রীমতীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

ধর্ম্মের আদি ও অভিব্যক্তি।

মানবত্ব ও ধর্ম্ম অবিছিন্ন সম্বন্ধে গ্রথিত। যেখানেই চিন্তা ও ধারণা-শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্য দৃষ্ট হয় সেই খানেই ধর্ম্ম কোনও না কোনও রূপে বর্ত্তমান। যখন ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হয় নাই, যখন মানবের বিচার-বুদ্ধি নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল সেই সময়েও তাহার ভাব ও ধারণার অভ্যন্তরে ধর্ম্মভাবের উপাদান লুক্কায়িত ছিল। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানব নিজকে তুলনা করিয়া দেখিতে পায় সে কত ক্ষুদ্র, কত দুর্ব্বল। দুর্ব্বল স্বভাবতঃই সবলের সহায়তা অনুসন্ধান করে, মানুষও এই কারণে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে ব্যগ্র হয়; তাহার ধর্ম্ম তাহাকে এমন কিছু দেখাইয়া দেয় যেখানে সে তাহার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা নিবেদন করিয়া, যেখানে সে তাহার প্রাণের বেদনা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। বর্ত্তমান জগতে আমরা বহুবিধ ধর্ম্ম দেখিতে পাই, এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই বহুবিধ ধর্ম্মের আদি কোথায়? কোন্ দুর্জ্ঞেয় মনোবৃত্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে মনুষ্যকে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রণোদিত করিয়াছে? এমন কোনও সাধারণ ধর্ম্ম আছে কি না যাহা সকল ধর্ম্মেরই আদিভূত বলা যাইতে পারে? এবং কোথায়ই বা ধর্ম্মের চরম অভিব্যক্তি ও পরিণতি?

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ধর্ম্মের আদি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে সকল

উত্তর দিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম অতি পবিত্র ও মহদ্ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে এই ধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছে, সংক্ষেপে আমরা ইহাকে প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ বাদ (Theory of primitive Revelation) বলিব। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম অতি নিকৃষ্টভাবে আরব্ধ হইয়া কালক্রমে অনুশীলনের সহিত ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাকে আমরা ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ বাদ (Theory of Evolution) বলিব।

প্রথম উত্তর অর্থাৎ প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ-বাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এই মতানুসারে ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃতি এবং ইচ্ছা আদিতে মানুষের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং আদিতেই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। সমস্ত Revealed Religion ই এই মতের পোষকতা করেন। বেদ অনাদি ও সত্য-ধর্ম্মপ্রকাশক এবং কালক্রমে লোক সমূহ বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্ম হইতে পতিত হয় ও নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে এই মতও প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ-বাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং দর্শন বা বাক্যের দ্বারা মনুষ্যের নিকট আত্মস্বরূপ ও আত্মাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ মতানুসারে নিতান্ত মনুষ্যোচিত কার্য্য-কলাপও ঈশ্বরে আরোপিত করা হয়; সুতরাং এইমত কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অন্ততঃ ইহাও বলা হইয়া থাকে যে ঈশ্বর আদিতে মনুষ্যের মনে ঐশ্বরিক ভাব নিহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং মনুষ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বাধ্য এবং চিন্তা করিবামাত্র তাহার মানস-পটে ধর্ম্মের অঙ্গ-সমূহ উদিত হয়। কিন্তু এখনও অনেক জাতি মনুষ্য দৃষ্ট হয় যাহাদের প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান একেবারেই নাই অথবা থাকিলেও তাহা অতি নিকৃষ্ট ধরণের। যাহা মনুষ্যের স্বভাবগত, কালক্রমে তাহার অধঃ-পতন বা লোপ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে মানুষ কালক্রমে পাপের বশবর্ত্তী হইয়া এই ঈশ্বর-জ্ঞান হারাইয়াছে

কিন্তু এই উত্তর নিতান্ত অসার। যাহা প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য-স্বভাব-গত তাহা নিঃসন্দেহ প্রত্যেক মনুষ্যে বিরাজ করিবে। একজন লোক পাপী হইলে অন্যে কেন তাহার স্বভাবগত দিব্যজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইবে? সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ-বাদ সন্তোষজনক নহে।

এক্ষণে ক্রমবিকাশ-বাদ সমালোচনা করা যাউক। জগতে সমস্ত পদার্থই যে ক্রমোন্নতির অধীন ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বিপুল বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে ক্রমোন্নতিই সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত। একদিনে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি সাধিত হয় ইহা বিশ্ব-পাতার ইচ্ছা নয়। সুতরাং ধর্ম্মের ও যে ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। আধুনিক সভ্য জগতে প্রথমে লামার্ক (Lamarck) এবং ডারউইন (Darwin) এই ক্রমোন্নতি-বাদ প্রবর্ত্তিত করেন কিন্তু তাঁহাদের ক্রমোন্নতি-বাদ নির্ভুল নহে। তাঁহারা বলেন "বিশেষ" (Particular) সমূহের সংঘর্ষে ও সমবায়ে "সামান্য" (general) উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "সামান্য"ই পূর্ব্ববর্ত্তী অবিকৃত সামান্য (Undetermined general Idea) হইতে বিকৃত বিশেষ (Determined Particular Individuals) উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে উদ্ভূত অভাব দূরী-ভূত করে। বিশেষতঃ—ডারউইন-প্রমুখ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ক্রমোন্নতি-বাদে ক্রম-বিকাশের কোনও কারণ-শক্তি (Internal motive force) স্বীকৃত হয় নাই।

অন্তর্নিহিত কারণ-শক্তি না থাকিলে ক্রমোন্নতি অনবরত এক লক্ষ্য অভিমুখে এবং একই নিয়মানুসারে হইতে পারে না। কিন্তু ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের আধিভৌতিক ক্রমোন্নতি-বাদে (Naturalistic or materialistic Evolution) এইরূপ কোনও আভ্যন্তরীন কারণ-শক্তি স্বীকৃত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে ক্রমোন্নতি অধিভৌতিক নহে, পরন্তু ইহা আধ্যাত্মিক (Teleological or Idealistic Evolution) এই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি-বাদই প্লেটো

(Plato) প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদিগের এবং হেগেল (Hegel) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের অভিমত। কোনও শক্তি নিজকে প্রকাশিত এবং সম্যক্ পরিণত করিবার জন্য বহুরূপে বিভক্ত হয়, এবং এই বহুত্বের ভিতর দিয়া পুনরায় এক সুসম্বদ্ধ ঐক্য উৎপাদিত হয়। এইরূপে প্রকৃত ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও এইরূপ আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথমে এক অব্যয়, অস্পর্শ, অরূপ, আত্মা ছিলেন।

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং'

হে সৌম্য, আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল আমি বহু হইব।

'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'

(ছন্দোগ্যোপনিষৎ)

এই বহুর উৎপত্তি কেন? বহু বিনা সেই একের অভিব্যক্তি হয় না; বহুত্ব হইতে পুনরায় ঐক্য, এবং **এই ঐক্যই একত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি**। সকল পদার্থই অনন্তভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনন্তভাবে অবস্থান করিয়া পুনরায় অনন্তভাবে মিশিতে চলিয়াছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

ধর্ম্ম-জগতেও এই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে ইহাই আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ও পরিণতি কিরূপে হইয়াছে দেখাইতে গিয়া অনেকে আধিভৌতিক ক্রমোন্নতির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ ২ বলেন আত্মীয়, বন্ধু বা পূর্ব্বপুরুষগণের মৃত্যুর পরেও তাহাদের অশরীরী অস্তিত্ব থাকে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আদিম মানব প্রথমে পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, পরে সমস্ত সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে পূজা করিত, এবং তাহাদের ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ মৃত কোনও পার্থিব ক্ষমতাশালী

শাসনকর্ত্তামাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ অডিন (Odin), জুপিটার (Jupiter), বিষ্ণু প্রভৃতির নামোল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই মত প্রথমে ইউহেমারাস্ (Euhemerus) প্রবর্ত্তিত করেন, পরে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) সমর্থন করেন। ইঁহারা বলেন এই পূর্ব্বপুরুষ-পূজা বা প্রেতপূজা (ancestor-worship) হইতেই সমস্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অনেক স্থলে এখনও পূর্ব্বপুরুষ-পূজা বিদ্যমান আছে এবং চীন, মধ্য আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এখনও ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে একমাত্র পূর্ব্বপুরুষ-পূজা হইতে জগতে অশেষবিধ এবং বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে? কিরূপে সমগ্র মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের একই প্রকার ইতিহাস হইতে পারে? এবং কিরূপেই বা বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রাথমিক দেবতাদিগের সম্বন্ধে প্রায় তুল্যরূপ ধ্যান ধারণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রাথমিক দেবতাদিগের নামও প্রায় একার্থ জ্ঞাপক। এই মতের ভিত্তি অর্থাৎ আধিভৌতিক ক্রমবিকাশবাদ যেমন ঐকদেশিক, এই মতও তদ্রূপ ঐকদেশিক ও অসম্পূর্ণ। ইহাতে ক্রমোন্নতির কারণ-শক্তি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করা হয় নাই। সকল ধর্ম্মের আদিভূত সাধারণ মনোবৃত্তির অনুসন্ধান করা হয় নাই। পূর্ব্বপুরুষপূজা বা প্রেতপূজা ধর্ম্মের একটী শাখা হইতে পারে কিন্তু ইহা কখনও সর্ব্বধর্ম্মের আদিভূত হইতে পারে না।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের ভিতর এক প্রকার নিম্ন স্তরের ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। ইহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের টোটেম (Totem) পূজিত হইয়া থাকে। এই টোটেম কোনও বৃক্ষ বিশেষ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করে যে তাহারা তাহাদের টোটেম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাহাদের অস্তিত্ব ও শুভাশুভ এই টোটেমের কৃপার উপর নির্ভর করে। এই জন্য তাহারা কায়মনোবাক্যে তাহাদের টোটেমের পূজা করে। অষ্ট্রেলিয়া ও মধ্য আফ্রিকার কতি-

পয় স্থানে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট স্তরের ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। এই স্থানের অধিবাসিগণ কোনও অদ্ভুত বিস্ময়োদ্দীপক পদার্থ দেখিতে পাইলেই অজ্ঞাত ভীতিপ্রযুক্ত ইহার পূজা করে। কখনও কখনও তাহারা নিজেরাই কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই পদার্থকে ফেটিশ্ (Fetish) বলা হইয়া থাকে। এই ফেটিশ ধর্ম্ম ও টোটেম ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের আদি ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেত পূজা সমীক্ষণ কালে আমরা ইহার যে যে অভাব দেখাইয়াছি, এই দুই ধর্ম্মকে সর্ব্ব ধর্ম্মের আদিভূত বলিলেও তত্তদ্দোষ স্পর্শ করে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে কোনও ধর্ম্মবিশেষ হইতে সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে আধিভৌতিক ক্রমবিকাশ-বাদিগণ বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ-বাদ যুক্তিসঙ্গত নহে। এক্ষণে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশবাদানুযায়ী ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের মূলে একটি অন্তর্নিহিত কারণ-শক্তি idea) থাকা আবশ্যক। ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মূলে অসীম অনন্তের উপলব্ধিই এই অন্তর্নিহিত কারণ-শক্তি। অসীম ও সসীম, অনন্ত ও সান্ত আপেক্ষিক (Relative) সম্বন্ধ বিশিষ্ট। সসীম জ্ঞান হইতে হইলে অসীম জ্ঞানের প্রয়োজন। মনুষ্য প্রতিমুহূর্ত্তে নিজকে এবং প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থকেই সান্ত, পরিণামী ও বিকারশীল বলিয়া বুঝিতেছে, কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক অসীম, অনন্ত, অপরিণামী ও অবিকারীর অনুভূতি হইতেছে। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক, বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য, মহামতি হেগেল (Hegel) ও তাঁহার শিষ্যগণ অকাট্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে এই প্রকৃত অসীমেরই অস্তিত্ব আছে, ইহার উপলব্ধি অতি স্বাভাবিক এবং সসীমের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অসীমের ও উপলব্ধি হয়। সসীমের জ্ঞান অসীমের জ্ঞানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এমন কি অসীমের উপলব্ধি না হইলে সসীমের গণ্ডী ও সীমাগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানোন্নতির প্রথম

অবস্থায় পরিস্ফুটরূপে অসীমের ধারণা করা একান্তই অসম্ভব। বস্তুতঃ ইহা বহু তর্ক-বিতর্কের, বহু গবেষণার ফলস্বরূপ। কিন্তু ইহা প্রথম হইতেই মনুষ্যের মনে আঙ্কুরিক ও অপরিনত (Latent) অবস্থায় ছিল, যেহেতু মনুষ্য বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব এবং এই অসীমের ধারণা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত।

মানব, জ্ঞানের আরম্ভ হইতেই নিগূঢ় অসীমতত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছে—ইহাকে নানা রকমে ধারণা করিয়া পরিষ্কাররূপে জ্ঞানের আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানব-সমাজ বিভিন্ন উপায়ে অসীমের ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অসীমের উপলব্ধি করিতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে। সুতরাং অসীমের অনুসন্ধানের বিভিন্ন চেষ্টাসমূহই বিভিন্ন ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। অসীমের উপলব্ধির ক্রমবিকাশই ধর্ম্মের ইতিহাস।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে ধর্ম্মের আদি কোথায়। প্রথম প্রথম মনুষ্য নিশ্চয়ই প্রকৃত অসীমের ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অবস্থায় যাহা কিছু তাহার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী বা অল্পতর সীমাবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে তাহাই সে অসীম বলিয়া ধারণা করিয়াছে। সাধারণতঃ সমস্ত মানবজাতির নিকট প্রাকৃতিক বৃহৎ ঘটনাবলীই ঐরূপ অসীম বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অহোরাত্র, ঋতু, সম্বৎসর, বায়ু, ভূমিকম্প, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, জ্যোতিস্কমণ্ডলী এবং অন্যান্য আশ্চর্য্যজনক প্রকৃতিক ঘটনাবলী প্রথমেই মনুষ্যের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এই সকলকেই সে অসীম বলিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে মনুষ্য বহুকাল জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে এবং এখনও করে। প্রাচীন সভ্যতার আকরস্থল ভারতবর্ষ, মিসর, গ্রীস প্রকৃতি স্থানে ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাষাবিদ্‌গণ ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে ভিন্ন ধর্ম্মের দেবতাগণের নাম ও অনেকাংশে গুণাবলী তুল্যার্থ-জ্ঞাপক। ইহার

অন্যতম কারণ এই যে প্রাকৃতিক ঘটনা-নিচয় হইতেই এই সমস্ত দেবতাগণের জন্ম। ধাতু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে জিউজ, জুপিটার, জিও (Zeus, Jupiter, Zio) অর্থে যাহা বুঝায় "দৌঃ"শব্দে ও তাহাই বুঝায় (অর্থাৎ "আকাশ" বুঝায়)। ডিউস্, ডিভাস্ (Deus, Divus) অর্থে এবং "দেবঃ" অর্থে "উজ্জ্বল" (Shining) বুঝায় এইরূপ ধর্ম্ম ও দেবতা বাচক বহু শব্দের একতা দৃষ্ট হয়।

হিন্দুগণ যখন বিশেষরূপে এই সকল দেবতাদিগেতে ব্রহ্ম আরোপণ করিয়াছিলেন তখনও বোধ হয় যেন এই দেবতাদিগের প্রাথমিক ক্ষমতা লুপ্ত হয় নাই।

'স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কলোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ'

কৈবল্যোপনিষৎ।

'ত্বমেব বরুণো বায়ু স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বং নিশাকরঃ'

মৈত্রেয়োপনিষৎ।

'ত্বমর্ক স্ত্বং সোম স্ত্বমসি পবন স্ত্বং হুতবহঃ'

মহিম্ন স্তোত্র।

কিন্তু হিন্দুঋষিগণ অচিরেই বুঝিয়াছিলেন যে চন্দ্র সূর্য্যের সহিত ব্রহ্মের তুলনাই হয় না

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
ত্বমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি,"

কঠোপনিষৎ ২।৫।১৫।

সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংসি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য দদমুপাসতে ॥"

কেনোপনিষৎ ১।৬

চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, চক্ষু তাঁহার শক্তি দ্বারা দেখিতে

পায়। লোকে এই যে পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

এখন আমরা দেখিব প্রকৃত অসীমের স্বরূপ কি? এবং কোন্ ধর্ম্মেই বা এই প্রকৃত অসীমের চরম অভিব্যক্তি?

বহু দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অভিমত এই যে অসীম হইতে যাবতীয় সসীমের উৎপত্তি, অসীম সসীম হইতে স্বতন্ত্র। বহুদ্বৈতবাদী দর্শন-শাস্ত্র অসীম ও সসীম, ব্রহ্ম ও জীব এতদুভয়ের ভেদ স্থাপন করিয়া অসংখ্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও পাশ্চাত্য হেগেলিয়ান্ দর্শন (Hegelian Philosophy) এই বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বেদান্ত বলিতেছেন "জীবো ব্রহ্ম নাপরঃ।" হেগেলও বলিতেছেন সসীম জীব হইতে পৃথক্ অস্তিত্ববিশিষ্ট অসীম "মিথ্যা অসীম" ("False Infinte") মাত্র। সসীম জীবজগৎ হইতে অসীম অনন্ত কখনও পৃথক্ হইতে পারে না, এইরূপ স্বতন্ত্র অসীম এক প্রকার নির্ব্বিশিষ্টতত্ত্ব (Abstract Reality) সুতরাং উহা স্ববিরোধী (Self contradictory) উহা সহজ মানস ভ্রম মাত্র, নির্ব্বিশিষ্ট মানসিক কল্পনাবিশেষে বাস্তবতা আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। জগদ্গৌরব হেগেল (Hegel) অতি সারবান অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের দ্বারা এই তথ্য সমর্থন করিয়াছেন, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। হেগেল বলেন অসীম ও সসীম পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। এই অসীমই প্রকৃত সত্য তত্ত্ব, ইহা স্বপ্রকাশিত হইবার জন্য সমগ্র সসীম জীব ও জড়জগতের সৃষ্টি। এই অসীম হইতেই সমস্ত সসীম জগৎ সুশৃঙ্খলিত ও সুস্থিত, এই সসীমের সহায়তাদ্বারা অসীম পূর্ণ সত্তাবিশিষ্ট। হেগেলের এই মতকে (Theory of correlativity) পরস্পর-সম্বদ্ধ-বাদ বলা যাইতে পারে। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ঠিক এই বাদ ঘোষণা করিতেছেন, যে অসীমকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলিতেছেন, হেগেল তাহাকে "অ্যাবসলিউট (absolute) বলিতেছেন। শ্রীরামানুজ "শ্রীভাষ্য" নামে বেদান্ত সূত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছেন, ইহাকে রামানুজদর্শন বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। ইহাই বেদান্ত সূত্রের মুখ্যার্থ এবং এই রামানুজ-দর্শনই দর্শনশাস্ত্রের চরম পরিণতি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলেন ব্রহ্ম—জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সমস্ত একত্র করিয়া একটী। সারাংশে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ তবে প্রকাশাংশে ভেদ আছে বটে। আমাদের দেহ অসংখ্য জীবাণুর বাসস্থান এবং সেই প্রত্যেক জীবাণুর প্রাণ যেমন আমারই প্রাণে অনুপ্রাণিত অথচ যেমন প্রত্যেক জীবাণু আমাহইতে ভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্মই সমস্ত জীবের সৃষ্টিস্থিতির কারণ, অথচ জীবের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যেমন আমার দেহ ও প্রাণ এই সমস্ত জীবাণুর দেহ ও প্রাণের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ এই সমস্ত জীব হইতে ব্রহ্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। অতএব আমরা দেখিলাম যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও পরস্পর সম্বন্ধবাদ (theory of Correlativity) অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকৃত অসীমের সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তবে ইহাই আমাদের প্রকৃত গৌরবের বিষয় যে সভ্যতাদৃপ্ত পাশ্চাত্য জগতের শিরোমণি হেগেলের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বন্ধনের কৌশল পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না, এবং যখন তাঁহারা বৃক্ষ-শির ভিন্ন অন্য কোনও বাসস্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তখনই আমাদের আর্য্যঋষিগণ নির্ভীকচিত্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন :-

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৮

ওহে মানব! আর ভয় নাই, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি সূর্য্যপ্রভ, অজ্ঞানের পরপারস্থ, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পওয়া যায়। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। ইহা আমাদের কথা নহে. ইহা পণ্ডিতপ্রবর পাশ্চাত্য দার্শনিক ভট্ট মোক্ষমূলারের নিজের কথা। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বলিয়াছেন—আমার

সমস্ত জীবনে বেদান্তের ন্যায় মহৎ জিনিস আমি পাঠ করি নাই, ইহা আমার জীবনের ও মরণের শান্তিস্থল (There is no study so elevating as that of the vedantas. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death).

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পারেন যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য উল্লেখ না করিয়া আমরা শ্রীরামানুজের ভাষ্যকেই দর্শনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি বলিলাম কেন? ইহার উত্তরে আমরা এবই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ভগবান শঙ্করের ভাষ্য একটী স্বতন্ত্র দর্শন বিশেষ, ইহা বেদান্ত-সূত্রের মুখ্যার্থ নহে। ভগবান শঙ্করের দর্শনে পূর্ব্বোক্ত জীব ও ব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হয় নাই। এইরূপ না হইবার কতকগুলি কারণ আছে। এই সকল কারণ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধ-দর্শনের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি এই ভুবনবিজয়ী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-দর্শনের মহাশূন্য স্থানে তিনি এক অদ্বিতীয়, অসীম, অবিকারী, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের সংস্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অধিকন্তু, উপনিষদের কতক শ্লোক দ্বৈতবাদ প্রচারী এবং কতক শ্লোক অদ্বৈতবাদ প্রচারী। সমগ্র উপনিষদ্ এক বন্ধনে গ্রথিত করিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; এইজন্য তাঁহার কুশাগ্রতীক্ষ্মমেধাপ্রসূত অজেয় ভাষ্য অনেক স্থলে বেদান্ত-সূত্রের কষ্টার্থ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা উপনিষদ্-সমূহের অত্যুত্তম সামঞ্জস্য। সুতরাং তাঁহার দর্শনকে বেদান্ত-ভাষ্য বলা অপেক্ষা পৃথক্‌ভাবে শঙ্করদর্শন বলাই ভাল বোধ হয়। পদ্মপুরাণকার শঙ্কর দর্শনকে মায়াবাদ ও অসচ্ছাস্ত্র বলিয়া গালি দিয়াছেন:—

"মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥"

(মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন) হে দেবি! মায়াবাদ অসৎ

শাস্ত্র, যাহাকে সজ্জনেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র কহেন, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহার বিধান করিয়াছি। উদ্ধৃত বাক্য সুধীগণের নিকট নিতান্ত হাস্যকর ও ধৃষ্টতাব্যঞ্জক বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ভগবান শঙ্করের দর্শন এত সহজে উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তবে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না ইহা বলা এক কথা আর জীবের কোনই সত্তা থাকে না ইহা বলা আর এক কথা। ভগবান শঙ্করের দর্শনকে মায়াবাদ বলা অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ ও একেশ্বরবাদ বলাই ভাল বোধ হয়। যাহা হউক ভগবান শঙ্করাচার্য্যের দর্শন সমালোচনা আমরা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে করি। তবে ইহাই আমাদের মত যে ভগবান শঙ্কর যাহা অপরিস্ফুট রাখিয়াছেন শ্রীরামানুজ তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই জন্য "পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন" বলেন—রামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তত্ত্বত্রয় অঙ্গীকার করিয়া ভগবান শঙ্করাচার্যের মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন।

ভগবান শঙ্কর সম্পূর্ণরূপ দ্বৈতবাদ-বিরোধী হইলে কখনও গঙ্গা-স্তোত্র, বিষ্ণুস্তোত্র প্রভৃতি প্রণয়ন করিতে ক্লেশ স্বীকার করিতেন না, কারণ দ্বৈতভাব না থাকিলে কে কাহার স্তুতি করিবে? দর্শন, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন স্পর্শন ও মনন করিতে হইলে কর্ত্তা ও কর্ম্ম (Subject and object) উভয়েরই অস্তিত্ব প্রয়োজন। দুই না হইলে কে কাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবে?

"উদ্ধৃত নগ নগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্র শশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্করঃ॥"

বিষ্ণুস্তোত্র (৪)

হে গোবর্দ্ধনধারি, হে উপেন্দ্র, হে দানবকুলনিসূদন, হে শশিসূর্য্য-নেত্র, সর্ব্বোপরি প্রভুত্বসম্পন্ন তুমি দৃষ্টিগোচর হইলে (দুই না থাকিলে কে কাহাকে দেখিবে?) ভববন্ধন মোচনের আর কি

আমরা দেখিলাম যে বেদান্তদর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ ও হেগেলিয়ান দর্শনের পরস্পর-সম্বন্ধ-বাদ দর্শন-শাস্ত্রের চরম পরিণতি, কারণ এতদুভয়েই প্রকৃত অসীমের যথার্থ স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে কোন্ ধর্ম্মবিশেষে এই অসীমের উপলব্ধি সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত, কোন্ ধর্ম্মবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত সম্বন্ধ প্রকটিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পাঁচটী প্রধান শাখা বিদ্যমান আছে—বৈষ্ণব শাক্ত, শৈব, সৌর ও গানপত্য। বিজাতীয় প্রায় সমস্ত ধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্মের শেষোক্ত চারিটি বিভাগে আমরা দেখিতে পাই যে ঈশ্বর ও জীব সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। জীব ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহার কামনা স্বর্গসুখ বা (খুববেশী হইলে) মুক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল ধর্ম্মে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বাদের নিগূঢ়তত্ত্ব অবধারিত হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম কি বলেন? ঈশ্বরের সহিত জীবের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, প্রেমের দ্বারাই এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পূর্ণ বিকশিত হইয়া অতুলনীয় সুখোৎপাদন করে। এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম মতে ঈশ্বরের সহিত প্রেমেই সারবস্তু।

"ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

যত দিন পিশাচীস্বরূপা নিজেন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা ও আত্মপ্রীতিরূপা মুক্তির স্পৃহা হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে ততদিন ভক্তিসুখ কিরূপে উদিত হইতে পারে?

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

শ্রীভাগবৎ ৩।২৯।১১

(ভগবান কহিলেন) সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস, সার্ষ্টি (আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য, (আমার পার্ষদত্ব) সারূপ্য (আমার সমান রূপ) একত্ব (সাযুজ্য মুক্তি) এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিলেও আমার নিজ জনেরা (কৃষ্ণভক্তগণ) আমার সেবা ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

ইহা যে শুধু উদার বাক্য তাহা নহে, ইহাতে প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব অবিকৃতরূপে বর্ত্তমান। ভক্ত অবিরত ভগবানের সহিত রমণপ্রয়াসী ইহাই বিশেষ্টাদ্বৈতবাদ ও পরস্পরসম্বন্ধ-বাদের সার কথা। ইহাতে যে শুধু জীবাত্মার আত্মবিকাশ ও সুখ তাহা নহে, ইহাতে পরমাত্মারও আত্মস্ফূর্ত্তি ও সুখ। এইকারণে ভগবানের প্রধানভক্তস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিরূপে পরিকীর্ত্তিতা। এই হ্লাদিনী-শক্তি সর্ব্বদাই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন। আরও উক্ত হইয়াছে।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজা
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা॥"

হে গোপিগণ, তোমাদের সহিত আমার মিলনঅ নিন্দনীয়। আমি যদি দেবতাদিগের আয়ু ধারণ করি তথাপি তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জ্জয় গেহ-শৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তাই তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিকার হউক।

মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। পরমব্রহ্ম কৃষ্ণের সহিত প্রেমময়ী রাধিকার শুভ সম্মিলনান্তর নিভৃত নিকুঞ্জবনে উভয়ে মিলিয়া নিত্য লীলা করেন। এই **যুগল মিলন** প্রকৃত পরস্পর সম্বন্ধ-বাদ (Theory of correlativity এই **যুগল মিলন** বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সার তথ্য।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম একাধারে হৃদয়-বুদ্ধি-মন-প্রাণ-তৃপ্তিকারিণী পীযূষনিঃস্যন্দিনী সুধা। বৈষ্ণবধর্ম্ম শুষ্ক শাস্ত্র নহে, ইহা পরম উপভোগের সামগ্রী, অথচ শ্রেষ্ঠ দর্শন-জ্ঞান-বিভূষিত। এই ভগবৎপ্রেম-রস কি পার্থিব কোনও রসের সহিত তুলিত হইতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে এই অপার্থিব রসকে কেহ কেহ কুৎসিত আদিরস বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া দেখেন

না যে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, পরিত্যাগ করিতে পারিলে সেই শূন্যহৃদয়োপরি” “মুরারি” সমাসীন হইয়া “মোহন বাঁশরী’র স্বরে প্রাণ মন বিমোহিত করেন। হে বৈষ্ণব কবিগণ! কেন তোমরা এই কৃষ্ণপ্রেম রসকে আদিরসের আচ্ছাদনে আবৃত করিয়াছিলে? বুঝিয়াছি ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব ইন্দ্রিয়দাস অমরা—আমাদের প্রতি ইহা তোমাদের সুতীব্র কশাঘাত! তোমরা এইরূপে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে চাও যে আমরা কি কদর্য্য কর্দ্দমে দিন রাত্রি হাবু ডুবু খাইতেছি! আধুনিক যুগের একজন প্রধান পাশ্চত্যসমাজ-সংস্কারক আডিসন ঠিক এই প্রণালীতে দোষীর দোষ সংশোধন করিতেন। তিনি প্রথমে দোষীর নিন্দা করিতেন, তাহাতে অকৃত-কার্য্য হইলে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সহিত দোষীর দোষে সম্মতি দিতেন (“assented with civil leer”) ফলে দেষীব্যক্তি দোষের চরম সীমায় উপনীত হইয়া তাহার ব্যভিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত এবং তখন নিজকে সংশোধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। বৈষ্ণব কবিগণেরও বোধ হয় এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। আদিরসের আচ্ছাদনে এই অনির্ব্বর্ণনীয় কৃষ্ণপ্রেমরস আবৃত করিয়া প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সেবিগণের চিত্ত ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বিষ্ঠা ও চন্দনের পার্থক্য বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না, অচিরেই ইন্দ্রিয়সেবিগণ বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের চন্দনে বিষ্ঠাভ্রম হইয়াছে, এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়-সেবার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করাইয়া মনকে ভগবদ্‌রসের দিকে প্রধাবিত করানই এই মহানুভব বৈষ্ণব কবিগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীকালিদাস সেন।

পত্নীপণ।

যে দিন আফান্সি রাস্ত্রিগা মেরিণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ অভিবাদন পূর্ব্বক তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহিল এবং মেরিণা ও আভূমিপ্রণতা হইয়া তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিল, তাহার পর পূর্ণ একটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পরিণয় উৎসব শেষ হইতে না হইতেই বর তাহার অন্তরঙ্গ সহচগণের সহিত দুই-দিন দুই-রাত্রি-ব্যাপী এক উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদে মাতিয়া রহিল। পরে সেই প্রমোদ-রঙ্গের অবসান হইতে কাস্পিয়ান্ অঞ্চলে লুণ্ঠন কার্য্যে চলিয়া গেল। নবপরিনীতা অভাগী পত্নী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পতির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(২)

শীতের মধ্যভাগে একদিন সন্ধ্যার সময় কসাকগণ গ্রামের স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল। তাহারা সুরাপান করিতে করিতে স্ব স্ব অতীত বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, কেহ কেহ বা বীরত্বগাথা সঙ্গীত করিতেছিল। সহসা সকলেই নিস্তব্ধ! অদূরে মৃগয়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল, তাহারা উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অস্পষ্ট মিশ্র কোলাহলের পর বন্দুকের শব্দ, সানন্দ চীৎকারধ্বনি ও অভ্যর্থনা-সঙ্গীত স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল। কসাকগণ আহ্লাদে অধীর হইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং গ্রামের প্রধান রাজবর্ত্ম অভিমুখে ছুটীয়া চলিল। একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "আমাদের লোকেরা ফিরিয়া আসিয়াছে!"

তাহারা সত্বর আসিয়া গ্রাম্যমধ্যবর্ত্তী চত্বরে সমবেত হইল। রমণী-গণ সাহস করিয়া গৃহ ছাড়িয়া আসিতে পারিল না, বাতায়ন পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পরিজনবর্গের সুখদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আফান্সি চত্বর সম্মুখে উপনীত হইয়াই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল এবং নতজানু হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল। ভক্তিভরে ক্রুশ্ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া সে ভগবানকে ধন্যবাদ করিল এবং

দেশীয় প্রথা অনুসারে প্রীতিভরে ভূমিচুম্বন করিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া সে ভক্তিভরে চারিটী দিক লক্ষ্য করিয়া প্রণতি করিল এবং উচ্চ সুস্পষ্ট, মনোজ্ঞ স্বরে সমাগত বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল "সর্দ্দার গণ! বন্ধুগণ! জগদীশ্বর তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।" তাহার মুখশ্রী গম্ভীর গর্ব্বোৎফুল্ল।

তাহারা উত্তর করিল "আফান্সি! ভগবান্ তোমাকে ও শান্তিতে রাখুন। এবার কেমন হ'লো? প্রচুর মাল ঘরে আন্‌তে পেরেছত?"

"তা' তোমরা এসে স্বচক্ষে দেখ। ভাইসকল! লাভ এবার যথেষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু কি কষ্টটাই সহ্য ক'র্ত্তে হয়েছে! চিরকাল আমার তা' মনে থাকবে।"

এই বলিয়া স হস্ত সঞ্চালনে মন্থরগামী, ভারবাহী শকটগুলি দেখাইয়া দিল। ইহাই যথেষ্ট। গ্রামবাসিগণ অমনি অত্যন্ত কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং তাহাদের সামাজিক প্রথা-অনুসারে চুম্বন দ্বারা পরস্পরকে সানন্দে অভিনন্দন করিল। আগন্তুকদ স্যুগণ সাগ্রহে তাহাদের প্রবাস-বাসের বিস্তৃত বিবরণ দ্বারা সোৎসুক শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার গ্রামের অপরাংশে প্রেরিত হইল এবং প্রভাতকাল পর্য্যন্ত উহা নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রহরীগণ নিযুক্ত হইল।

অধিক রাত্রে আফান্সি তাহার অনাদৃত বিস্মৃত গৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু একাকী আসিল না, একজন অতি সুপুরুষ যুবাসহচরকে সঙ্গে করিয়া আনিল।

মেরিণার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আফান্সি মিলনের আনন্দে তাহাকে আবেগভরে বার বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল। যেন বহুদিনের অদর্শনে আজ তাহার প্রেমসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিয়াছে। কহিল "প্রিয়তমে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। আমরা অনেক ভাল ভাল জিনিষ নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছি। ইনি আমার বন্ধু মিথাইলো—আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন বাস কর্ব্বেন। চল এখন খাওয়া যাক্ গে', তা'রপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে হবে। আবার ভোর হ'লেই চত্বরে গিয়ে লুঠের মাল ভাগ ক'রে আনতে হ'বে।"

অভাগিনী মেরিণা মনে করিয়াছিল এবার সে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র কতকটা সুসংযত করিয়া লইবে। তাহার মদ্যপানের অসঙ্গত আসক্তি, দ্যূতক্রীড়ার উন্মাদ উত্তেজনা যথাসম্ভব মন্দীভূত করিয়া আনিবে। কিন্তু হায়! তাহার সে দুরাশা নৈরাশ্যসাগরে ডুবিয়া গেল। আফান্সি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিল, একখানি মূল্যবান শালে অঙ্গ আবৃত করিল, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাকচিক্যময় পাদুকা পরিধান করিল এবং একখানি মহার্হ তরবারি কটিবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া লইল। এইরূপ বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত হইয়া সে সখা মিখাইলোর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।

পূর্ব্বাহ্ন কাটিয়া গেল, অপরাহ্নও যায় যায়—সন্ধ্যা আগত প্রায় হইল। এমন সময়ে মিখাইলো মেরিণার স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসিল। আফান্সি বলিয়া পাঠাইয়াছে "মনে করিয়াছিলাম সকাল সকাল বাড়ী ফিরিব, কিন্তু খেলাটা বড় জমিয়া গিয়াছে সুতরাং যাইতে একটু রাত হইবে।" মিখাইলো আপনা হইতে আরও বলিল "তিনি আস্‌বেন কি? সারাদিন এত মদ খেয়েছেন যে আর তা'র নড়্‌বার ও শক্তি নাই।"

উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ঠিক এইরূপই ঘটিতে লাগিল। অভাগিনী পত্নী আর মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারিল না—মিখাইলোর নিকট প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতে ইচ্ছা করিল, মেরিণা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে কসাক পুরুষ রমণীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবে, বরং সে তাহার বন্ধুর আচরণেরই পোষকতা করিবে; কিন্তু তাহার সে ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মিখাইলো আবেগপূর্ণ স্বরে বলিয়া "উঠিল এ অতি জঘন্য আচরণ! আপনার ন্যায় এমন সুন্দরী গুণবতী পত্নীকে কোন্ পাষণ্ড বিস্মৃত হ'য়ে থাকৃতে পারে? সে কখনও আপনার স্বামীর যোগ্য হইতে পারে না। তা'কে পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে আসুন। তা'র নির্ম্মম পাশবিক আচরণের এই উপযুক্ত শাস্তি।" কিছুক্ষণ নীরব

থাকিয়া মিখাইলো পুনরায় উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমি তোমায় ভালবাসি মেরিণা! যে দিন প্রথম তোমার ঐ অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত কমনীয় মুখখানি আমার নয়নগোচর হ'য়েছে, সেই দিনই তোমায় ভালবেসেছি। তোমায় না পেলে আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।"

বিস্ময়বিমূঢ়া রমণী ভীত-চকিত-দৃষ্টিতে মিখাইলোর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। এই প্রথম একজন কসাক পুরুষ সাদরে, সমবেদনা-পূর্ণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিল। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি এক অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহার বক্ষের কলকব্জা গুলা একবার সবলে নাড়িয়া দিল। সে মুহূর্ত্তকাল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অশান্ত, দুর্ব্বল হৃদয় সংযত করিয়া সে মিখাইলোর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল—সে পাপ কথা আর তাহার শুনিতে প্রবৃত্তি হইল না।

পানোন্মত্ত কসাকগণ তখন বিকৃতকণ্ঠে স্বদেশসঙ্গীত গাইতেছিল—তাহাদের প্রমত্ত বিকট চীৎকারে বায়ুর স্তর পরিপূর্ণ।

(৩)

দিনমান অবসান হইয়াছে। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমনই সময়ে আজ সহসা আফান্সি গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে তখনও মাদকতার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান। আরক্ত চক্ষু তখনও অর্দ্ধনিমীলিত, নিষ্প্রভ নেশার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়াছে, এখন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ। সাধ্বী মেরিণা স্মিতমুখে স্বামীর অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল।

"প্রাণাধিক! এতক্ষণে দাসীর কথা মনে হ'ল?" সহসা পতির বিষাদ মলিন আঁধার মুখখানি দেখিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। প্রসারিত বাহু অবনত হইয়া পড়িল। কাতরকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "আফান্সি! কি হয়েছে?"

"মেরিণা! আমি দানিলোর সঙ্গে খেলায় সর্ব্বস্ব হেরেছি—তোমায় পর্য্যন্ত পণে হেরে গেছি।"

মেরিণা বজ্রাহতার ন্যায় স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। আফান্সি কি বলিল তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

আফান্সি আবার বলিল "শুন মেরিণা! যা বল্লেম্ তা সত্য,—কাল সকালে তাকে দু'শো ডকাট্ (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) দিতেই হ'বে। তোমার ভাল ভাল পোষাকগুলো কোথায় ?"

ধীর, শান্ত স্বরে মেরিণা বলিল "আফান্সি ! কি বল্‌ছ ?"

উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, পরুষ কণ্ঠে বলিল "কি বল্‌ছি ? বল্‌ছি—কাল সকালে তোমাকে চ'রে নিয়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা কর্‌বো আমি মেরিণাকে চাইনা। যে ইচ্ছা কর তা'কে কিন্‌তে পার।"

এ নিদারুণ শেল-সম বাক্য সাধ্বী পত্নীর কোমল হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। সে সংজ্ঞাশূন্যার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। একটী মর্ম্মভেদী কাতর ধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল।

বাষ্পনিপীড়িত কণ্ঠে সে বলিল "প্রাণাধিক! তবে কি আর তুমি আমায় ভালবাস না ?"

ক্রুদ্ধ কসাক দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল "না।"

তখন উভয়হস্তে পতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া মেরিণা, তাহার কর্দ্দমাক্ত পাদুকা চুম্বন করিল এবং ধূলি-বিলুণ্ঠিতা হইয়া পূত অশ্রুধারায় স্বামীর চরণতল বিধৌত করিতে লাগিল। আফান্সি ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া একখানি টুলের উপর উপবেশন করিল এবং টেবিলের উপর বাহুদ্বয় রক্ষা করিয়া অবনত বদনে বসিয়া রহিল।

"মেরিণা! তোমায় যদি এত ভাল না বাস্‌তেম তা' হ'লে আমার এ যন্ত্রণা হ'ত না।" সেই দুর্দ্দান্ত কসাকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তোমায় ভালবাসি মেরিণা! বড় ভালবাসি। কিন্তু, হায়! কি করবো ? সবই অদৃষ্ট! আমি যে তোমাকে পণে হেরেছি! কাল সকালে দানিলোকে দু'শ ডকাট্ দিতেই হ'বে। তা' কোথায় পা'ব

শুন মেরিণা! আমার চেয়ে গুণবান্ সচ্চরিত্র অনেক যুবা এ গ্রামে আছে যা'রা তোমার রূপে, তোমার গুণে মুগ্ধ! তা'রা তোমায় পেলে আহ্লাদের সঙ্গে দু'শো ডকাট্ দিতে রাজী হ'বে। আমি হ'লে দু'শো, তিনশো, এমন কি—"

মেরিণা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "স্বামিন্! প্রভু!" তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। "হা ভগবান্! কি পাপ আমি করেছি তাই আমায় এত শাস্তি দিচ্ছ? আফান্সি! আমার দিকে চাও—দয়া কর। তুমি আমার স্বামী আমার সর্ব্বস্ব। আমি সতী, কেবল তোমাকেই জানি। তুমি জীবিত থাকৃতে কেমন ক'রে আমি অপর পুরুষ গ্রহণ কর্ত্তে পারি?"

আফান্সি কৃত্রিম বিরক্তি দেখাইয়া বলিল "যাক্! মেয়ে মানুষের সঙ্গে তর্কে ফল নেই। শোন মেরিণা! এর কোন প্রতিকার আমি কর্ত্তে পারিনে। আমি কসাক্,—কথা দিয়েছি,—বস্। এখন যাও।"

মেরিণা বাহির হইয়া গেল। রাত্রি স্থির, শান্ত। আকাশে নক্ষত্রমালা হাসিতেছে। অভাগিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথায় যাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। অশান্ত হৃদয়ে, অনির্দ্দিষ্ট পথে, অসংযত চরণে সে ছুটিয়া চলিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এ কি বৈচিত্র্য! আমার আফান্সি আমায় ভালবাসে, আবার বাসে না।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল। মিথাইলোর মনোহর মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত। আজ তাহার বেশের বড় পরিপাট্য—বড় সুন্দর দেখাইতেছে! সস্নেহকণ্ঠে মিথাইলো ডাকিল "মেরিণা! এত রাত্রে এখানে কেন?"

মেরিণা লজ্জায় নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বাধ বাধ স্বরে উত্তর করিল "আমি একটু বেড়া'তে এসেছি। আফান্সি আজ সকাল সকাল বাড়ি এসেছে।"

হাঁ তা আমি বিলক্ষণ জানি। সে তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

মেরিণা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। মিখাইলো বলিতে লাগিল "আমি শুনেছি আফান্সি খেলায় দু'শো ডকাট হেরে গেছে। শুনলুম কাল নাকি সে তোমাকে জোর ক'রে বাজারে বেচ্‌তে নিয়ে যাবে! একি সত্য?"

মেরিণা নীরব। মিখাইলো বলিয়া যাইতে লাগিল "যদি তাই-ই হয়, আমি তোমায় কিন্‌বো মেরিণা! সে যত দাম চায় আমি তাই-ই দেব। অর্থের জন্য আমি কাতর হ'ব না দু'শো নিক্ তিনশো নিক্—"

মেরিণা উচৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"না, না, তা' কিছুতেই হ'বে না।" তাহার স্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

মিখাইলো বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি মেরিণা! তুমি জান আফান্সি কথা দিয়েচে – কসাকের শপথ খেলার জিনিস নয়!"

উত্তেজিত কণ্ঠে মেরিণা বলিল "এমন অপমাণিত হওয়ার চেয়ে আমি বরং ডুবে মর্‌বো সেও ভাল।"

"কেন মেরিণা! এতে আর অপমান কি? এত দেশাচার সিদ্ধ!"

"না, না, আফান্সি যদি সত্যই আমায় ভাল না বাস্‌তো, কিম্বা আমি যদি বন্দিনী না হতুম্, সে স্বতন্ত্র কথা! আফান্সি আমায় ভালবাসে, আমি আফান্সিকে ভালবাসি।—আর আমি কসাকরমণী!"

"মেরিণা আমাকে কি তুমি একটুও ভালবাস না?"

"তোমাকে? হাঁ, তোমাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তুমি আর সকলের চেয়ে ঢের ভাল। তোমাকে পছন্দ করি কারণ তুমি আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর। কিন্তু আমি আফান্সিকে ভালবাসি। ভগবান্ তাকে আমায় দিয়েছেন—সে আমার স্বামী! তুমি আমার ভাই—তোমাকে আমি ভাইয়ের মত ভালবাসি।"

"দেখ মেরিণা! আমাকে গ্রহণ কর। ধন চাও মান চাও, প্রেম চাও সম্পদ চাও, আমি তোমায় সব দেব—এমন আর কেউ দিতে পার্ব্বে না। কাল আমিই তোমায় কিন্‌বো। নইলে মেরিণা! হয়ত তোমাকে কোন্ হতভাগার হাতে পড়্‌তে হ'বে!"

"তা' তুমি পার্ব্বে না। আমার এই লাঞ্ছনাই যদি ভগবানের

অভিপ্রেত হয় তা'হলে আমি জলে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। মর্ব্বো সেও ভাল, তবু আফান্সি জীবিত থাক্‌তে অপরের পত্নী হতে পার্ব্বো না। আমার শরীরে কি কসাকের রক্ত প্রবাহিত হ'চ্ছে না?"

সহসা মুখ ফিরাইয়া মেরিণা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। বিনিদ্র আফান্সি তখন টেবিলের পাশে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। পাশের ঘরে পত্নীর মর্ম্মভেদী রুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাহার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল। সে আজ বুঝিল মেরিণা কি অমূল্য রত্ন—তাহার কত আকাঙ্ক্ষার ধন! হায়, সে মেরিণাকে এত দিন চিনিতে পারে নাই। কিন্তু, আজ সে নিরুপায়—পণে আবদ্ধ!

হৃদয়ের এ দৌর্ব্বল্য দমন করিবার চেষ্টা করিয়া সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল "যাক্, আবার বিদেশে চলে যা'ব, তাহ'লেই তা'কে ভুলে যা'ব! কিন্তু, সে বড় সুশীল—সতীসাধ্বী! তেমনটী আর পা'ব না। তা'কে জন্মের মত হারিয়েছি। কিন্তু, তা'র যাতে ভাল হয়—আবার যাতে সে আমার মত কোন হতভাগার হাতে না পড়ে তা আমায় কর্ত্তে হবে: ভাল কথা! মিথাইলো বড় ভাল লোক, তারই হাতে আমার মেরিণাকে সমর্পণ কর্ব্বো। যাই এখনই একবার তা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।"

আফান্সি গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মেরিণাকে ডাকিয়া বলিল "ছিঃ মেরিণা! এমন ক'রে কাঁদ্‌তে আছে?"

অশ্রুরুদ্ধ, ভগ্নকণ্ঠে মেরিণা উত্তর করিল "আফান্সি! আমার আর সহ্য হয় না! কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে সমস্ত লোকের সাম্‌নে আমার এমন লাঞ্ছনা কর্ত্তে যাচ্ছ?"

"শান্ত হও মেরিণা! সবাই জানে আমি কি চরিত্রের লোক। তোমার দোষ কেউ দেবে না। আমি আমার ঘোড়াটি পর্য্যন্ত পণে হারিয়েছি; আর আমার ঋণ পরিশোধের জন্য, সত্য পালনের জন্য, পত্নী বিক্রয়ে কুণ্ঠিত হ'ব? আমি কসাক্,—কসাক্ কখনও সত্যভঙ্গ করে না। কালই আবার দেশ লুঠ কর্ত্তে বেরিয়ে যা'ব তুমি

মিথাইলোকে বিবাহ কো'রো। আর কা'রও হাতে তোমাকে দিচ্ছি নে। সে যুবা পুরুষ, সাহসী সবল ও উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী। সে তোমার যোগ্য স্বামী। আমার কথা মন থেকে মুছে ফেলে দিও। ভগবানের এই বিধান—কি আর কর্ব্বে বল? কিন্তু, আমি—ভালবাসতুম্, বড় ভাল-বাসতুম্ মেরিণা! এখনও তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।"

মেরিণা স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সেই চির-বাঞ্ছিত স্বর্গে মুখ লুকাইয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সহসা কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল। ত্রস্তভাবে মিথাইলো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে, সবই শুনিয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল "আফান্সি! আমার উপর তোমার বড় অনুগ্রহ—তুমি আমাকে প্রকৃত কসাক্ ব'লে চিত্রিত করেছ। তোমার অপর বন্ধুরা সকলেই খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি এক পয়সাও হারিনি। আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু, সুতরাং আমার অর্থের অংশগ্রহণে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তোমার বিপদের কথা আমি শুনিয়াছি। এই নাও দু'শো ডকাট্। তোমার সময় হ'লে আমার ঋণ পরিশোধ ক'রো।"

মিথাইলো মুদ্রাগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। মেরিণা ছুটিয়া গিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং আবেগ-ভরে সেই হস্তে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

* * * * * * *

একঘণ্টা পরে গ্রামের চত্বরে এক তীব্র চীৎকারধ্বনি শুনা গেল। মিথাইলো উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে "সর্দ্দারগণ! বন্ধুগণ! চল আমরা সাইবিরিয়ার নীবিড় জঙ্গল হইতে পশুর লোম সংগ্রহ করিয়া আনি. তাহাতে প্রচুর অর্থলাভ হইবে।"

বহু দুর্দ্ধর্ষ কসাক্ সেই আহ্বান-বাক্যের প্রত্যুত্তর দিল এবং স্ব স্ব মস্তকের টুপী খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। ইহাই তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপনের লক্ষণ। *

শ্রীসুরাজকান্ত রায় চৌধুরী।

* একটী রুষিয় চিত্রের ইংরাজী হইতে অনুদিত।

আত্ম-সমর্পণ।*

মোরে আর সুধায়োনা নীরবে চাঁদের-টানা
বুক নীলাম্বুর,
নীরবে অম্বর ছাড়ি জলদ নামিয়া গিরি
অন্তরীপ গায়
বুকে বুকে ভাঁজে ভাঁজে হের প্রিয় কায়ামাঝে
মিলাইয়া যায় ;
উত্তর কি দেছি কভু ওগো মোর চির-প্রভু
প্রিয় প্রেমাতুর ?
মোরে আর সুধায়োনা, নীরবে চাঁদের-টানা
বুক নীলাম্বুর।

আর সুধায়োনা মোরে কি দিব উত্তর হাঁরে
আমার রোগীটি ?
ওই তব গণ্ডশীর্ণ নয়ন ম্লানিমাকীর্ণ
ব্যথিছে আমায়,
স্পন্দনটী ওই বুকে মরণে মিলাবে দুখে
সহিব কি তায় !
আর সুধায়োনা মোরে পাছে ব'লে বসি তোরে
বাঁচহে মনিটি !
আর সুধায়োনা মোরে কি দিব উত্তর হাঁরে
আমার রোগীটি ?

আর সুধায়োনা মোরে তব সাথে গাঁথা ওরে
চিরভাগ্য মোর ;

---

* এ আত্মসমর্পণ প্রেমের কাছে বিদ্যাবলের, জগতের **চিরন্তন** নিয়মের কাছে ক্ষণিক বিদ্রোহের।—টেনিসনের কবিতা **অবলম্বনে** (The Princess) "Ask me no more"

বুঝিয়াছি স্রোতোসাথে আজিকে বুঝিনু তা'তে
নিষ্ফল সাধনে,
তটিনী ভাসায়ে চলে তৃণ তুচ্ছ বিদ্যাবলে
সাগর মরণে;
আর নহে ওহে বঁধু একটী পরশে শুধু
আমি আজি তোর,
আর সুধায়োনা মোরে তব সাথে গাঁথা ওরে
চিরভাগ্য মোর।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

সার সঙ্কলন।

প্রবাসী, ভাদ্র।

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা।

ফরাসী বিপ্লবের সময় ইংলণ্ডের সাহিত্যে যখন প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল, তখন সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবিদের চক্ষে এক নূতন জগতের স্বপ্ন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেমন শেলি। সেই একই মাহেন্দ্রক্ষণে আবার Wordsworthএর ন্যায় কোনো কবির কাছে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির যবনিকা উন্মোচিত হইয়া গেল এবং তিনি চাহিয়া দেখিলেন "into the life of things." সেই অরুণোদয়ে আশা আনন্দের কোনো পরিমাণ রহিল না; সমস্তই অত্যন্ত উদার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দিল।

তারপরে Victoriaর যুগে, Browning Tennyson এর সময়ে বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় স্থাপিত হইল। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে হাটের কলরবের মাঝখানে আমরা মানুষের বিচিত্ররূপ দেখিলাম। তারপর দিন অবসান হইল। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকের উপর সন্ধ্যার ঘোর নিবিড় হইয়া আসিল। বিজ্ঞান

দেখিল অণুর রহস্যের দিক দিয়াও শেষ নাই। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে লাগিল যে, তত্ত্ব মানে তো স্থিতির কথা কিন্তু জীবন যে ক্রমাগতই চলিয়াছে—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই শেষ কথা হইতে পারে না। কি অসীম রহস্য!

এখন তবে কিসের কথা গাহিবে?—এখন যে রহস্যের হাওয়া দিয়াছে। এখন সুদূরের কথা, গভীরের কথা, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসভার নিবিড় নিস্তব্ধতার কথা। অনেকের কথা নয়—একের কথা; বিচিত্রের কথা নয়, পূর্ণের কথা; সীমার কথা নয়, অসীমের কথা। ইউরোপীয় ভাবুকেরা এই কথা; বলিবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন। কবি Yeats ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে এই সন্ধ্যা কালের ঘোরের কবি। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে তাঁর স। কবিতা "বহুদূরে পাখা মেলিয়া যেখানে তোমার দুঃখময় বেদনাময় অন্তরটী আছে, সেইখানে আসিয়া রজনীতে তোমার কাছে গান গায়,—যেখানে জলধারা ঝড়ের অন্ধকারে বা তারকার দীপ্তির তলে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে—তাহারি পর পারে,

They come where your sad, sad heart is
And sing to you in the night,
Beyond where the waters are moving
Storm-darkened or starry bright.

তিনি আপনাকে Pilgrim soul অর্থাৎ পথিক-আত্মা বলিয়াছেন এবং সেই পথচক্রের নানা রহস্যের গান গাহিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবের সেই অরুণাভাস হইতে সায়াহ্নের এই বিষাদমলিন ঘোর পর্য্যন্ত যে আরম্ভ, মধ্যে এবং পরিণামের এক আশ্চর্য্য লীলা দেখা গেল,—কবি রবীন্দ্রনাথ এক জীবনের মধ্যে সেই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া, সেই বিচ্ছিন্ন-কালের বিভিন্ন সকল লীলাকে এক অখণ্ড জীবনচক্রের মধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

তাহার রহস্যের গান নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলীতে একেবারে পরিপূর্ণতম গভীরতম রাগিনীতে বাজিয়া উঠিয়াছে যে রাগিণী

এখন ইউরোপীয় কবি-সমাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—সে সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী, অরূপকে, অনির্ব্বচনীয়কে রূপের মধ্যে, গানের মধ্যে ধরিবার ব্যাকুলতার রাগিণী।—

এই বঙ্গীয় কবিকে ১২ই জুলাই ইংলণ্ডের সাহিত্য-সমাজ এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সভায় ইংলণ্ডের সকল বড় বড় সাহিত্যিক ও সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। Yeats ছিলেন সভাপতি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"...... আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটী মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অদ্য আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। গত ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টী গীতিকবিতার গদ্যানুবাদের একটী খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানিনা, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। ...... আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা হইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস এ. কেম্পিসের "খৃষ্টের অনুকরণ" (Of the imitation of Christ by Thomas A. Kempis) ইহারা সদৃশ বটে—কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস এ. কেম্পিস্ কিরূপ গুরুতররূপে অধিকৃত—কিন্তু এই কবি পাপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। কেম্পিসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক।"

Yeats ইহার পরে কবির অনুবাদিত ৩টী কবিতার গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। যথা—'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে', 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর' এবং 'শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে।' রবীন্দ্রনাথ তাহার বক্তৃতার এক জায়গায় বলিয়াছেন—"নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে

শস্যশ্যামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্ব্বাকাশের সূর্য্যালোকের অনিমেষ-দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্র পার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে—সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সন্তরণ লাভের জন্য, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচিও প্রতীচীই সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়েই মিলিতে পারে :—না-সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্ব-মানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।”

কবির নিকট যে সকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে একজন স্ত্রীকবি লিখিয়াছেন—“আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটী সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়—কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎ চমকের মত আসে যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিয়া থাকে—সেই তাহারি একটী চিরন্তনরূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। St. John of the Crossএর “আত্মার অন্ধকার রাত্রি” নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাই না—কিন্তু আপনি একটী পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে এবং একটী আধ্যাত্মতত্ত্ব-দৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টান mysticism ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়—জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্ম্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোন দিনই সন্তোষ দেয় নাই, কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই তাহা গত রাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছ-সুন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিস আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোন দিন

দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।" ইংলণ্ডের কোনও প্রথিতনামা মনীষী আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকট এক চিঠিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ দেওয়া গেল।—"ইঁহার অন্তরতর গভীর অভিজ্ঞতা হইতেই ইঁহার সকল লেখার উৎপত্তি—তাঁহার সমস্ত রচনাই এই বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যের নম্রমধুর আবেগপূর্ণ হৃদয়োত্থিত স্তব অর্ঘ্য। তাঁহার কাছে সেই সৌন্দর্য্যই বিশ্বের ঐক্যের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ, অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য ভগবানের অনন্ত প্রেমের বাহ্যচিহ্ন বাহ্যবিগ্রহ মাত্র। সহস্র পদার্থে ইহাই তিনি দর্শন করেন এবং সহস্ররূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে ইহাই তিনি ব্যক্ত করেন। এত বড় আপনাদের কবি, আপনাদের কি গর্ব্বের কথা! যদি এমন অনেক দূত আপনাদের দেশ হইতে এ দেশে আসিতেন। সাম্নের শরতেই India sociey কবির অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন।" এই অনুবাদগুলি কবির স্বকৃত। Yeats কে ঐগুলি মার্জ্জিত করিয়া দিতে অনুরোধ করায় Yeats বলিয়াছিলেন "এই অনুবাদের কোন কথা বদল করিয়া মার্জ্জিত করিয়া তুলা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না।" কেহ কেহ কবিকে গুরু সম্ভাষণ করিয়া পদধূলি লইয়াছেন। তাঁদের মধ্যে এক জন অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান। দিল্লী কলেজে র অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি, এফ, এন্‌ড্রুজ মডার্ণ রিভিউ পত্রে লিখিয়াছেন—"যে-কবি তাঁহার কাব্যের দ্বারা তাঁহার স্বজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতাম; কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ...... তাঁহর সহিত বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া আমি বলিলাম 'জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসকলের মধ্যে বাঙালীর যথার্থ স্থানটী নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় সুদূর নয়।' এই কথায় কবির মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল—একটি সুদূরের আলোক তাঁহার দৃষ্টিতে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম বঙ্গজননীর মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইংলণ্ডের সুধীসমাজের আতিথ্যও সমাদরের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত

প্রবাস-বেদনা অনুভব করিতেছে। ...... এ আজ কি আনন্দ, যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এতদিনে আমার দেশ ভারত-প্রতিভার পূজা করিতেছে।”

পুরুষোত্তম।

প্রাপ্তগ্রন্থ সমালোচনা।

মজা—শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সদ্য প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পদ্যগ্রন্থ। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সান্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডাঃ ক্রাঃ ৮ অং ২৬ পৃষ্ঠা। ব্রজ-ব্লু কালীতে ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা।

প্রথমেই তিন রঙ্গে ছাপা চিত্রসমন্বিত শুভ্র, পুরু প্রচ্ছদপট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রখানির পরিকল্পনা কবিজনোচিত ও মার্জ্জিত শিল্পরুচিসঙ্গত। কিন্তু চিত্রখানার রং আরও একটু উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল। পুস্তকখানি শিশুদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহা উজ্জ্বল, নির্ম্মল হাস্যকৌমুদীতে প্লাবিত, তিক্ত ব্যঙ্গরসবিবর্জ্জিত এবং সদুপদেশে পরিপূরিত। ‘বাক্যবাগীশ’, ‘তিলেতাল’ প্রভৃতি কবিতাগুলি না পড়িয়া শুধু উহার চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অশীতিপরবৃদ্ধের পক্ষেও হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ‘রোগী ও ডাক্তার’ শীর্ষক কবিতায়

“মণি বলে— “কি আলু খাব,
ছেলেতো যে মলে !”

পড়িয়া নির্জ্জন গৃহে হাসিতে হাসিতে পার্শ্ববেদনা জন্মিয়াছে।

লেখক প্রথমেই শিশুদিগকে রাজভক্তি শিখাইয়াছেন—

“ভারত সন্তান তরে কাঁদে সদা প্রাণ
তাই তাঁরা মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যান
সুদূর ইংলণ্ড হ’তে—সপ্তসিন্ধু পারে ;
হেন রাজারাণী দোঁহে পূজ বারেবারে।”

লেখকের রচনাভঙ্গী সুন্দর, ভাষা অতি প্রাঞ্জল, প্রকাশ-শক্তি প্রশংসনীয়। 'মধুর ঠাঁই' নামক সর্ব্বশেষের কবিতাটী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পুস্তকখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য, আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্যের অনুরূপ। গুণের তুলনায় মূল্য অধিক হয় নাই বলিয়া মনে হয়। আধুনিক শিশুসাহিত্যে ইহা স্থায়ী স্থান লাভ করিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মূল্যসম্বন্ধে কিছুই পুস্তক হইতে জানিবার উপায় নাই। ইহা দৌত্যসাহায্যে জানিতে হইয়াছে।

'কুন্দ'—শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ, মূল্য ॥০ আনা। ডিমাই ১২ অং ৭২ পৃষ্ঠা।

এখানি কবির বাল্য রচনা। কবি প্রথমেই বলিতেছেন—

"জানিনাক গান,
নাহি স্বর তাল লয়, তবু পুলকেতে
গেয়ে উঠে আবেগেতে আত্মহারা প্রাণ!"

'কুন্দে'র মধ্যে এই সুন্দর, সহজ, স্বভাবকবিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কবির ছন্দজ্ঞান সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয়। তাঁহার ভাবসম্পদ্‌ও প্রচুর। বালক হইলেও ইহার যথেষ্ট মৌলিকতা আছে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে এবং তৎপ্রচারে নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা আছে। ইঁহার কল্পনায়ও বেশ মাধুর্য্য আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অনুতাপ ও অশ্রু,' 'উষার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা', 'আনন্দ' 'দিবার সহমরণ' প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বদেশপ্রেমিকতা কবির শিরায় শিরায়, ধমনীতে, ধমনীতে প্রবাহিত। ইহা তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে বহুবিধ প্রকারে ধ্বনিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

"হে, রাজপুরুষ!
সুধা হ'তে মিষ্ট তব চরণ প্রহার
হানো দেব দীর্ণ বক্ষে হানো পুনর্ব্বার।
* * * *
নিস্পন্দ হৃদয় আজি চরণ প্রহারে,

এখনও ঘুমের ঘোরে নেত্র আসে মুদে
হানো দয়াময় দেব ও রাতুলপদে।"

বঙ্গ-বিভাগের সময় যখন সমগ্রদেশ বাত্যাবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় আলোড়িত ও উন্মথিত হইতেছিল তখন বালক কালিদাস কাব্য-নিকুঞ্জে করুণস্বরে গাহিতেছিলেন—

"তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, নরপতি সম্বর কৃপাণ,
অভাগিনী মা মোদের রাখ দয়াময়।"

কিন্তু শেষে সমস্ত প্রার্থনা বিফল দেখিয়া মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাসের সহিত আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া আবেগভরে বলিয়াছেন—

"হায়— এতই জীবনীহীন বাঙ্গালী সন্তান,
দাঁড়ায়ে দেখিতে পারে মাতৃ বলিদান ?"

ইহার পর কবি, বঙ্গ বিভাগ বিধির বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার সম্পূর্ণ নূতন ও আশাপ্রদ অর্থ দেখিতে পাইয়াছেন—

"যথা বীজ দুই ভাগে হইলে খণ্ডিত
তাহা হ'তে যে অঙ্কুর হয় উৎপাদিত,
সে অঙ্কুর হ'য়ে কালে বিটপী বৃহৎ,
ছায়া ফলফুল দানে তোষে এ জগৎ।
তেমতি এ বঙ্গ বীজ দ্বিধা ভক্ত হ'য়ে
যে অঙ্কুর উৎপাদিল আজি সুসময়ে,
লক্ষশাখ বৃক্ষ হ'য়ে সে অঙ্কুর ক্রমে,
উর্দ্ধশীর্ষে দাঁড়াইবে এ ভারতভূমে॥"

তারপর কবি মেঘমন্দ্রস্বরে কি বলিয়া গর্জ্জন করিতেছেন

শুনুন—"সকল যাত্রীর সনে কর্ম্ম পথে সহযাত্রী সাজো,
ত্যজ ত্যজ রমণীত্ব ত্যজ।

তুমি যে রে কাননের মদমত্ত বারণ সবল
ভুলেগেছে, কেন পদে সূত্রবৎ বন্ধন-শৃঙ্খল ?

গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া কবি গাহিতেছেন—

"আজি কুটীরে তোমার এসেছে ফিরিয়া সন্তান কোটী সপ্ত,
বিধবা মাতার কাঙ্গাল তনয় জননীর দানে তৃপ্ত।

পরদাসত্ব ঠেলেছে চরণে,
পূর্ব্বের কথা এসেছে স্মরণে
নজ বংশের সৌরভ স্মরি আজি গৌরবদৃপ্ত,
আর নহে তারা পর-নির্ভর লক্ষ্মীর অভিশপ্ত।"

কবি ঈশ্বরের নিকট 'বঙ্গের অতিশাপ মুক্তি'র জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—

"যথেষ্ট শিখেছে বঙ্গ   যথেষ্ট হ'য়েচে তার
বুকে তার ঘোর অনুতাপ।
*   *   *   *
আপনার গেহ আছে   সে তাহা ভুলিয়াছিল,
আপনার বস্ত্র ধান ধন,
যাহা কিছু ছিল তার   সঁপে দিয়ে পরপদে
পরদ্বারে কাটাত জীবন।

'তুলসী', 'তোমার স্বরূপ' 'বিফল জনম' 'ধূলি' 'সত্য' প্রভৃতি কবিতা কয়েকটীতে কবির ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাব্যখানি ভাবসম্পদে দরিদ্র না হইলেও যে ইহাতে স্থানে স্থানে রচনার ত্রুটী আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবের বৈচিত্র্যসত্ত্বেও কতকগুলি কবিতায় যেন কেমন একটা একঘেয়ে সুর বাজে।"

কিসলয়—কবি কালিদাসের রচিত পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ, ডিমাই ১৬ অং ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য।০ আনা, আদ্যোপান্ত নীল মসীতে মুদ্রিত, ৮৪নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে এম্ সি দত্ত এণ্ড ব্রাদার্সের নিকট ও মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

ইহাতে কুন্দের অপরিণত শক্তি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। কুন্দের ভিতর স্থানে স্থানে ভাবের নিষ্পেষণে ভাষা যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু কিসলয়ে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যে এক অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রায় সমস্ত কবিতাই সুন্দর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২।১টির মাত্র উল্লেখ করা হইবে। কবি 'অপ্রবুদ্ধ উপভোগ' এ মনোবিজ্ঞানের এক গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার চাষা ভাগবত শুনিয়া

"হে ঠাকুর কিছু বুঝি নাই,
জানিনা তবুও পোড়া চোখে কেন জল"।

আড়ম্বর-বিহীন নির্জ্জনতাপ্রিয় কবি 'নিভৃতের প্রয়োজন' এ অলক্ষ্যে অকস্মাৎ একটী গুরুতর বাস্তব-সত্যের (practical truth) কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন —

"কাজ হবে যত বিরাট বিপুল
আগে তাহা তত ঘটাহীন।
তত ধীরে ধীরে নিভৃতে নীরবে
আয়োজন চলে নিশিদিন।"

কবির চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিও বেশ সুন্দর, 'অন্তর ও বাহির' এবং 'অমিল' এই দুইটীকে এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা যায়।

কিন্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে 'সতীর প্রতি'। ইহার প্রত্যেকটী পংক্তিই "Jewls—five words long
That on the stretched forefinger of all Time
Sparkle for ever."

কবি কহিতেছেন—

"আনন তোমার ফুলভরা সাজি, বাঁধুলী ইন্দীবরে,
কাননসরসী কাঙ্গাল করিয়া যেন কে এনেছে ভ'রে।

* * * *

বাক্য তোমার পূজার মন্ত্রে তন্ত্রীর মূরছনা।
কণ্ঠের হার লুণ্ঠিত বুকে সুন্দর আলিপনা।

* * * *

হাস্য তোমার মোহন হৃদ্য নৈবেদ্যের থালা,
দন্তের পাঁতি ইন্দুকান্তি কুন্দ-কুসুম-মালা।
শোভে সীমন্তে সিঁদুর-বিন্দু উজ্জ্বল হোমানল।
অম্লানচির আরতি আলোক,—আঁখিযুগ জলজল!
নহ হো ভোগ্য, তুমি যে অর্ঘ্য, স্বর্গীয় বিনোদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজায় ভক্তের আয়োজন!"

* * * *

আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কবি কালিদাস রবীন্দ্রপন্থী হইলেও তাঁহার অন্ধ অনুগামী নহেন। তাঁহার নিজস্ব যথেষ্ট আছে।

কুন্দের নাম 'কিসলয়' ও কিসলয়ের নাম 'কুন্দ' হইলে যেন নামের সার্থকতা হইত কারণ এই কাব্যখানি কুন্দের মতই শুভ্র, পূত, নির্ম্মল, [illegible] কুন্দের মতই মনোমুগ্ধকর।

ভারতবন্ধু হিউম।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৯ [৭ম সংখ্যা।

শারদ-লক্ষ্মী।

('সধবা অথবা বিধবা'র সুর)

তুমি—চরণ ফেলিতে প্রাঙ্গণে জাগে স্বর্ণের আলিপণা।
আলো করে দীপ তুলসীকুঞ্জ,
কূজন-ব্যাকুল কপোত পুঞ্জ,
শঙ্খ-স্বননে ভবন অঙ্কে উঠে নব মূরছনা।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তুমি—নীলাকাশে নীলনয়ন মেলিলে আলোকে ভূলোক ভায়,
শিথিল করিলে কোরকের মুঠি,
কণক কমল উঠিল যে ফুটি।
তব কণ্ঠ কাঁপিলে তেয়াগি কুণ্ঠা লাখো লাখো পাখী গায়।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব হাসিতে ভাসিল আকাশ বাতাস রজত সুষমাধারে,
ছাতিমের শাখা, শেফালির তল,
কাশের লহর, মরালের দল।
ঐ অভ্র-উজল অভ্র শোভিল শুভ্র জোছনাসারে।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।
তব অধরপরশে ফুটিল বাঁধুলী কাননশিশুর মুখে।
থল কমলেরা, চরণ পরশে
চমকি ফুটিয়া চাহিল হরষে।
ও কর পরশে অচলা তরণী ছুটিল পণ্যবুকে।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব আঁচল লুটিলে কনক কিরণে নীহারে মাণিক জ্বলে
টুটিলে চিকণ চিকুর-বন্ধ
দিকে দিকে ছুটে শ্যামলানন্দ।
কাঁকণের তানে কূলে কূলে লুটি কল কল নদী চলে।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

তব স্নিগ্ধ দিঠিতে দুগ্ধ ক্ষরিছে ধেনুর আপীনছায়,
বুলাইলে কর, তনু নিরাময়
কান্তি পুষ্টি তুষ্টির জয়।
আশীষ বরষে শালীর স্তম্ব নমিছে চুম্বি পায়।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী, করি বরা ভয়দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

সমুদ্রযাত্রা।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই কথাটি হচ্ছে যে 'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।' কিন্তু ইংরেজী ভাষাতে আর একটা উপদেশ-বাক্য প্রচলিত আছে যাহার মর্ম্ম পূর্ব্ববর্ণিত বাক্য অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। সেই বাক্যটি এই যে 'Speak the truth speak it ever cost it what it will' আমি এই শেষোক্ত নীতিবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটী প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

আমাদের দেশে যে আজকাল অনেক সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সন্দেহ বা অস্বীকার কেহই করিতে পারে না। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গ আসিয়া আমাদের সমাজকে ক্রমশঃ আন্দোলিত করিতেছে তাহা প্রণিধানের জন্য কাহাকেও বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয় না। একটু সামান্যভাবে দেখিলেই এই আন্দোলন বা স্পন্দন আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। কি ভাবে কার্য্য করিলে এই স্পন্দন তিরোহিত হইয়া সমাজে শান্তি আনয়ন সম্ভবপর তাহা বিবেচনা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং যাহাতে এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা দ্বারা কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় সেই বিষয়ে আমাদের দেশস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

সমস্ত সামাজিক সমস্যার উল্লেখ একস্থানে করা অসম্ভব। এই স্থানে কেবলমাত্র একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। আমার বক্তব্য বিষয় গুলির মধ্যে কিছু নূতন আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; তথাপি অতি প্রাচীন কথা গুলিও মাঝে মাঝে নূতন করিয়া বলিতে হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশীয় অনেকে নানা উদ্দেশ্যে কালাপাণি পার হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকাতে যাতায়াত করিতেছেন। বিদেশগামী

হিন্দু দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমাজে তাঁহাদের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পান এবং এইভাবে সমাজপ্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যে অনেককে বাধ্য হইয়া হিন্দু ভিন্ন অন্যসমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

য়ুরোপের সহিত বন্ধনের প্রথম অবস্থাতে মুষ্টিমেয় হিন্দুসন্তান কালাপাণি পার হইয়া বিদেশে যাইতেন এবং সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সমাজত্যাগে সমাজে অনুভবযোগ্য ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গতিশীল দেশ ও জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশের অবস্থার নানা প্রকার পরিবর্ত্তন প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক হিন্দুসন্তান শিক্ষা অভিজ্ঞতা প্রভৃতি লাভের জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকাতে যাত্রা করিতেছেন। এবং যে হারে প্রতি বৎসর এই প্রকার বিদেশযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে দশ পনর বৎসর পরে এরূপ কোন ও পরিবার আমাদের দেশে পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে যে পরিবারের সহিত অন্ততঃ একজন য়ুরোপ বা আমেরিকা গামীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন রূপ সম্পর্ক নাই।

আমাদের দেশে আজ কাল যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশ বিদেশে গমনাগমন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র উচ্চ কর্ম্ম লাভের জন্য নহে, নানা বিষয়িণী উচ্চ শিক্ষার লাভের জন্য-ও বিদেশ যাত্রা আবশ্যকীয় হইয়াছে। আমাদিগকে দেশের ও জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে আমরা কেবলমাত্র মুখে অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা না করিয়া কার্য্যদ্বারা দেশ ও জাতিকে বর্ত্তমান সময়ে খ্যাতি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নত করিতে পারি। কিন্তু কূপমধ্য-স্থিত ভেকের ন্যায় কেবলমাত্র নিজের ঘড়ে আবদ্ধ থাকিলে আমাদের অতি উচ্চ ও সৎ অভিপ্রায় সমূহ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। সুতরাং যাঁহারা আত্মীয় স্বজনের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া

ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া বিদেশে গমন করেন তাঁহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র ও তাঁহাদের অনেকের আচার ব্যবহারেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে যাঁহারা বিদেশে একেবারেই গমন করেন নাই তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোক নাই 'গুণিগণ গণনারম্ভে ন পতিত কঠিনী সসম্ভ্রমাৎযস্য' তথাপি বিদেশগামী ব্যক্তিদের মধ্যে যে এই শ্রেণীর ব্যক্তিও যথেষ্ট আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা অনেকে এবম্প্রকার সমস্ত শিক্ষা ও বিদ্যাতে পারদর্শী যে সমস্ত বিষয়ে পারদর্শীতা লাভ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া জাপান কি ভাবে জাতীয় উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে তাহা বিদ্যালয়ের নীম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থী পর্য্যন্ত অবগত আছেন। দেশ-জননীর এই সমস্ত বিদেশ প্রত্যাগত সুসন্তান সমাজের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ইহা কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিতে পারেন না। এই সমস্ত লোক অনেক স্থলে কলিকাতার সমাজে 'চল' হইতেছেন বটে কিন্তু এই সমস্ত চলের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এখন যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমি কোনও প্রকার মত প্রদান করিতে সমর্থ নহি অথবা আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নের আলোচনাতেও বিশেষ কোনও প্রকার লাভ নাই। আমরা এখন আইন বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি শাস্ত্রেও তাহাই। যেমন সময়ে সময়ে বাধ্য হইয়া আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় সেই রূপ যদি দরকার হয় তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধিও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই কথাটী আমার নিকট অত্যন্ত কাজের কথা বলিয়া মনে হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি একখানা পুস্তক বাহির করিয়াছেন, এবং প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ সমুদ্রস্নান ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে কি প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন

উপনিবেশ স্থাপনা করিয়াছিলেন ও বোধহয় যে 'জাপানে গঠিল উপনিবেশ' কথাটিও নিতান্ত কবিকল্পনাপ্রসূত ও অলীক নহে। যখন পুরীতে যাতায়াতের জন্য রেলগাড়ির বন্দোবস্ত ছিল না তখন প্রায় সমস্ত হিন্দুই সমুদ্রপথে পুরীতে যাইতেন কিন্তু তাঁহারা সমাজচ্যুত হইতেন না। ভীষণ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি সমুদ্রপারে আণ্ডামানদ্বীপে প্রেরিত হইয়া থাকে ও সেই দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিলে সমাজ অবাধে তাহাকে গ্রহণ করিবে অথচ প্রাতঃস্মরনীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়েরমত লোক যদি আমাদের রান্নাঘড়ে প্রবেশ করেন তবে সমস্ত জিনিষের পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা ম্লান হইবে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য সম্ভবপর আছে কিনা তাহা আমি জানি না। এখনও অনেকে জাহাজে চড়িয়া রেঙ্গুন সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বা জাপানে যাইয়া থাকেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহারা সমাজচ্যুত হন না—সুতরাং হিন্দুর পক্ষে কালাপাণি পার হওয়া নিষিদ্ধ তাহা কি প্রকারে স্বীকার করিব ?

বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ তিনটী অভিযোগ আনা হইয়া থাকেঃ—(১) সমুদ্রযাত্রা (২) অখাদ্য ভোজন ও (৩) বিদেশীয় সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অখাদ্য ভোজন অভিযোগ সম্বন্ধেও আমাদের প্রচলিত সামাজিক আচার কম আশ্চর্য্যজনক নহে। যিনি হয় ত কোনও বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিকে সমাজ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অত্যন্ত অগ্রগামী তাঁহার নিজের পরিবারের মধ্যেই হয় ত এই সমস্ত তথা-কথিত অখাদ্য বা কুখাদ্য ভোক্তার মোটেই অভাব নাই। এই বিষয় যে আমাদের সামাজিক দলপতিরা জানেন না তাহা নহে কিন্তু তাঁহারা জানিয়া ও জানিতে চান না; তাঁহারা জানিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে চাহেন। যদি দলপতিগণ এই সমস্ত খাদ্যগ্রহণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন তবে তাঁহাদের মতানুসারে যাঁহারা দেশে থাকিয়া এবং হয় ত অনেক স্থলে বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত অখাদ্য ভোজন করেন তাঁহাদিগকে বিশেষ-

ভাবে শাসন করা উচিত। যাঁহারা বিদেশে অন্য খাদ্যের অভাবে 'মনু-নিষিদ্ধ' পক্ষী ভক্ষণ করেন তাঁহারা যদি তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য সমাজের চক্ষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হন তবে যাহারা এদেশে থাকিয়া উক্ত সুস্বাদু পক্ষীমাংস ভোজনে বিরত নহেন তাহাদের দোষের পরিমাণ যে সমাজের নিকট অত্যন্ত অনেক অধিক হওয়া উচিত তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত লোকের প্রতি সমাজের এই উদারতা যে প্রভূত কাপুরুষতা পরিচায়ক তাহাতে কোন ও সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই যে বৈদিক সময়েও খাদ্য সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না এবং বর্ত্তমান সময়েও যে সমাজ বাস্তবিক পক্ষে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে; সুতরাং এরূপ লুকোচুরি খেলা খেলিয়া সমাজকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিবেন।

তৃতীয় অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অভিযোগ সম্বন্ধেও আমার মনে হয় যে বিদেশ প্রত্যাগত-দিগকে সমাজ যে পরিমাণে অপরাধী মনে করেন বোধ হয় তাহাদের অপরাধের মাত্রা তত অধিক নহে। মানুষ সামাজিক জীব; সে একাকী থাকিতে পারে না। যখন যুবক নূতনআশা নূতনউদ্যম বুকে করিয়া বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিল তখন গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে গৃহের অর্গল বদ্ধ। বদ্ধার্গল সম্মুখে আসিয়া সে অনেক ডাকাডাকি করিল—গৃহস্বামী উত্তর দিলেন—দ্বার উন্মুক্ত হইবে না।

এই প্রত্যাখ্যান অত্যন্ত নির্ম্মম, ইহার যাতনা হৃদয়ের অন্তঃস্থল—স্পর্শী। এই ভাবে বিনা দোষে সমাজদ্বারা অপমানিত লাঞ্ছিত ও তাড়িত যুবক যদি বিদেশীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া থাকেন তজ্জন্য তাহাকে অপরাধী করা অসঙ্গত বরং তাহার সহিত সহানু-ভূতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিলে পর ও যদি সে বিদেশীয় ভাবে নিজের পারিবারিক জীবন গঠন করিতে

চেষ্টা করিত তাহা হইলে তাহাকে আমরা দোষী বলিতে পারিতাম কিন্তু কখন ও তাহাকে সে সুযোগই দেওয়া হয় নাই।" সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে যে তৃতীয় অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়া থাকে সেই অভিযোগের যে বিশেষ কোন ভিত্তি আছে তাহা আমার মনে হয় না। আমি হ্যাট্ বা টাই পরিধান করা কখন ও পছন্দ করি না এই বিদেশীয় পরিচ্ছদে যে আমাদের জাতীয় গৌরব কিঞ্চিৎ ম্লান হয় তাহা আমি বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই যে পরিচ্ছদকারীর সমস্ত জাতীয় ভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে লোকহিতকর যত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে সাধারণতঃ সেই সমস্ত কার্য্যেই যে বিদেশ-প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সুতরাং বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন বলা সত্যের অপলাপ বলিয়া আমার মনে হয়। বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বিদেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করা হয় সে গুলি টিকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা এবং এই বিষয়ে সংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কলিকাতার সমাজে বিদেশ প্রত্যাগত অনেকে চল হইতেছেন কিন্তু সহরের বাহিরে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বিষয়ের সংস্কার সাধনে আমরা যথেষ্ট শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু বোধ হয় আর বিলম্ব করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। আমাদের দেশে যুবক-সমাজের মধ্যে যে এক দুর্জ্জয় শক্তি বিদ্যমান আছে তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে অনেকবার পাওয়া গিয়াছে এবং আশা আছে যে অচিরে এই শক্তি এই কুপ্রথা নিবারণে বদ্ধ পরিকর হইয়া দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধনে সহায়তা করিবে। কেবলমাত্র বৃদ্ধ সমাজপতি ও স্বার্থপরিচালিত পুরোহিতের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে এ বিষয়ে কিছুই হইবে না।

সন্ধ্যার ছবি।

এম্‌নি ক'রে আঁক্ দেখি ভাই
একটা চিত্রপট,
এম্‌নিতরই সবুজ রেখা
ঝাউ আর অশথবট।
আঁক দেখিরে সন্ধ্যা বেলা,
গাছের উপর মেঘের খেলা,
রঙের তারে বেজে উঠুক
নীরব ছায়ানট,
ভাল ক'রে চেয়ে আজ্‌কে
আঁক দেখি একপট।

খেয়ানধরা গাছের শিরে
বিরহীদের মত,
সূর্য্যদেবের সহস্রাংশু
আছে মূর্চ্ছাহত!
মেঘের 'পরে হেলিয়ে তনু
দেখ্‌ছে ওপার ইন্দ্রধনু,
এঁকেনে আজ ও চিত্রকর
রঙের খেলা যত.
রক্ত নীলের সম্মিলনে
ঢেউএর মাথা শত।

মরুর মত কঠোরতর
উষর আমার হিয়া
যা' দেখে আজ সরস সজল,
গিয়াছে দরবিয়া,

এমনিতর যুগযুগান্ত,
সিঁদুর ঢালা গগনপ্রান্ত,
যেন—নীলাম্বরীর পাড় এঁকেছে
সোণালী রং দিয়া,
বিশ্বরাণীর আঁচলখানি
উঠ্‌ছে ঝলকিয়া।
শিউলি ফুলের গন্ধছড়াও
চারুচিত্রপটে,
এম্‌নিতর প্রাণ-কাড়া-ঢেউ
আছ্‌ড়ে পড়ুক তটে.
নদীরবুকে রঙীন আলো,
ঘনিয়ে আসে একটু কালো,
ক্রমেদূরে শ্যামলছায়ে
অশথে আর বটে
মুখরকর চিত্র তোমার
নীরব ছায়ানটে।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

শারদ উষা।

"Morning, eternal as the infinite from which it came —Emerson আমাকে কোনও বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম-চর্য্যের পুস্তকে লিখা আছে—ঘুমাইবার আগে যদি নিজের ছায়াকে সম্বোধন করিয়া ভোরে জাগাইয়া দিতে বলা যায় তাহা হইলে ঠিক ভোর বেলা আপনি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আমি কোনও দিনই ভোরে ঘুম হইতে উঠিতে পারি না,—এ দুঃখ আমার মনে চিরকালই আছে। সুতরাং সেদিন ঘুমাইবার আগে আমার ছায়াকে ডাকিয়া বলিলাম—'দেখ্ আমায় ঠিক ৫টার সময় জাগিয়ে দিস্ ত।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই,

যে ঠিক ৫টার সময় আমাকে কে যেন ঠেলিয়া তুলিয়া দিল—জাগিয়াই শুনিলাম দূর গির্জ্জার ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া ৫টা বাজিয়া গেল।

এই আশ্চর্য্য ঘটনা সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে আমার আহ্বান আসিল—আমি শয্যাত্যাগ করিয়া নীল আকাশের নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম। মধুর বাতাস মৃদুব্যজনে আমাকে স্নিগ্ধ করিয়া গেল। কি মধুর এই উষা। এখানে দিবসের ক্লান্তি নাই এবং রাত্রির আলস্যও নাই; এখানে দিবসের দুঃসহ প্রখরতা নাই, নিশার সর্ব্বগ্রাসী কুহেলিকাও নাই। দিন এবং রাত্রি, আলোক এবং আঁধার এখানে অচ্ছেদ্য মঙ্গল বিবাহে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহা সুপ্তির পর মহাজাগরণের এই তটভূমিতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম এই উষা যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া কেমন বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহার মধ্যে চিরন্তন সত্য আছে বলিয়াই ইহা যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করে। সৃষ্টির আগেও "প্রতিদিন উষা আসি অনুমান করি যে তমহাসন্তানের জন্ম দিন,"—

তখনও চারিদিকের আকাশ বাতাস জাগিয়া উঠিত,—কিন্তু তার সাথে মহামানবের জাগরণ উন্মেষিত হইয়া উঠিত না। তার পর যখন পৃথিবীর জন্ম হইল—তখন প্রথম যেদিন উষারাণী মৃদুপাদক্ষেপে মধুর হাসিয়া এই সদ্যজাত শিশুকে চুম্বন করিয়া গিয়াছিল—তখনও চারি দিকের বিশ্ব প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু মানব তখনও জাগে নাই। মানব জাগে নাই বটে কিন্তু সেখানে যদি ভবিষ্যমানবের অস্তিত্ব স্ফুরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারও মধ্যে সেই জাগরণ-বার্ত্তা পৌঁছিয়াছিল। মানবকেও যে একদিন জাগিতে হইবে—একথা তখনি ঠিক হইয়া গিয়াছিল। উষা এই জাগরণের বার্ত্তাই চিরকাল আমাদের দ্বারে বহিয়া আনিতেছে—কিন্তু আমাদের দুয়ারের অর্গল সে তাহার মৃদু আঘাতে মুক্ত করিতে পারে না। শিশু মানব পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করে তাহার হাসিতে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি আছে। তেমনি এই উষাও দিবসের শিশু,—সে আমাদের পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করে; তাহার হাসির মধ্যেও একটা দীপ্ত মাধুরী আছে।

আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য তাই আমরা এই স্বর্গ হইতে বঞ্চিত থাকি। তখন প্রাচীর চক্রবালরেখায় স্তর-ভাঙা মেঘ উষারাণীর মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মাথার উপরে চাহিয়া দেখি অসীম আকাশ কি নীল, কি উদার। ওই আকাশের দিকে চাহিলে বক্ষের স্পন্দন স্পষ্টতর হইয়া উঠে। মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা নীল চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে—যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে। এ ডাক যেন,—ঘর-ছাড়িয়া অজানা যাত্রায় বাহির হওয়ার ডাক। মাঝে মাঝে সাদা সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। তাদের মন্থরগতি দেখিলে মনে হয় যেন উহাদের আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে—তাহাদের কিছুমাত্র কর্ম্মচঞ্চলতা নাই,—সুনীল সাগরে ভাসিয়া চলাতেই যেন তাহাদের আনন্দ। আবার শ্যামল ঘাসের উপর শিশির বিন্দুর হাসিখানি কেমন মধুর। সেই হাসি প্রাণকে কেমন পুলকিত করিয়া তুলে। সেই হাসিতে আলোক কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। এ আলোর নৃত্য বড় সুন্দর,—প্রাণ আপনি বলিয়া উঠে—

"আলো ওগো আলো আমার
আলো ভুবন ভরা,
আলো নয়ন ধোওয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।
নাচে আলো নাচে ও ভাই—
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে ওভাই
হৃদয়বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশে ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা!
আলো, আমার আলো ওগো
আলো ভুবন ভরা!"

কি আশ্চর্য্য এই আলোকের খেলা। এই আলোকই আকাশের

মুখে হাসি মাখিয়া দিয়াছে—বাতাসকে মাতাইয়া উঠাইয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতির বীণার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিয়াছে। এ আলোক বাস্তবিকই নাচে, এ আলোক সত্যসত্যই গান গাহে। মনে হয় এ যেন কাহার হাসি বিশ্বপ্রকৃতির পশ্চাতে কাহার দিকে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। নেপথ্য হইতে কে যেন আমাকে ডাকে,—এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের ইহাই সার সত্য।

মনে পড়িল কবির সেই গান—"অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল, বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল।" বাস্তবিক উষাকে তিনিই হৃদয়ের মধ্যে যথার্থভাবে পাইয়াছেন যিনি তাহার এই মূর্ত্তিকল্পনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সাথে মূর্ত্তি কল্পনার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। বহিঃপ্রকৃতি যখন চোখের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে তখন সে প্রাণকে জাগাইয়া তোলে,—তখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। কবি তখনই কল্পনা করে—শিল্পি তখনই সৃষ্টি করিতে বসে—ভাবুক তখনই তন্ময় হইয়া পড়ে। এই অন্তরকে স্পর্শ করার মধ্যেই বহিঃপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থকতা।

ভাবকে না জাগাইলে রূপ হইতে পারে না;—ভাব যখন চরমে পৌঁছে তখনি ভাবুক মুর্ত্তি কল্পনা করে। হিন্দুর দেবদেবী ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তেমনি উষার এই সৌন্দর্য্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই উষার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাকে তখন এই বাহিরের বর্ণবৈচিত্র্য ভুলাইয়া রাখিতে পারে না,—তখন শুধু আকাশে বাতাসে কিম্বা আলোতে তাহার আনন্দ পর্য্যবসিত হয় না—উহারা তখন তাঁহার সেই মানসীপ্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ভারতের কবি যেমন উষা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে—ইউরোপের কবিও তেমন Aurora র মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছে।

কিন্তু আমরা জাগি আর না-ই জাগি—দিনের পর দিন আমাদের

কে যেন মৃদু চরণক্ষেপে আমাদের আঙিনা দিয়া চলিয়া যায়—
যাইবার সময় মধুরকণ্ঠে গাহিয়া যায়—

"জাগো সকলে,
এবে অমৃতের অধিকারী।"

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

সীতারাম কাহিণী।

বাঙ্গালীর রাজা সীতারাম রায় এখন আর কাহারও অপরিচিত নহেন। এখন বাঙ্গলা—শুধু বাঙ্গলা কেন—সমগ্র ভারত তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী স্মরণে গৌরবান্বিত। সীতারাম বাঙ্গালীর অতি আপনার লোক। আপনার লোকের খুঁটি নাটি সব কথা জানিবার জন্ম মানুষ সর্ব্বদাই ব্যগ্র আবার দশজনকে সে সব কথা বলিবার জন্যও তাহার স্বতঃই একটা আগ্রহ উপস্থিত হয়। সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সীতারাম চাঁচড়ার রাজা মনোহর, নলডাঙ্গার রাজা রামদেব, নান্দাইল রাজ শচীপতি ও যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ প্রভৃতির ন্যায় বাঙ্গলার মুসলমান সুবাদারের অধীন একজন জমীদার ছিলেন। সুতরাং তিনি যখন মাতৃভূমিকে মুসলমান শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া চতুর্দ্দিকে নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন তখন যে এই সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারবর্গ তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে না দেখিয়া বরং তাঁহার উন্নতিতে ঈর্ষাপ্রকাশ করিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু মনে মনে সীতারামেরপ্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিলেও প্রত্যক্ষে কাহারও তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিবার সাহস ছিল না। অধিকন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেন। সীতারাম কোনও অন্যায় দাবী করিলেও জমীদারবর্গ তাহা অবনত শিরে পালন করিতেন।

সীতারামের সমসাময়িক পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারবর্গের মধ্যে চাঁচড়ার রাজা মনোহরই ধনে, মানে ও ক্ষমতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা রাজকুমারী অভয়ার বিবাহোপলক্ষে সীতারামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতারাম তখন মহম্মদপুরে ছিলেন না—দেশ জয় করিবার জন্য দূরদেশে ছিলেন। দুইমাস পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া চাঁচড়া রাজের নিমন্ত্রণ পত্রের কথা অবগত হইলেন। আর তাঁহার বিশ্রাম করা হইল না। সেই দিনই সসৈন্যে চাঁচড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়া অল্প সময় মধ্যে নীলগঞ্জের পূর্ব্ব পারে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। এখন নীলগঞ্জের নিম্নস্থ ভৈরব-নদের উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তখন সেতু ছিল না। সুতরাং সীতারাম যখন লোকজন, হাতী, ঘোড়া পার করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি বলিল, "মহারাজ! চাঁচড়ার রাজকুমারীর পরিণয়োৎসব অনেক দিন হইল শেষ হইয়াছে।" কিন্তু সীতারাম সহসা তাহার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য চাঁচড়ায় লোক প্রেরণ করিলেন। সীতারামের আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা মনোহর মহাবিপদ গণিলেন। রাজার সম্বর্দ্ধনার জন্য তখনই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী নীলগঞ্জে প্রেরিত হইলেন।

কর্ম্মচারী সীতারাম সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! প্রায় দুই মাস হইল আমাদের রাজকুমারীর পরিণয় নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে।" কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া সীতারাম কহিলেন,—"বিবাহান্তে আমার আমন্ত্রণ হইল কেন?" কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন,—'বিবাহের বহুদিন পূর্ব্বেই ত মহারাজের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।' সীতারাম কহিলেন,—'আমার আসিতেই যদি বিলম্ব হইয়া থাকে, তবে আমার আগমন প্রতীক্ষায় পরিণয় স্থগিত থাকিল না কেন?' কর্ম্মচারী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 'সে কি মহারাজ! শুভদিন না হইলে ত বিবাহ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ সমস্ত স্থির করিয়া কি করিয়া দিনপরিবর্ত্তন সম্ভব হইত?' সীতারাম

অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলেন,—'শুভদিন! কিসের দিন আর ক্ষণ? যে দিন সীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন সেই দিন চাঁচড়ার শুভদিন বলিয়া গণ্য করা উচিত ছিল। ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান? তোমার রাজাকে যাইয়া বল, হয় আমাকে কর প্রদান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।' কর্ম্মচারী-প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া অনন্যোপায় চাঁচড়ারাজ কর প্রদান করিয়া সীতারামের ক্রোধাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

সীতারামের অন্যায় আবদার আমরা সমর্থন করিতে পারি না বটে কিন্তু তৎকালে তিনি কিরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারবর্গই বা তাঁহাকে কিরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন এই গল্প হইতে আমরা তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

সীতারামের জীবন এইরূপ বহু কাহিনীতে পূর্ণ। সেগুলি সংগৃহীত হইলে তাঁহার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের ইতিহাসের অনেক কথাও জানিতে পারা যাইবে; কিন্তু তাহা সংগ্রহের উপায় কি?

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

পূজা।

বামকরে পুষ্পডালি, শালগ্রাম শিলা
দক্ষিণ করেতে লয়ে, মাতা সে সুশীলা
শুভ্র সুচিবাস পরি' দ্রুতপদ ফেলি'
পূজা-গৃহ পানে ধায়; স্নিগ্ধ আঁখি মেলি'
শিশুটি মাতারে হেরি' দুবাহু বাড়ায়ে
মাতার কোলের লাগি' দাসীরে ছাড়ায়ে
ঝাঁপিয়া পড়িতে চায় মাতৃ ক্রোড় 'পরে—
হাস্যপূর্ণ মুখচ্ছবি আনন্দের ভরে!

নিষেধ করিলা মাতা স্নেহ দৃষ্টি হানি'।
তবুও সে শিশু নিজ ক্ষুদ্র দুই পানি
আবেগে বাড়ায়ে দিয়া পড়িল ঝাঁপিয়া,
সত্রাশে জননী হৃদি উঠিল কাঁপিয়া!
শালগ্রাম, পুষ্পডালি ভূমে গেল পড়ি'
মুক্ত-বাহু মাতা এবে শিশুটিরে ধরি'
আপনার ক্রোড়'পরে বাঁচাল তাহারে,
সস্নেহ-কল্যাণ-ভরে চুম্বি' বারে বারে
পরিতৃপ্ত মাতৃ-হিয়া।

পূজক ব্রাহ্মণ

আসিল তথায়, হেরি' ভূমে নারায়ণ
উঠিল জ্বলিয়া। গেল অভিশপ্ত করি'
জননীর মাতৃস্নেহ! পা দু'খানি ধরি'
সুশীলা কহিল,—"কৃপা কর হে ব্রাহ্মণ,
জননীর মাতৃস্নেহ, সে কি নারায়ণ
অজ্ঞাত আজিও হায়! চিরদিন ধরি'
যাঁর হৃদি সুকোমল—সেই মোর হরি
জননীর স্নেহ হেরি' কভু কি কাতর?
এ শিলা কি শিলা শুধু,—কেবলি পাথর?"

সক্রোধে কহিলা বিপ্র, "দূর হ'রে দূর,
সন্তানের স্নেহবশে ফেলিয়া ঠাকুর
লইলি তাহারে ক্রোড়ে; হায় মূঢ় নারী!
যাঁহার সন্তান মোরা—অপমান্ তাঁরি?"
বিগলিত অশ্রু ভারে নম্র আঁখি তুলি'
চাহিলা সুশীলা শূন্যে; গেল সব ভুলি'
পুত্র মুখে হাসি হেরি'। চুম্বিয়া শিশুরে
ভূমি হ'তে গেল উঠি অতি ধীরে ধীরে।

মাতা পিতা দ্রুত আসি' এই দৃশ্য হেরি,
সভয়ে কহিলা, "হায়, আর নাহি দেরী
কল্যাণেতে অকল্যাণ, অশুভ মঙ্গলে,
কি জানি কি হবে হায় এই কর্ম্মফলে!"
ভৎর্সিল পিতা মাতা, পূজক ব্রাহ্মণ;
হাসিল আনন্দ ভরে নর-নারায়ণ!
পূজক চলিয়া গেল রাগে ভরপূর,
গ্রহণ করিল পূজা প্রাণের ঠাকুর!
পূজার রচিত মাল্য রহে ধূলি-তলে,
দুলিছে সবার মাল্য সে হরির গলে!

মানুষের মাঝে যারে কহি' নারায়ণ
পূজক করিছে পূজা—তিনি তাহা নন্।
তিনি জননীর প্রাণে, পিতার হৃদয়ে—
ভ্রাতা ভগিনীর মাঝে সব সুখ লয়ে
শিশু-বৃদ্ধ-যুবকের মনে রাত্রিদিন
বিরাজিত ভূমানন্দে; মাতৃস্নেহ-হীন
তিনি নন্ কভু ওগো; সব স্নেহ ধরি'
সংসারের দুঃখ ত্রাশ ভয় ক্ষোভে হরি'
জননী, সন্তান, পিতা—চণ্ডাল ব্রাহ্মণ,
সকলেরি হৃদে রাজে সেই নারায়ণ।

শ্রী ত্রিগুণানন্দ রায়।

কৌতুক

(হীরেনের পত্র)

কল্যানী, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০২।

বরষার ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলে আমার নির্জ্জন কুটীরেবসিয়া উদ্দেশ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে বারিপতনের দিকে চাহিয়া আছি। ঝুর ঝুর রবে বরষার ধারা অবিশ্রাম ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়ের

দুঃখ ভার লাঘব করিবার জন্য আকুলভাবে অশ্রুপাত করিতেছেন! হায়, এইরূপে সারাজীবন ভরিয়া অশ্রুপাত করিলে কি আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে?

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরপাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল, ভেকগুলির আনন্দকোলাহল বরষার গাম্ভীর্য্য আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল। দুই একটা পেঁচক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অন্ধকারে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করিতেছিল। তখনও আমি সেই অন্ধকার কুঠরীতে নীরবে বসিয়া! ভৃত্য তাহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে প্রদীপ জ্বালিতে আসিয়াছিল—আমি তাহাকে নিষেধ করায় সে নীরবে চলিয়া গেল। আমাকে এইরূপ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, অন্ধকারের পেঁচক অনুভবে চর্ম্ম চটিকাগুলি মাথার উপরে আসিয়া আঘাত করিয়া আমার চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল।

আজ কত চিন্তা যে আমার মনের মধ্যে উঠিতেছে, পড়িতেছে, চূর্ণ হইয়া যাইতেছে তাহার অন্ত নাই। ক্রমে রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, চর্ম্মচটিকার উপদ্রবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তুমি শুক্লপক্ষের প্রথম ভাগে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছ আর আজ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ইতিমধ্যে তোমাকে ৪ খানা পত্র লিখিয়াছি কিন্তু ভুলেও তুমি এক খানার উত্তরও প্রদান করিলে না। আজ তোমার নিকট আর একখানা শেষ চিঠি লিখিব মনে করিয়া আলো জ্বালিয়া বসিয়াছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল। পত্রখানা তোমার বৌদির লিখা। তাহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে এই সংসার কিছুই নয়, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ শুধুই হলাহলপূর্ণ—সকলই ছলনামাত্র।

এতদিন তোমার সাড়াশব্দ না পাইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি হয়ত শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পত্র লিখিতে পারিতেছ না, কিন্তু তাহাও নয়। শুনিতে পাইলাম পিত্রালয়ের অযাচিত অন্নে ও অপরিমিত স্নেহে তোমার দৈহিক ব্যাস দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে—লঘুত্ব এখন গুরুত্বে পরিণত হইয়াছে।

মনে করিতাম তাহা এখন ঘোরতর নির্ম্মমতায় পরিণত হইয়াছে। আমাকে ব্যথা দিতে, আমাকে কাঁদাইতে যেন তুমি আনন্দ অনুভব করিয়া থাক। এতকাল চেষ্টা করিয়াও তোমার মন পাইলাম না, আর তাহা পাইব ও না। আমি ভিতরকার সকল কথাই সংগ্রহ করিয়াছি; তোমার মন কি পদার্থে গঠিত তাহাও বুঝিয়াছি।

আমি এতকাল আশায় আশান্বিত হইয়া সংসারটাকে সুখের নিলয় বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম। তুমি এখানে থাকিতে কখন কি ভাবে সময় অতিবাহিত করিয়াছি, তোমাকে কি কথাটী কহিয়াছি তাহা চিন্তা করিয়াই আমি এখন যেন অপার শান্তি লাভ করিয়া থাকি। বাড়ী যাওয়ার প্রাক্কালে তোমার সেই হর্ষোদ্দীপ্ত চিবুকখানা ধরিয়া কানে কানে কথা কহিবার ছলে তোমাকে যে জিনিষটী উপহার দিয়াছিলাম এবং তুমি তাহা পুনর্ব্বার কেমন করিয়া প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে সেই সুখস্মৃতি টুকু মনে করিয়াও এখন আমার অন্তরে প্রভূত শান্তি অনুভব করিয়া থাকি। সেই তুমি যে এখন এমনটী হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। যে শোভা এখানে আমার কণ্ঠের হার ছিল, যে শোভা আমার শয়নে নিদ্রা, জাগরণে সুখ অনশনে অমৃত, পীড়ায় শান্তনা, সেবায় দাসী ছিল, হায় আজ সেই আমার শোভাময়ীর এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তাহা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অশ্রুসিক্ত আঁখি অন্ধ হইতে চায়। তোমাকে এখন অধিক লিখা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়। তুমি সুখে থাকিও—ইহাই প্রার্থনা।

আমি তোমার পত্র না পাইয়া তোমার বৌদির নিকট পত্র লিখিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, সেই অশনি-কঠোর পত্র খানা সঙ্গে পাঠাইতেছি, পাঠ করিয়া দেখিও।

আমার অকৃত্রিম ভালবাসা, অপরিসীম স্নেহ, আকুল অনুরাগ সহজে লাভ করিয়া পায় ঠেলিয়া তাহা চূর্ণ করিয়াছ বেশ করিয়াছ; কিন্তু একদিন ইহার মুল্য বুঝিতে পারিয়া অনুতাপ করিবে শোভা, একদিন ইহার জন্য

ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সেখান হইতে কোথায় যাইব তাহার স্থির নাই। তোমার সঙ্গে ইহাই আমার শেষ সাক্ষাৎ। মনে করিও আজ হইতে তুমি * * * হইলে। ইতি

চির শুভাকাঙ্ক্ষী

হতভাগ্য হীরেন

পুঃ আমি সম্বলপুর আমার বাল্যবন্ধু নগেনের বাসায় ৩ দিন অবস্থান করিব।

(তোমার বউদিদির পত্র।)

হীরেন্।

১লা শ্রাবন ১৩০২

প্রিয় হীরেনবাবু—

আপনার পত্রখানা পাইয়া খুব সুখী হইলাম। মাঝে মাঝে এইরূপে আমাদিগকে স্মরণ করিলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব। বোধ করি প্রাণের প্রাণটী প্রাণের কাছে থাকিলে আর আমাদের স্মৃতি মনে জাগরিত হইবে না।

সে যাহা হউক আপনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই এখন আপনাকে লিখিতেছি। আপনার প্রাণের শোভা মাসাধিক কাল হইল এখানে আসিয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার শারীরিক বা মানসিক কোনও পীড়ারই লক্ষণ আমরা অনুভব করিতে পারি নাই এবং তাহার শরীর ক্রমশঃই এখানে আসিয়া সুস্থ হইতেছে।

আপনার চিঠি প্রায়ই আসিতেছে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাকে কখনও কলম হাতে করিতে দেখি নাই। আপনি বেশ সুরসিক, প্রাণটী আপনার প্রেমপূর্ণ, শোভাকে আপনার সরলপ্রাণের সরলভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছেন কিন্তু প্রতিদানে তাহার নিকট হইতে শুধু উপেক্ষা, অবহেলা লাভ করা বস্তুতঃই মর্ম্মান্তিক সন্দেহ নাই। আপনি শোভাকে যে সকল চিঠি লিখেন তাহা অযত্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, তাই আমরা পাঠ করিয়া আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছি এবং তজ্জন্য শোভাকে অনেক অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিয়াছি। কিন্তু তদুত্তরে সে যাহা বলে তাহা

এরূপ হইবার কারণ কি? নিশ্চয়ই এ জন্য আপনি দায়ী,—কারণ অবলার কোমল প্রাণ আপনা হইতেই গঙ্গার-জলধারার ন্যায় উন্মত্ত-প্রবাহে শত বাধা বিঘ্ন ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া স্বামী-সাগর-বক্ষে ছুটিয়া যাইয়া সম্মিলিত হইয়া পড়ে। আপনি কি তাহা হইলে কোনও—প্রেমে আবদ্ধ? তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলে শোভাকে পাইবেন। আমরা ভাল, আপনার কুশল চাই। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রতিভা বসু।

হীরেনের পত্র।

প্রীতিভাজনীয়া—

শ্রীমতী প্রতিভা বসু

করকমলে—

আপনার পত্র পৌছিবার পূর্ব্বে যদি আমার মস্তকে অশনি সম্পাৎ হইত তাহা হইলে এ জীবন সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতাম।

শোভা সুস্থ আছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এবং আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও যে সরল ভাবে আমাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন সেজন্য আপনাকে কী বলিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আপনি আমাকে সন্দেহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমস্ত মানবের মস্তকের উপরে যাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর জানেন আমি এক শোভা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানি কি না, জীবনে অন্য কাহাকেও ভাল বাসিয়াছি কি না। অধিক কিছু লিখিবার শক্তি আমার নাই। সেই কুহকিনীকে বলিবেন যে আমি তাহার ভালবাসার উপযুক্ত হইতে পারি নাই, সে যেন তাহার বাঞ্ছিত ধনকে লইয়া সুখী হয়। আমি চিরকালের জন্য দূর হইলাম, সকল সম্পর্ক এখানেই পরিসমাপ্ত হইল। বিদায়—

(শোভার পত্র)

৮ই শ্রাবণ ১২০২

প্রাণাধিক,

তুমি যদি এইরূপ নির্ম্মম পাষাণের মত আমাকে অকূল সাগরে না ভাসাইয়া আমার হৃদয়টাকে স্বহস্তে দলিত করিয়া যাইতে আমার জীবনলীলা চিরকালের জন্য পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে তাহা হইলে আমার পক্ষে উহাই সুখকর হইত। তুমি যে হতভাগিনীকে এত সহজেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবে তাহা আমি কখন ধারণাও করিতে পারি নাই। প্রিয়তম, জীবনদেবতা, আমি যে গো তোমার ভালবাসায়, তোমার অনন্ত স্নেহে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম। তোমার প্রেমকুঞ্জে সুখের বাসর স্থাপন করিয়া আপনার জীবন ধন্য মনে করিয়াছিলাম। সংসারের কোনও ঝটিকায়ই যে তাহাকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে তেমন বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু, হায়, তুমি একটু অনুসন্ধান করিয়াও দেখিলে না!

কিঁ করিয়া আমি আমার মনের কথা, হৃদয়ের আবেগ তোমাকে জানাইব তাহা বুঝিতেছি না, কি লিখিতে কি লিখিয়া ফেলি, ক্রটী হইলে অভাগিনীকে মার্জ্জনা করিও। তোমার পত্র পাইয়া অবধি আমি জ্ঞানহারা উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছি।

তোমার পত্রের সঙ্গে বৌ'দির পত্রখানা দেখিয়া ইহা তাঁহারই দুষ্টামী মনে করিয়া আমি পত্রসহ তাঁহার পায় গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম যে পোড়ারমুখী বৌদিদিই সকল অনিষ্টের মূল। তাঁহার ছেলেমীতেই এখন আমার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। যাহা হউক, সে এখন আপন মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণাধিক, তুমি যে এইরূপে তোমার প্রাণের শোভাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে পারিবে, তাহাকে অকূলসাগরে ভাসাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে তাহা মরিলেও ত বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু ভাগ্যে যদি তাহাই থাকে, তবে যাইবার আগে শুধু একটীবার মাত্র এ অভাগিনীকে দেখা দিয়া যাইও ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। অভাগিনীর এমন কোনও গুণ নাই যাহাতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে

পারে, এমন কিছুই নাই যাহাতে তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা হইতে ফিরাইয়া লইতে পারে। তুমি আমার স্বামী, আমার পরমগুরু, ইহকাল পরকালের একমাত্র দেবতা; আশীর্ব্বাদ করিও যেন তোমার পবিত্র নাম লইয়াই আমার এ পাপ দেহের অবসান হয়।

ওগো, তোমার চিরবিচ্ছেদ কল্পনা করিতে ও আমার শরীর কেমন হইয়া যায়। ওগো একবার তুমি স্বহস্তে এ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের অন্তস্থল দেখিয়া যাও।

এখন প্রকৃত ঘটনাটা কি, লিখি,—বিশ্বাস হইলে অভাগিনীকে দেখিয়া যাইও। আমার দাদা যে পোষ্টমাষ্টার এবং আমাদের বাড়ীতেই যে পোষ্ট আফিস তাহা তুমি জান। আমি তোমার কাছে পত্র লিখিয়া নিজে ডাকে দিতে পারিতাম না, দাদা ঠাট্টা করিত। তোমার পত্র পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎই তাহার উত্তর লিখিয়া বরাবর বৌদির নিকট দিতেছিলাম; সে দাদার কাছে দিত এরূপ আমি মনে করিতাম। কিন্তু পোড়ারমুখী দুষ্টামী করিয়া তাহা করিত না। সে আমার প্রতি তোমার প্রেম ও অনুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য আমার চিঠিগুলি খুলিয়া পাঠ করিত এবং নিজের কাছেই রাখিয়া দিত। তাই তুমি আমার পত্র পাও নাই। তোমার প্রতি পত্রই শুধু অনুযোগপূর্ণ দেখিয়া কেন আমার পত্র তোমার নিকট পৌঁছায় না তাহা দাদাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বৌদিকে বলিয়াছিলাম কিন্তু তখনও কালামুখী আমাকে মিথ্যা কথা কহিয়া প্রবোধ দিয়াছিল। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা এই সঙ্গে বৌদির পত্রেই জানিতে পারিবে।

আমার মাথা খাও, এখন সকল কথা শুনিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিও, একটীবার দেখা দিও। তুমি যেখানে গিয়াছ সেখান হইতে আসিতে নাকি দুই দিন লাগে। আমার পত্র যাইতেও দুই দিন লাগিবে, আমি কোনওরূপে এই চারি দিন মনকে বুঝাইয়া থাকিব। বৌদি বেচারি না বুঝিয়া এরূপ কাজ করিয়া এখন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। তাহার অনুরোধে আমি এই কথা আর কাহাকেও জানাই নাই কিন্তু পঞ্চম দিনে

বাবার পায় যাইয়া কাঁদিয়া পড়িব, মাটিতে মাথা খুঁড়িয়া আত্মহত্যা করিব। অধিক আর কি লিখিব আমি আর পারি না, তুমি আসিও। একবার হইলেও তুমি আসিও—তুমি আসিও। ইতি

তোমার চরণের দাসী

শোভা

(শোভার পত্র)

৮ই শ্রাবণ

১৩০২

প্রিয় নগেন্ বাবু,

আজ বড় বিপদে পড়িয়া এই দুঃখিনী আপনার দ্বারস্থ হইতেছে। প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া উপকৃত করিবেন ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

আপনার বন্ধু কোনও কারণবশতঃ রাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি হতভাগিনী যে কি অবস্থায় সময় অতিবাহিত করিতেছি তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমার পত্রপাঠ মাত্র আপনি যদি তাঁহাকে এখানে পাঠাইতে না পারেন তবে জানিবেন এ হতভাগিনী আর ইহজগতে নাই। আজ আপনার বন্ধুর নিকট যে সকল পত্র যাইয়া পৌছিবে তাহাতেই সকল অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। অধিক কিছু লিখিবার ক্ষমতা আমার নাই। ইতি

হতভাগিনী

শোভাময়ী বসু।

(প্রতিভার পত্র)

৮ই শ্রাবণ

১৩০২।

প্রিয় হীরেন বাবু,

নির্ব্বোধ অবলাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যেরূপ কঠিন আঘাত আপনাকে দিয়াছি যদিও তাহার মার্জ্জনা নাই তবুও আশাকরি অবলা জাতি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি

কৌতুক করিতে যাইয়া যে এমন সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিব তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিলে আমি কখনই একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সেজন্য এখন অত্যন্ত আত্মগ্লানি ও মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছি। আমাকে এই দারুণ কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করুন। শোভার দাদা একথা শুনিলে আমার রক্ষা নাই। হীরেন বাবু, আমার মাথা খান, পত্র পাঠ মাত্র আপনি এখানে চলিয়া আসিবেন। শোভার দুরবস্থা আর সহ্য করিতে পারিনা; হায়, আমার কি দুর্ব্বুদ্ধিই না ঘটিয়াছিল!!

শুধু কৌতুক করা বই আমার মনে আর অন্য কোনও ভাব ছিলনা। আপনার একটা পত্রে আপনার বড় রসের ছড়াছড়ি দেখিয়া শোভার প্রতি আপনার কেমন প্রেম, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেমন একটা কৌতুকের উদ্রেক হইল, সেই কৌতুকই আমার কাল হইল। সে যখন পত্র লিখিয়া আমার কাছে দিত, তখনই আমি তাহা খুলিয়া পাঠ করিতাম এবং আমার বাক্সে রাখিয়া দিতাম। অবশেষে আপনি আমাকে পত্র লিখিলে আমি শুধু কতগুলি মিথ্যা কথায় পূর্ণ করিয়া একখানা পত্র আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তাহাই আমার মূর্খতার পরাকাষ্ঠা। আপনি এখানে আসিলে শোভার সবগুলি পত্রই আপনাকে দেখাইব। শোভার ন্যায় গুণবতী মেয়ে আজকাল খুব অল্পই দেখা যায়, তাই সে এত অল্প দিনেই আপনাকে এমন অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

এই হতভাগিনীদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। শুধু আপনার আগমনের উপর দুইটা বৃহৎ পরিবারের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে।

আপনি "ভাই বৌর কথায় ননদিনীর মুণ্ডপাত" প্রবাদের অনুসরণ করিয়া আপন দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, একথা বলিলে যদিও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না তথাপি আমি এখন আপনার উপর সে দোষ আরোপিত করিতেছি না। আপনি না আসিলে শোভা প্রাণে মরিবে, আমিও আত্মগ্লানীতে উন্মাদিনী হইব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

প্রতিভা।

(নগেনবাবুর পত্র।)

১১ই শ্রাবণ
১৩০২।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শোভাময়ী বসু
সমীপেষু—

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পত্র পাইয়া অনেক চেষ্টার পর হীরেনের নিকট হইতে আপনার পত্রগুলি হস্তগত করিয়া সকল অবস্থা অবগত হইয়াছি। আমার স্ত্রী তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া নাকাল করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহাকে গৈরীক বসন পরাইয়া, সকল অঙ্গে ভষ্ম মাখিয়া দিয়া, উনুন ধরাবার চিম্‌টে থানা হাতেদিয়া তাহার দুর্দ্দশার একশেষ করিতেছিল কিন্তু আমি তখন হীরেনের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। হীরেন অদ্যই বিকালের গাড়ীতে রওয়ানা হইবে এবং আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আপনার সমীপে উপস্তিত হইবে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমি নিজে টিকিট করিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আপনাদের প্রেম-শিকলি যে একবার গলায় পরিয়াছে তাহার সাধ্য কি যে আবার সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ করিতে সমর্থ হয়? আজ এই পর্য্যন্ত—আসিতে পারি। ইতি—

শুভাকাঙ্খী
শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়।

হীরেনের পত্র।

১৩ই শ্রাবণ
১৩১২

প্রিয় ভাই নগেন্,

গতকল্য রাত্রি ৮টার সময় 'অসার খলু সংসারের সার' আশ্রম শ্বশুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্বশুর-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি। বেচারি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার কোলে প্রায় একরূপ মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িয়া গেল। কাহার সাধ্য তাহার অশ্রুবেগ রোধ করে? দেখিয়া হৃদয়টা আমার ভাঙ্গিয়া গেল, আমিও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার মুখে ঐ এক কথা "আমি এমনই পাপীষ্ঠা যে আমাকে একটীবার পরীক্ষা করিয়াও পরিত্যাগ করিতে তোমার ইচ্ছা হইল না। এই বুঝি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা এই বুঝি তোমার প্রেম?" ইত্যাদি আরও অনেক কথা তোমাকে আর কত লিখিব? আমি মস্তক অবনত করিয়া সকল ক্রটী স্কন্ধে লইয়াছি; কেবলই মনে হইতেছে যে হায় না বুঝিয়া কি কাযই করিতে বসিয়াছিলাম। অনুতাপও হইতেছে আবার পাগলামির কথা মনে করিয়া হাসিও পাইতেছে—লজ্জাও হইতেছে। সে যাহা হউক, অবশেষে দানপ্রতিদানে আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি।

বৌদি এমনই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি আমার সম্মুখে আসিতে কি আমার সঙ্গে কথা বলিতে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়াছিলেন। দোষটা যে শুধু তাঁহার নহে, আমিও তুল্যাংশে দোষী তাহা তাঁহাকে অনেক কষ্টে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। বিশেষ কোনও গোল হয় নাই।

তুমি বহুদিন যাবৎ আমাকে তোমাদের ওখানে যাইতে লিখিতে ছিলে, যাই হোক এই উপলক্ষে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎটা হইয়া গেল। তোমার গিন্নীর ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি তাঁহাকে ভালবাসা জানাবে। ইতি

তোমারই
হীরেন্।

প্রার্থনা।

হে মোর বিধাতা ক'রে দাও মোরে নির্ম্মল স্রোতজল,
তৃষিত-কণ্ঠে পীযুষ ঢালিয়া জনম করি সফল।
ক'রো না আমায় জলদ-চুম্বী উন্নত গিরি-শির,
ক'রে দাও মোরে তৃষিতের প্রাণ স্বচ্ছ উৎস-নীর।
যষ্ঠী হইয়া অন্ধজনের আশ্রয় করি দান,
ক'রোনা রক্ষ সেনানীর ক'রে তরবারি খরশান্।
ক'রো না আমায় মদিরার ধারা ওগো ও জগৎ প্রভু—
কুসুম-কোমল মানবের প্রাণ বিপথে ভাসাতে কভু।
করে দাও মোরে রুগ্ন-শিয়রে স্বরগ সঞ্জীবনী –
তোমার চরণ-পরশ বিলায়ে আপনা ধন্যগণি।
গলিত জীর্ণ পর্ণকুটীরে তৃণ হয়ে রই যদি
চাহিনা শোভিতে নৃমণি মুকুট উজলিয়া নিরবধি।
তোমারি নামের প্রতি অক্ষরে মিশায়ে রহিব আমি
বিশ্ব জুড়িয়া ধ্বনিতে শুধুই ;—ওগো ও জগৎস্বামী।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

শারদীয় অবকাশান্তে বন্ধুবান্ধবদিগকে আমাদের সাদর সম্বোধন জ্ঞাপন করিতেছি। জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কখন কি হয় বলা যায় না, তাই আজ দীর্ঘাবকাশের পর পুনরায় বন্ধুবান্ধবদিগকে সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি।

*　　*　　*　　*

কার্ত্তিকের প্রীতি অগ্রহায়ণের প্রথমে প্রকাশিত হইবে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আমাদিগের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এইরূপ কাল বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। সেন মহাশয় বহুদিন পরে দেশে

গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে চৈত্র মাসের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ-বিদগ্ধ—করিয়া প্রীতির কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম তিনি একাধারে ছাত্র, কলেজ হোষ্টেল সমূহের এসিসটেণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, প্রীতির কার্য্যাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক হইবারও উপক্রম করিয়াছিলেন। এতগুলি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি দেশে যাইবার উপযুক্ত অবসর পান নাই সুতরাং একবার বিশ্রামের আস্বাদ পাইয়া সহজে তৃপ্ত হইবেন না তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু শূন্য কলিকাতা ভরিয়া উঠিল, রুদ্ধ বিদ্যালয় সমূহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া মাসাধিক কালের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া যৌবনসুলভ কলকণ্ঠনিনাদে ভরপূর হইয়া উঠিল, মেসের ঠাকুর চাকর পূর্ব্ববৎ বাজার খরচের আয়ে পুষ্ট হইয়া কান্তিপূর্ণ এবং কলহপ্রিয় হইয়া উঠিল, এত দিনেও যে তিনি গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না ইহা বড়ই অনুতাপের বিষয়। আমরা পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় চাহিয়া আছি, আশা করি তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবেন। * * * *

এই সংখ্যার প্রীতিতে স্বর্গীয় মিঃ এ্যালানহিউমের প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল। ইনি ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত সিভিলিয়ান্, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ভারতবর্ষ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সার ফিরোজসা, সার উইলিয়ম ওয়েডার বর্ণ, এবং মিঃ হিউম ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপন করেন। ইনি কহিয়াছিলেন "Nations by themselves are made." টাউনহলে একটী বিরাট সভায় কলিকাতাস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যে ইঁহার সম্মানার্থে একটী স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়াছিলেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

শিবপুরে নৌকা ডুবি।

গত ১৯শে নবেম্বর শিবপুর কলেজঘাটে টাইটানিকের পুনরাভিনয় হইয়াগিয়াছে। ঐ দিবস কলিকাতাস্থ Y. M. C. A. র কতিপয় কলেজ এবং স্কুলের ছাত্র বনভোজনের নিমিত্ত শিবপুর গমন করেন। তথায় জল অল্প বলিয়া ষ্টীমার ঘাটে ভিড়িতে পারে না এবং যাত্রিদিগকে ঘাট সংলগ্ন নৌকাতে নামাইয়া দেওয়া হয়। যাইবার সময় কোন গোলযোগ হয় নাই। সারাদিন আমোদ প্রমোদের পর সন্ধ্যাঅন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সকলে আবার কলেজ ঘাটে ফিরিয়া আসিলেন—দুই দল ষ্টীমারে যাইয়া উঠিলেন—তখনো ৪০৫০ জন বাকী রহিয়াছেন। মাঝি বলিয়া উঠিল—"এবি জাহাজ ছোড়ে গা"—একথা শুনিবামাত্র সকলে লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন—ফলে নৌকাখানি উল্টিয়া গেল। শুনিয়াছি তথায় ৩।৪ হাতের বেশী জল হইবে না কিন্তু স্রোত নাকি খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। তবু যাঁহারা সাঁতার জানিতেন তাঁহারা সকলেই বাঁচিতে পারিতেন কিন্তু যাঁহারা সাঁতার জানিতেন না তাঁহারা তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরেন—ফলে উভয়ে সলিল সমাধি লাভ করেন।

মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এবং পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে যাঁহারা অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে কতিপয় জলমগ্ন ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। যে সমস্ত ছাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মপর ভুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন আমরা যতদূর পারিয়াছি তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া আজ প্রীতির গ্রাহকবর্গকে উপহার দিতেছি :—

শ্রীঅপূর্ব্বরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীরোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীবিজয়কুমার গুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রকৃতিকুমার ঘোষ (সিটি কলেজ) শ্রীহরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসনৎকুমার হালদার (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ)।

ইঁহারা ছাত্রসমাজ এবং বাঙ্গালী জাতির মুখউজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালীও বিপন্মুখ নিপতিতের উদ্ধার কল্পে আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিতে জানে। জগতের ইতিহাসে তাহারাও মনুষ্যত্বের দাবী করিতে পারে।

আমরা আজ এই জলমগ্ন বন্ধুদিগের পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। যে সকল হতভাগ্য ভদ্রসন্তান দৈব নির্য্যাতনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগের আত্মার শান্তিবিধান করুণ ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

৺যোগেন্দ্রনাথ বসু।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"
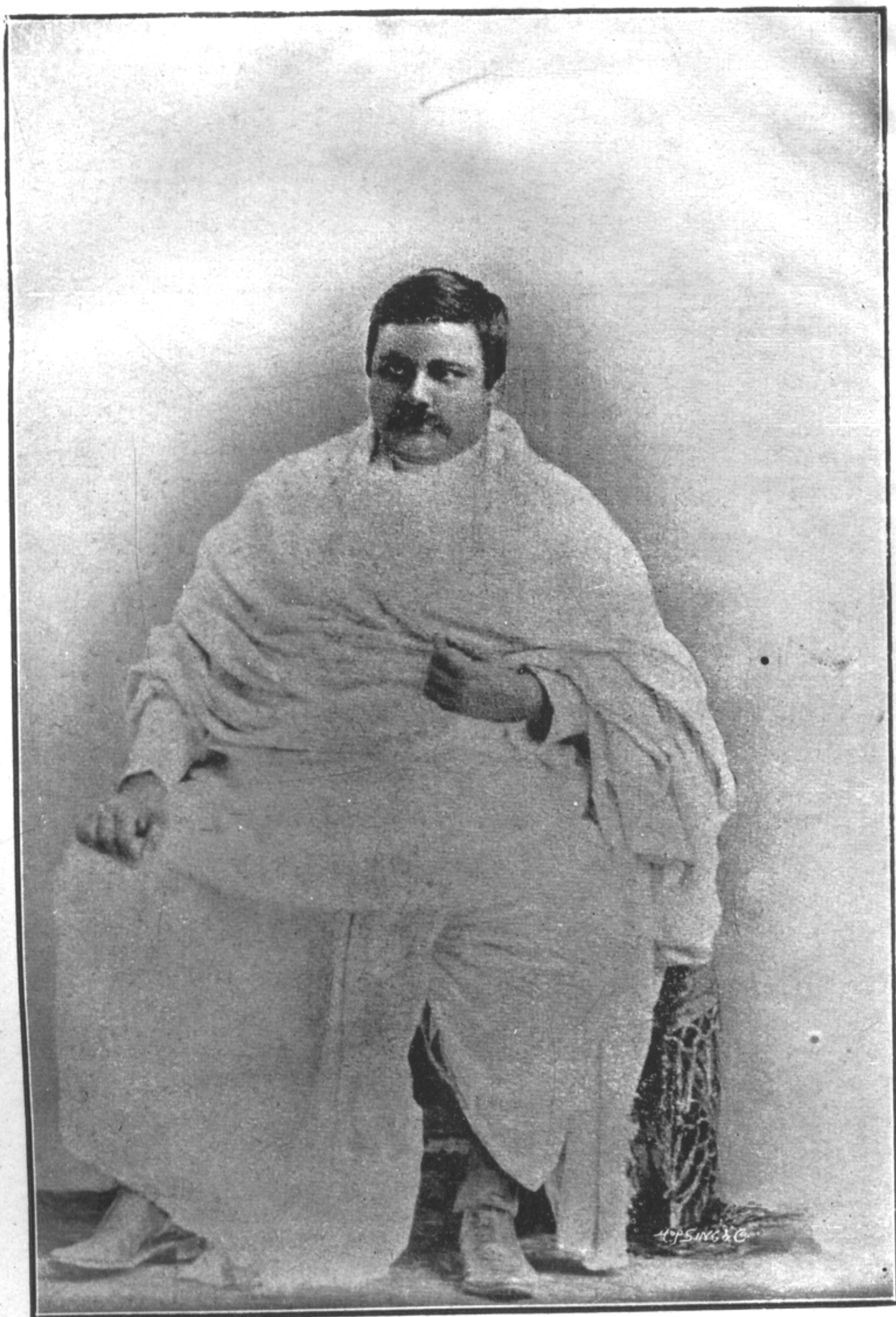
সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ [৮ম সংখ্যা।

ভাবের প্রতি।

জাগাও হৃদয় মোর হে সুন্দরতম!
স্পর্শে অনুভূতি প্রাণ এস অনুপম।
যোড় করে করি তোমা সাদরে আহ্বান.
লালসায় চেয়ে আছে মানস নয়ান।
সঞ্চারি পুলক প্রীতি ধীরে এস চলে,
ঐ আকাশের নীল মেঘখানি খুলে।
আনন্দে আরোহী এস সুমন্দ পবন,
স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হোক নিখিল ভুবন;
হ'ব তৃপ্ত, সুধা-উৎস বহি যাবে প্রাণে
মত্ত ভৃঙ্গ সম রব তব রূপ পানে,
(কিম্বা) রচিয়া সোণার স্বপ্ন ধ্যান মগ্ন প্রাণে,
উচ্ছাসে ছুটিয়া এস মধু গুঞ্জরণে,

তরঙ্গিত দরিয়ায় উঠিবে সুতান,
বিমোহি হাসিবে চন্দ্র উজলি বিমান।
বিহঙ্গের ক্লান্তি হরা মধুর সঙ্গীত
করিয়া তুলিবে সুধা সম চারিভিত ;
তোমার অমৃত গন্ধে হ'বে মুগ্ধমান
বীণা হস্তে কল্পনার হবে অধিষ্ঠান।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আপনাদের হৃদয়শোণিত দান করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, স্বর্গগত যোগেন্দ্র চন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি শুধু জ্ঞানবীর ছিলেন না, তিনি একজন কর্ম্মবীর ও ছিলেন। তিনি শুধু সাহিত্যসেবা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গতানুগতিক সাহিত্যস্রোতের প্রবাহপন্থা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—সাহিত্যসেবায় কর্ম্মের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ স্বর্গগত, কিন্তু তাঁহার শক্তি আজ বঙ্গের সাহিত্যসমাজ ও ধর্ম্মজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম্মশীল রহিয়া তাহাদিগকে আজিও সঞ্জীবন সুধা দান করিতেছে। প্রতিবৎসর স্মৃতিসভায় এই পুরুষ-সিংহের বিষয় আলোচিত হইলেও তাঁহার জীবনকথা কখনও নবীনতা ও সৌন্দর্য্য হারায় নাই—পরন্তু পাষাণ ফলকে চন্দন দারুর ঘর্ষণের ন্যায়, যতই আলোচিত ও বিবৃত হয় ততই সরস, মৃদু ও সত্নমধুর গন্ধে অন্তরাত্মা পুলকিত করিতে থাকে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র অতি অল্পবয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি চুঁচুড়ায় সাধারণীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকারের অধীনে পত্রিকাসম্পাদন শিক্ষা করিতে থাকেন। অতি উপযুক্ত গুরুর নিকটই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী'ই তাঁহার কীর্ত্তিকেতু। রথী আজ স্বর্গগত হইলেও আজিও তাঁহার

সাহিত্য রথের রম্য তূর্য্য তাঁহার জয়শব্দ ধ্বনিত করিতেছে। ১২৮৮ সালের ২৬ শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভক্ষণে বঙ্গবাসীর জন্ম। তৎকালিক সংবাদপত্রের সর্ব্ববিধ গ্লানি বিদূরিত করিয়া নবীন আদর্শে, বঙ্গের জনসাধারণের প্রতিনিধির কার্য্য ও দায়িত্বভার দিয়া, যোগেন বাবু বঙ্গবাসীকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। আজিও সকল সংবাদ পত্রই তাঁহারি পন্থা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যোগেনবাবু বঙ্গবাসীকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া স্ব হৃদয়ের রস-সৌন্দর্য্য আপনার বিশাল তেজস্বী অথচ মধুর ও সুকুমার প্রাণটীকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বঙ্গবাসী শুধু নির্জীব সংবাদপত্র মাত্র ছিল না—তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সাধারণসংবাদপত্র অপেক্ষা গুরুতর ছিল। তাঁহার বঙ্গবাসী জীবনময় সংস্কারকের বেশে বাঙ্গালীর সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল। এই বঙ্গবাসীর অঙ্ক, তাঁহার সময়ের দেশের অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সমরক্ষেত্রের কার্য্য করিয়াছিল।

সাহিত্যে তাঁহার বঙ্গবাসী সর্ব্ববিধ আবর্জ্জনা দূর করিয়া নবীন আদর্শ দিয়াছিল, সমাজে তাঁহার বঙ্গবাসী সর্ব্ববিধ নীচতা সংকীর্ণতা, গ্লানি ও ভণ্ডতার প্রতি তীব্রশ্লেষ, ব্যঙ্গ এবং কষাঘাত বহন করিয়া ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডগণকে সতত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছিল, ধর্ম্মজগতে হিন্দুর সদাচার, নিষ্ঠা, ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার মহিমাকীর্ত্তন করিয়া, ভারতের অতীত স্মৃতি উদ্বোধন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে যেথায় উচ্চশিক্ষার অভাব, তথায় বঙ্গবাসী শিক্ষক ও গুরুর কার্য্য করিয়াছে। পল্লীবণিকের বিপণি হইতে ভূম্যাধিকারীর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত, কঞ্চুকীর ন্যায়, সর্ব্বত্র বঙ্গবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল। সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা ও দেশের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার বঙ্গবাসী পল্লীভূমে গমন করিত, আবার তাহাদের দুঃখ যাতনা, অভিযোগ ও আবেদন বহন করিয়া রাজদ্বারে উপনীত হইত—অনুনয়, বিনয়,—প্রয়োজন হইলে বিতর্ক পর্য্যন্ত করিয়াছে। এককথায় বঙ্গবাসী তখন দেশের

একাধারে সচীব, বন্ধু ও নেতার কাজ করিয়াছে। দেশের বাসনা ও সাধনা, সমগ্রজাতির অনুভূতি ও বেদনা, জ্ঞান গৌরব সমস্তই, গোমুখীর মধ্যদিয়া জাহ্নবীধারার ন্যায় বঙ্গবাসীর মধ্যদিয়া বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে। যবনিকার অন্তরালে একা আড়ম্বরশূণ্য নিভৃত-কর্ম্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র যন্ত্রচালনার সমস্ত কার্য্য সাধন করিতেন।

তাঁহার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান,—সুলভে শাস্ত্র প্রকাশ। আজ যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে নিত্য ধর্ম্মচর্য্যার সাহায্য করিতেছে—নিঃস্বচতুষ্পাঠীর শিক্ষা বিস্তারে অনুকূলতা করিতেছে, সে সকল গ্রন্থ-যোগেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহেই মুদ্রিতাকার প্রাপ্ত হইতেছে। দরিদ্র গৃহস্থ, ভিখারী ব্রাহ্মণ, নিঃস্বছাত্রগণ এই সকল গ্রন্থ সুলভে প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত কৃতজ্ঞতারঅশ্রুজলে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির অভিষেক করিতেছে। শুধু শাস্ত্র গ্রন্থ নহে; বঙ্গবাসীর উপহারচ্ছলে একরূপ বিনামূল্যেই তিনি পুরাতন বঙ্গসাহিত্য আমাদের গৃহে গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহার প্রসাদে দেশে এত সাহিত্যচর্চ্চা, এত সাহিত্যিকের সৃষ্টি আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে এত সম্পদ্ এত ঐশ্বর্য্য,—তাহা যোগেন বাবু নিজহাতে ভাণ্ডারদ্বার না খুলিলে আমাদের সে ঐশ্বর্য্যের উপ-ভোগ ঘটিয়া উঠিত না। এককথায় তিনি আমাদের ধর্ম্মচর্চ্চায় ও বাণীবন্দনায় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার অতুল সম্পত্তি—বাণীচরণে অম্লান কুসুমস্তবক। তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি, ভাষাবিন্যাস ও বর্ণনা চাতুর্য্য,—কিসের কথা বলিব? সবই প্রশংসার অতীত। 'মডেল ভগিনী'তে তিনি পাশাপাশি পুণ্য ও পাপের চিত্র আঁকিয়াছেন; একদিকে বিলাসগর্ব্বিত বিদেশীয় কুশিক্ষার কুফল, অন্যদিকে অকপটধর্ম্মপ্রাণহিন্দুত্বের অম্লানপুঞ্জ জ্যোতিঃ। মডেলভগিনী সমাজের বিকৃতপুরুষহৃদয়ে নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে। তাঁহার 'রাজলক্ষ্মী' সর্ব্বরসের সমন্বয় "কাত্যায়নী অন্নপূর্ণায় করুণরস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালে বীররস, ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চরিত্রে শান্তরস আর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সতীজনসুলভ রুদ্ররস—পরিস্ফুট হইয়াছে। যোগেন বাবু চিনিবাস চরিতামৃত ও

বাঙ্গালী চরিত্রে নব্য কুশিক্ষায় বিকৃতরুচি যুবকগণের প্রতি তীব্রবিদ্রূপ ও ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যর্থ ও অন্ধ উত্তেজনাকে যাহারা দেশহিতৈষিতা ও অসার বাকপটুতাকে যাঁহারা বীরত্ব বলেন, যোগেন বাবু তাঁহাদের প্রতি কশাঘাত ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা কিছু মৌখিক, আড়ম্বরময়, বাগ্‌বহুল ও কর্ম্মহীন তাহাই তাঁহার ঘৃণার বস্তু ছিল। তাই তিনি নীরবে কর্ম্মের সেবা করিতেন, তিনি সাহিত্য মন্দিরে ফুললতা আঁকিয়া আসেন নাই—তিনি তাহার সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে আসিয়াছিলেন।

শুধু বিদেশাগত কুশিক্ষায় বিকৃতসমাজের মলিনতা ও গ্লানির প্রতি নহে—স্বদেশজ সামাজিক চরিত্রের অধঃপতিত ও ঘৃণিত পরিণতির প্রতি তাঁহার কঠোরতর শাস্তির বিধান ছিল। ইহা তাঁহার বাঙ্গালী চরিত ও নেড়াহরিদাসে ব্যক্ত হইয়াছে। কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালীর বিবাহরহস্যে ও অধঃপতিত বিকৃত বৈষ্ণবসমাজের উদাহরণে তিনি আমাদের গৃহছিদ্রগুলিকে নির্দ্দয় ভাবে দিবালোকে প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। যোগেনবাবুর পুস্তকে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব, সরলতা, স্বদেশপ্রিয়তা, সৎপ্রবৃত্তি ও সাধুউদ্দেশ্যের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তাঁহার পরিচালনায় জন্মভূমি পত্রিকা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রগণের অন্যতম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকাশিত হিন্দী বঙ্গবাসী, হিন্দীভাষীজনগণের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা, সাহিত্যসেবা ও শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিল—অপর জাতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া দিবারজন্য একটা বন্ধনশৃঙ্খলের কাজ করিয়াছিল।

তাঁহার প্রকাশিত দৈনিক ইংরাজীপত্রিকা টেলিগ্রাফ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অতি সুলভে তিনি এই পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইহাতে লিখিতেন না, পরে তিনি ইহার জন্য দিবারাত্র শ্রম করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হ'ন। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় এই পত্রিকায় অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পত্রিকা সাপ্তাহিক হইয়াছে।

যোগেন বাবুর পুরুষকার, অনন্যনির্ভরতা, ব্যবসায়বুদ্ধি, সকল

কার্য্যে আন্তরিকতা, ও অক্লান্ত অধ্যবসায়, স্বজন ও সাহিত্যিকগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি, ত্যাগশীলতা, একাগ্রতা, অকপটতা ও নির্ভীকতা তাঁহাকে মহীয়ান করিয়াছিল। আজ ও স্মৃতির জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অশেষ গুণের আধার তিনি, তাঁহার কোন গুণের কথা বলিব? চারিদিকেই তাঁহার অশ্রান্ত সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দুঃস্থ সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য করিতেন, অনেককে বঙ্গবাসী আফিসেও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করিতেন। বহু বিহঙ্গমকে নিরাশ্রয় করিয়া আজি আশ্রয়তরু অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান বেড়্‌গ্রামে তাঁহার পল্লীনিবাস। তথায় তাঁহার খাত পুষ্করিণী, স্থাপিত বিদ্যালয় ও ডাকঘর, প্রতিষ্ঠিত হাট, বাঁধানঘাট ইত্যাদি বহু জন হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে।

এই সকল মহাত্মগণের স্মৃতিপূজার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু তাঁহাকে শ্রদ্ধা বলিয়া নহে, তদ্বারা আমরা আমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করি, আদর্শ আলোকে তমোময় হৃদয়গুহা আলোকিত করি, সাহস ভরসা উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায় আমাদেরই হৃদয় ভরিয়া যায়। যে আলোকপথ বাহিয়া এই সকল জ্যোতিষ্কগণ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা আমাদের কর্ম্মবর্ত্ম দেখিয়া লইতে পারি। তাঁহাদের স্মৃতি তাঁহারা নিজেই রাখিয়া যান। মানবহৃদয়ের মনোময়-অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহাদের জয়গাথা উৎকীর্ণ। বাহিরের ঝড় বৃষ্টি তাহার কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীকালীদাস রায়।

উচ্ছ্বাস

প্লাবিয়া গগন একদা অরুণ মধুর ভাতি।

দিগাঙ্গনা যত, তাহারি কিরণে হোরী খেলালয়ে আছিল মাতি!

শ্যামল প্রান্তরে নদী আঁকা বাঁকা,

সেই আলোকের আলিপনা মাখা

আবেগের স্রোত হৃদয়ের মাঝে চলেছিল নেচে—ছিলনা রাতি।
প্লাবিয়া গগন একদা অরুণ মধুর ভাতি!
পুলক বিভোর সোহাগ আকুল হৃদয় মাঝে,
মরমের কথা কত সুরে হায় উঠে উঠে করে—উঠেনা বেজে!

রুদ্ধ আবেগ বুক ভেঙে হায়
দীর্ঘ নিশাসে বাহিরাতে চায়!—

মরমের কত কথা কাণাকাণি কল্ কল্ কল্ মরে যে লাজে!
পুলক বিভোর সোহাগ আকুল হৃদয় মাঝে!
নদীর বক্ষ অভিমান ভরে ফুলিয়া উঠে।
শত অভিশাপে ভাঙিয়া দুকূল অসীমের পানে চলিল ছুটে!

সীমার মাঝারে করুণা যে নাই।
অনাথের হেথা মেলেনাকো ঠাঁই!

আনন্দ সে বাঁধা সীমার পিঁজরে. নিরাশ তাড়না পক্ষপুটে।
নদীর বক্ষ অভিমান ভরে ফুলিয়া উঠে!
ভিতরে বাহিরে কবির হৃদয় বেড়ায় ঘুরে।
অবোধ তাহার নদীর হিয়ায় ক্ষণিকের তরে পশিল কিরে!

'মেঘের কৃপায় ভরা তব বুক।
'তারেই হেলিতে এত ভুলচুক্—

'যাহার লাগিয়া, চিরদিন তারে রাখিতে বুকেতে পারিবে ওরে!'
ভিতরে বাহিরে কবির হৃদয় বেড়ায় ঘুরে!
লাজের এবাঁধ গেল কেটে গেল স্রোতের মুখে।
চলিল নাচিয়া মুক্ত হৃদয়ে হাসিয়া খেলিয়া মনের সুখে!
পেয়ে আছে যারে হৃদয় মাঝার—উছসি উছলি চলে বারবার,
ক্ষণিকের মোহে ভুলিয়া তাহারে পাইতে চাহে যে তৃষিত বুকে।
লাজের এ বাঁধ গেল কেটেগেল স্রোতের মুখে!
দেখিতে দেখিতে কোথা হতে মেঘ ভাসিয়া এল!
হৃদয়বাসরে আশাদীপখানি নিবু নিবু করে নিবিয়া গেল!
প্রভাত হইয়া আসিয়াছে রাতি, পূব বাতায়নে অরুণের ভাতি।

শিথিল আঁচল প্রকৃতি আপন মুখানির পর টানিয়া দিল।
দেখিতে দেখিতে কোথা হতে মেঘ ভাসিয়া এল।
'সীমার বাঁধন চলেছ কাটিয়া পাইতে যারে
'অসীমের মাঝে যাইয়া তোমার পাইতে হবে না পারে না তারে।
'অসীমেতে তবে ঢেলে দিয়ে হৃদি
'বাসনা ডুবায়ে গাবে নিরবধি।
'অসীম আলোকে আঁতি পাঁতি করি খুঁজিতে তোমায় হবেনা কারে'।
সীমার বাঁধন চলেছ কাটিয়া পাইতে যারে!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

যাত্রায় আধুনিক রুচি।

যে দেশ এককালে সঙ্গীতকলাবিদ্যায় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সৌধ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, যে দেশের তানলয় এবং দুন চৌদুন ইত্যাদি, একই সঙ্গীতে তালের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কথা শুনিয়া, ইংলণ্ডের জনৈক বিখ্যাত বাদ্যকর বলিয়াছিলেন "সে দেশ ধন্য, যে দেশের লোক এ বিজ্ঞানের এতটা উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে" সেই গর্ব্বিত দেশ হইতে যে এই বিদ্যা ক্রমে তাহার নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নয়।

পূর্ব্বে এদেশে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সঙ্গীতের আখড়া বিদ্যমান ছিল। তাহাতে সঙ্গীতবিদ্যা ও সমাজ উভয়েই উপকৃত হইতেন। সন্ধ্যা সমাগমে যুবক সম্প্রদায় আখড়ায় আখড়ায় বিমল সঙ্গীত আলোচনা করিতে প্রলুব্ধ থাকিত বলিয়া পাপপথগামী হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে অবসর পাইত না। দেশের ধনিগণ সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদ দিগকে বেতন ভুক্ত করিয়া রাখিয়া সঙ্গীত চর্চ্চায় উৎসাহ দান করিতেন এবং অশ্লীল গীত বাদ্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। তাহা ক্রমে দেশ হইতে দূর হইয়াছে বলিলেই চলে। এখন সঙ্গীত রহিয়াছে যাত্রা এবং নাট্য-

শালায়, কিন্তু তথায় সেই সঙ্গীতের কি পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা দর্শক মণ্ডলী উপলব্ধি করিতেছেন।

বহুদিন হইল শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ বাবু "যাত্রায় আবৃত্তি" নামক একটী প্রবন্ধে দেশের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে আবৃত্তি ও সঙ্গীতের প্রচলন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন।

ব্যোমকেশ বাবু ঠিক বলিয়াছেন, যাত্রায় নাট্যশালার প্রভাব অতি মাত্রায় বিস্তৃত হওয়ায়, সঙ্গীতে রাগিনীর বিশুদ্ধতা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যাত্রার সঙ্গীতে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মনে যে প্রভাব বিস্তার করিত, যে রূপে মনকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইত, এখন আর তেমন হয় না। কারণ, যতসব চুট্‌কি রাগিণীতে বর্ত্তমান কালের সঙ্গীতের কলেবর পরিপুষ্ট। চুট্‌কি জিনিষ চিরকালই হাল্‌কা, এবং হাল্‌কা জিনিষ কখনও মনে স্থায়ী রেখা পাত করিতে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান কালের রুচি অনুসারে যাত্রার অধিকারিগণ অভিনয়ে নৃত্য এবং গীতের মাত্রা বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন বটে এবং আধুনিক উন্নতি-শীল নৃত্যের গতি অনুসারে, রাগিণীকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া জোড়া লাগাইয়া আরোহ-অবরোহ দেখাইয়া, বেশ মোলায়েম্ করিতে হয় সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া নৃত্যবিহীন সঙ্গীত গুলির বেলায়ও যে ঠিক ঐ নিয়মই বহাল রাখিতে হইবে এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। অর্থাৎ, যে সঙ্গীতগুলি আবৃত্তির অবসানে ছোকরাগণ আসরে থাকিয়া দণ্ডায়মান হইয়া গাহিয়া থাকে, সে গুলিতে রাগিণীর সম্মান বজায় রাখা যাইতে পারে। শুধু রুচির দোহাই দিয়া, "সর্ব্বম্-অত্যন্ত গর্হিতম্," না করিয়া ঐ সকল রাগিণীকে ঠিক রাখিয়া, সরল সহজভাবে গাহিলে, শ্রোতার মনে অধিক কার্য্য করিতে পারে। শোক-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যদি করুণার উৎস উথলিয়া না উঠিল, দর্শক মণ্ডলীর নয়ন প্লাবিয়া অশ্রুধারা না বহিল, "শুধু যাত্রা শুনিতেছি" —এই ভাবই যদি সকলের মনে অটুট রহিয়া গেল, তবে যাত্রা শোনার সার্থকতা ! রহিল কোথায় কিন্তু তাই বলিয়া, 'নীলদর্পন'

শ্রবণ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাদুকা নিক্ষেপের ন্যায় তন্ময় করিতে সমর্থ না হইলেও, রাগিণীর স্বাভাবিক করুণরসের ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় থাকিবে, এমন প্রাণ বাঙ্গলায় বিরল।

যাত্রার এমন দিন গিয়াছে যখন রাবণ সাজসজ্জা করিয়া আসরে নামিয়া আসিয়া আবৃত্তির স্রোতের টানে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "রাবণ (সক্রোধে)"—নিম্নস্বরে ইহা বলিয়াই, ভীষণ তর্জ্জণ গর্জ্জণ সুরু করিয়া দিয়াছেন! লক্ষ্মণ শক্তিশেলবিদ্ধ হইয়া বিলাপ করিতে করিতে "মূর্চ্ছা ও পতন" বলিয়া চিৎপাৎ হইয়া ভূমিতে সশব্দে পতিত হইয়াছেন! কোনও সখের-নাট্য-সমাজে একবার অভিনয় করার কালে কে কাহাকে কিরূপভাবে প্রহার করিবে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই মীমাংসা হইয়া যায়। পরে অভিনয় সময়ে উত্তেজনা বশতঃ হঠাৎ একের প্রহার অন্যের গাত্রে কিঞ্চিৎ বেগে পতিত হওয়ায়, তিনি বেদনা অনুভব করিয়াই অমনি রোষে আস্ফালন করিয়া, প্রহারকের গলা টিপিয়া ধরিয়া মঞ্চে থাকিয়াই বলিয়া উঠিলেন "কিরে! এত জোড়ে বুঝি মারিবার কথা ছিল? এখন আমি যদি তোকে ঠেলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিই তবে কেমন হয়?" দর্শকগণ ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া অস্থির।—কিন্তু তখনও সঙ্গীতে রাগিণীর মাধুরী অক্ষুণ্ণ ছিল। কোন কোনও সঙ্গীতে জন সমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিত, যে উঠিতে বসিতে সকল সময়, পথে ঘাটে মাঠে সকলের মুখেই ঐ রাগিণী ধ্বনিত হইতে শুনা যাইত।

আজ দিন কয়েক হইল বারোয়ারী মণ্ডপে কলিকাতার কোনও বিখ্যাত যাত্রা শুনিয়া আসিয়াছি অবধি সঙ্গীতে রাগিণীর হ. জ, ব, রল'র মিশ্রণে একটা খিচুড়ির ব্যবস্থা দেখিয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছি। যে যাত্রায় ভাষা ও ভাবের এতটা উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, আবৃত্তিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, নৃত্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, সেখান কি ইচ্ছা করিলে রাগিণীর সম্মান রক্ষা করা যাইতে পারিত না? ঝিঁঝিট+পিলু+মুলতান,ইমন্+পূরবী +বেহাগ, সিন্ধু+বাহার+ভৈরবী, ভঁয়রো+গৌরী+ললিত ইত্যা-

দিকে একাত্র সংমিশ্রিত না করিয়া রাগিণীকে খাঁটি রাখিলে বোধ হয় তাহাদের যাত্রা অধিক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। একটী সঙ্গীতে বহু রাগিণী সংমিশ্রিত হওয়ায় এবং পুনঃ পুনঃ আরোহ অবরোহে গায়কছেলেদের দশা এরূপ হইয়াছিল, যেন তাহারা কখনো কখনো বহু উচ্চে পক্কতাল দেখিবার জন্য দাঁত খিঁচিমিচি করিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়াছে, আবার সেই মুহূর্ত্তেই যেন শাঁকআলু খুঁড়িতে খুঁড়িতে "খাদে" পড়িয়া গিয়াছে। এমন একটী রাগিণীও শ্রবণ করি নাই যাহা আয়ত্ত করিবার উদ্‌গ্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলার যাত্রা শুনিবার কথা বেশ মনে পড়ে, তখন এমন এক একটী সঙ্গীতে প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, যে তাহার ঝঙ্কার এখনও মনে উদিত হইলে, নয়ন প্রান্তে অশ্রুবারি টলমল করিতে থাকে। কিন্তু এখন এই উন্নত প্রণালীর সঙ্গীতে তাহা হয় না কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে রাগিণীকে অত্যন্ত হাল্‌কা করিয়া প্রাণহীন করা হইয়াছে।

আধুনিক রুচির বিরোধী আমি কখনই নই। সেই রুচি অনুযায়ী নৃত্য-সংযুক্ত-সঙ্গীত-গুলিকে চুট্‌কি রাগিণীতে ভূষিত করিয়া, অন্যান্য সঙ্গীতের রাগিণীগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিলেই এই একটা মহাবিদ্যা, ব্যাভিচারের উচ্ছৃঙ্খলায় দেশ হইতে লুপ্ত হয় না। এই হতভাগ্য দেশ হইতে গর্ব্বের যা-কিছু সকল জিনিষই ত একে একে লুপ্ত হইয়াছে ; এই সখের ও সুখের সামগ্রীকে সখ করিয়া হারাইও না, ইহাই আমার আকুল আবেদন।

শ্রী ললিতকৃষ্ণ ঘোষ।

কবি ও সমালোচক।

ইংরাজীতে একটী সারগর্ভ প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, "A failed poet is a good critic," অর্থাৎ যিনি কাব্য রচনায় বিফল মনোরথ হইয়াছেন, তিনি একজন ভাল সমালোচক। ইহা

কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে এই ভাবটি আরও একজন বিখ্যাত ইংরাজসাহিত্যিক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ল্যাণ্ডার (Waltar Savage Landor) তাঁহার প্রসিদ্ধ 'Imaginary conversations' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"Those who have failed as painters turn picture-cleaners, those who have failed as writers turn reviewers. Orator Henley taught in the last century that the readiest-made shoes are boots cut down; there are those who abundantly teach us now, that the readiest-made critics are cut-down poets. Their assurance is, however, by no means diminished from their ill-success (as poets)." এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলিয়া রাখিতে চাই যে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার মতে সমালোচকের কার্য্য প্রশংসাযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ন্যায় সঙ্গত সমালোচনার দ্বারা জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। তবে কবি ও সমালোচক এই দুই শ্রেণীর লেখকের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কবিতা ও সমালোচনা যে সম্পূর্ণ বিপরীত উপাদানে রচিত তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাঁহার কল্পনাশক্তি নাই তিনি কখন কবি হইবার আশা করিতে পারেন না। এবং ভাল সমালোচক হইতে গেলে, প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ম বিবেকশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। যাঁহার ভাবের দৌড়, ইচ্ছাদির আতিশয্য (passions), এবং ভাব ও ভাষার সরলতা যত বেশী, তিনি তত উচ্চদরের কবি। সমালোচকের রচনা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সংযত হইবে। কবিতার উৎস কবিহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কাব্যে কবিরই প্রাণের উচ্ছাস, প্রবল আবেগভরে হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া ভাষার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। কবিকে কবিতা লিখিতেই হইবে।

যতক্ষণ না প্রাণের সুকুমার-কোমল-ভাব-প্রসূনগুলি কবিতার ছন্দে প্রস্ফুট হইয়া উঠে, ততক্ষণ কবির নিষ্কৃতি নাই। ভূতগ্রস্ত লোকের ন্যায় তাঁহার মনে তিলমাত্র শান্তি থাকিবে না। কেহ জোর করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন না। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতির কঠোর নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া কবিতা রচনা করিতে গেলে তাহা ছন্দোবিশিষ্ট গদ্য হইয়া দাঁড়াইবে। সজল জলদ-নিচয়ের মধ্যে সুশীতল বারিধারার ন্যায়, সুধাকরে রজত-ধবল-জ্যোৎস্নার ন্যায়, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমে সুললিত স্বর-লহরীর ন্যায় কবিতাও কবির স্বভাবজাত। ইংরাজীতে ইহাকে "Inevitable poetry" বলিয়া থাকে। কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"I do but sing because I must
And pipe but as the linnets sing".—Tennyson.

কবিরা যথার্থই ঐশ্বরিকক্ষমতা সম্পন্ন; তাঁহাদের রচনাও নন্দ-কাননের পারিজাতের ন্যায় শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র। ইংরাজ কবি Rogers বলিয়াছেন—"Poetry, is the language of God." নিরক্ষর অশিক্ষিত ব্যক্তিও একজন প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর স্বভাবকবি হইতে পারেন। কিন্তু সমালোচকের রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন, প্রখর বুদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক করিবার ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য্য। তাঁহাকে অনেক ভাবিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিতে হয়। এক কথায় "The poet is a genius, the critic is a scholar."

এক এক সময় সাহিত্যের এক এক যুগ আসে। কোনও সময়ে কবিতা, কোনও সময়ে গদ্যরচনা বা সমালোচনা সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে যুগে বেশী গদ্যলেখক বা ভাল সমালোচক আবির্ভূত হইয়াছেন, যে যুগে গদ্যরচনা ও সমালোচনার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে যুগে উচ্চদরের কবির আবির্ভাব হয় না। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিলে আমারা দেখিতে পাই যে, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যরচনারই প্রাচুর্য্য ও প্রাধান্য; এই জন্য ইংরাজিতে এই যুগকে

"a century of prose" বলিয়া থাকে। এই সময় Johnson, Burke, Gibbon, Fielding, Defoe, Hume প্রভৃতি বড় বড় গদ্য লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সময়ের কবিদের কাব্যও গদ্যময়তায় পূর্ণ। সেই জন্যই ইংরাজ কবি Pope ও Dryden এর কবিতাকে ইংরাজীতে "Versified prose" অর্থাৎ ছন্দোবিশিষ্ট গদ্যমাত্র বলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কাব্যের যুগে আমরা গদ্য সাহিত্য ও সমালোচনারও বিশেষ উন্নতিলাভ লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং তখনকার গদ্যরচনা যথার্থই "poetic prose" হইয়া উঠে খৃঃ উনবিংশশতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যে আমরা শ্রেষ্ঠ কবি, সরস গদ্যলেখক ও সমালোচকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তখন Wordsworth, Coleridge, Scott, Campbell, Moore, Byron, Shelley, Keats, Lamb, Hlazitt, Dequincey, Austen, Tennyson, Arnold, Browning, Carlyle, Ruskin, Eliot, Dickens, Thackeray, প্রভৃতি উচ্চদরের কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিকগণ সাহিত্যগগণে উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যেও কাব্যের যুগ চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমযুগের কথা ছাড়িয়া দিলে, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এত ভাল ভাল কবির আবির্ভাব বাঙ্গলা-সাহিত্যে অতি বিরল। (অবশ্য বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের সময়েও বাঙ্গালায় কাব্যযুগ আসিয়াছিল।) তাই এখন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকগণেরও রচনা পদ্যময় বা "poetic prose" বলিয়া ধারণা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, ললিতকুমার, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, গদ্য রচনা ও সমালোচনার যুগ কাব্যকুসুমকলিকানিচয়কে নীরস ও শুষ্ক করিয়া দেয়; কিন্তু কাব্যযুগে গদ্য ও পদ্য দুইশ্রেণীর রচনাই সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়া থাকে।

কবিরা ভাল সমালোচক হইতে পারেন। তাই ইংরাজীসাহিত্যে

আমরা Pope, Coleridge, Scott, Wordsworth, Laml Shelley, Swinburne প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি সমালোচকগণের নাম দেখিতে পাই। ইংরাজ কবি ও সমালোচক Dryden বলিয়া গিয়াছেন, "poets themselves are the most proper, though, I conclude, not the only critics"। অনেক গদ্যলেখক এই উক্তির অসারতা প্রমাণ করিতে কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই বিফল হইয়াছে। Lamb এর জীবনীলেখক বলিয়াছেন,"That Lamb was a poet is at the root of his greatnes as a critic" (English Men of Letters—Lamb)। যাঁহারা কেবলই সমালোচক তাঁহাদের অপেক্ষা সৃষ্টিকারী (creative) কবি সমালোচকদিগেরই সমালোচনা অধিক ন্যায়সঙ্গত, মৌলিক এবং মূল্যবান্। বিশেষতঃ কবিতার সমালোচনা কবিদিগের করাই বাঞ্ছনীয়। কবিতা কবির প্রাণের জিনিষ। কবিতা প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হয়। উহার সমালোচনা করিতে গেলে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, এবং গদ্যলেখক অপেক্ষা কবিদেরই ভাবের দৌড় যে বেশী, উহা যে এই বাস্তবজগত ভেদ করিয়া কল্পনাজগতে বিচরণ করিতে পারে, তাহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। তাই কবিগণেরই কবিতার সমালোচনা এত হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী এবং স্পষ্টবোধ হইয়া থাকে। কবি নিজেই এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,

The poet must be tried by his peers.
And not by pedants and philosophers" Butler.

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে কবিরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার সমালোচনা ছন্দে রচনা করিয়া গিয়াছেন। Shelley কবিভ্রাতা Coleridgeর বিষয় বলিতেছেন,

"You will see Coleridge; he who sits obscure
In the exceeding lustre and the pure
Intense irradiation of a mind
Which, with its own internal lightning blind

Flags wearily through darkness and despair—
A cloud, encircled meteor of the air,
A hoode deagle among blinking owls."

এই কয় ছত্র সমালোচনা, কেবল যে যুক্তিযুক্ত তাহাই নহে, ইহা সম্পূর্ণ। কোল্‌রিজের বিষয় ইহা অপেক্ষা বেশী বলা যাইতে পারে না এবং এর চেয়ে:ভাল করিয়া বলা যায় না। কোন গদ্যসমালোচক এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? Coleridgeএর Biographia Literaria, Lamb এর Essays on Dramatic poets, Byron, Shelley, Keats, Lamb, Cowpe প্রভৃতির Essays and Letters পাঠ করিলে যথার্থই আমরা কবি সমালোচকদিগের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হই। এইসব প্রবন্ধ ও পত্রাদির মধ্যে কতকগুলি যত্নলিখিত, কতকগুলি অচিন্তিতপূর্ব্ব ও আকস্মিক। ইংরাজ কবি Blake ও Rossettiর অযত্নলিখিত (off hand) মন্তব্য বা অকস্মাৎ উচ্চারিত বাক্যগুলি তাহাদের অধিকতর নিয়মবদ্ধ এবং যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্পাদিত টিপ্‌পনী হইতে বেশী মৌলিকতাপূর্ণ। তাহাদের সারভাগ কোন মিথ্যা ঘটনার সহিত মিশ্রিত নহে, (undiluted)। এই প্রসঙ্গে Symons যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"They are what is remembered over from a state of inspiration; and they are to be received as reports are received from eye witnesses whose honesty has already proved itself in authentic deeds." পক্ষান্তরে সমালোচকগণ সহস্র চেষ্টা করিলেও ভাল কবি হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের রচিত কাব্য Dryden ও Pope এর ন্যায় versified prose হইয় দাঁড়াইবে। অবশ্য যাঁহাদের বিবেকশক্তির সহিত কল্পনা প্রতিভা মিশ্রিত হইয়াছে তাঁহারা ভাল কবি-সমালোচক হইতে পারেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি একজন প্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক (Bandelaire) যথার্থই বলিয়া

of the arts if a critic were to turn himself into a poet, a reversal of every psychic law, a monstrosity; on the other hand, all great poets become naturally, inevitably, critics. * * * It would be impossible for a critic to become a poet, and it is impossible for a poet not to contain a critic" যে কাব্যের রহস্যোদ্ভেদ ও লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য গদ্যলেখকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, সেই যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যান, কবিভ্রাতাগন একটি ঠিক কথায় তাহা অক্লেশে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহার দ্বারাও আমরা কবির প্রতিভা ও গদ্যসমালোচকের বুদ্ধির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি।

জাতীয় সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য কবিও সমালোচক উভয়ের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। সমালোচকগণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের টিপ্‌পনী করিয়া তাহাদের যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবার আমাদের প্রধান সহায় হন। এবং অপাঠ্য গ্রন্থের ভাগ ও ভাষার তীব্র সমালোচনা না করিলে, সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশঃই আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ ও রক্ষাকর্ত্তা কিন্তু কবিদের কার্য্য আরও মহত্তর ও গুরুতর। তাঁহারা মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপ আগাছা উপড়াইয়া তাহাতে সুনীতিপূর্ণ বীজ সমূহ বপন করিয়া দেন। তাঁহারা সংসারতাপক্লিষ্ট, শোকাকুল ব্যথিত চিত্ত নরনারীর মনে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদিগকে ভগবৎ প্রেম ও নির্ম্মল আনন্দের অধিকারযোগ্য করিয়া তোলেন। জন্ম জন্মান্তর কার্য্যের তপস্যা করিলে, তবে ভাল কবি হইতে পারা যায়।

আজকাল অনেকেই সমালোচকের বেশ ধারণ করিয়া কবিতা সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁহারা কবিতার কিছুই অর্থ না বুঝিয়া ডাক্তারের ন্যায় তাহার উপর ছুরী চালাইয়া যান। তাই Byron যথার্থই Moore কে বলিয়াছিলেন যে, সমালোচকগনের নাম লোপ পাইলেও, তোমার বীনার মধুর তান কখন নীরব হইবে না।

> "Thy soothing lays may still be read,
> When Persecution's arm is dead
> And critics are forgot."

হেমন্তে পল্লীচিত্র।

আজ সকালে রোদ উঠেছে
আকাশখানা ভরি,
লাল রঙের ওই পাল উড়িয়ে
চল্‌ছে সোণার তরী।

ঠাণ্ডাশীতল প্রাতঃকালে
বহ্নিতরল কেবা ঢালে,
নীলসাগরের চক্রবালে
কে মহিমা রটে!

ওই জলে ঐ জ্বলে রবি,
হেমন্তের এই উজ্জল ছবি
নে এঁকে আজ ওরে কবি
অন্তরেরই পটে।

শিশিরস্নাত শ্যামল ধরা,
চৌদিকে আজ উজ্জল করা,
ফুলগুলি সব হাস্য ভরা
বাগান বুকের মাঝ;

ধানগাছের ওই পাতাগুলি
শীতলবাতে উঠ্‌ছে দুলি,
মুক্তবাহুর কোলাকুলি
দিচ্ছে সবে আজ।

অন্তরালের পল্লীখানা
খুকীর মতন ছোট্ট পাণা,
সব কথা আজ গেছে জানা
উজ্জল রবির করে

সকলে তায় দেখ্‌বে পাছে
বনাঞ্চল ওই বক্ষ মাঝে,
নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে
সরল লজ্জা ভরে।
ধেনু-চরা শ্যামল মাঠে,
বাঁধা বিজন পুকুর ঘাটে,
স্নিগ্ধ শীতল পল্লীবাটে
কি আনন্দ আজ!
ওই কাঁপে ওই তরুলতা,
নাই কোথাও নীরবতা,
সবখানে আজ চঞ্চলতা
পল্লীখানার মাঝ।
তুল্‌সী পাতার গন্ধ ছোটে,
রক্তজবা আপনি ফোটে,
ঝুম্‌কালতা শিউরে ওঠে—
পুলক ব'য়ে যায়;
সেফালীর ওই গুচ্ছরাশি,
শুভ্রদাতে দিচ্ছে হাসি,
সুগন্ধ তার যাচ্ছে ভাসি
মন্দ শীতল বায়।
প্রখরতর ভানুর করে
গো মহিষ ওই মাঠে চরে,
চাষিরা সব গল্প করে—
পূর্ণ তাদের মন;
এই সুখের এই পল্লীধারে
কবি কি আজ থাক্‌তে পারে
বদ্ধ করি হৃদয় ভারে

দিনান্তের ঐ প্রান্তসীমায়
ক্লান্ত পথিক যায় চলে যায়,
হেমন্তের এই সন্ধ্যা বেলায়
খেয়া চল্‌ছে পারে ;
আকাশ জুড়ে ঢেউ উঠেছে,
মেঘের কোলে মেঘ জুটেছে,
ছবির ছায়া ওই ফুটেছে
নদীর বুকের ধারে।
আজ্‌কে আমি দেখেনিলাম
সন্ধ্যা সকালবেলা—
হরিৎস্নিগ্ধ পল্লীবাটে
হেমন্তের এই খেলা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

ধ্রুব চরিত্র।

ভারত ভক্তির জন্মভূমি ও ভক্তের লীলানিকেতন। ভক্তির প্রথম উন্মেষ ভারতে। ভগবানে প্রীতি ও 'পরানুব্যক্তি' ভারতের ঋষিগণই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। আর্য্য সভ্যতা যখন প্রাচ্যগগণে ক্ষীণ উষালোকের মত মৃদুস্ফুট আলোক বিকীরণ করিতেছিল, মধ্য এসিয়ার সমভূমি পরিত্যাগ করতঃ উত্তর পশ্চিম দ্বারপথে যখন আর্য্যবীরগণ পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসে তখন একটা নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। অভ্রভেদী হিমালয়ের বিস্ময়জনক সৌন্দর্য্য, অপার নীলাম্বু নিধির স্থির ধীর গাম্ভীর্য্য, ধবল শৃঙ্গে স্বর্ণ কিরীটিনী উষার মৃদুল স্নিগ্ধ কিরণ, গ্রীষ্মাবসানে প্রলয়বিগ্রহ ঝঞ্ঝা ইত্যাদি ভারত প্রকৃতির বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে আর্য্যহৃদয় যুগপৎ ভীত, স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়াছিল। সেই ভাবের আবেশে আর্য্যপ্রাণে এক মহান্‌ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল,—"এ বৈচিত্র-

ময় জগতের স্রষ্টা কে"? পূতসলিলাভাগীরথী ও শিকরশীকর বাহী সিন্ধুনদের তীরভূমিতে ধ্যান নিমগ্ন চিত্ত আর্য্যঋষি এ সমস্যার মীমাংসা করিতে বসিতেন। যেখানে কোন অমানুষী শক্তির বিকাশ দেখিতেন সেইখানেই তাঁহারা অনন্তকে ধরিতে চেষ্টা পাইতেন। এক ও অদ্বিতীয়ের অনুসন্ধানে ব্যাকুল ঋষি, একবার অগ্নিকে, একবার ইন্দ্রকে, একবার বরুণকে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকারণ বলিয়া পূজা করিতেন।

আর্য্যপ্রাণে এ প্রথম ভক্তির উচ্ছ্বাস বড় সুন্দর বড় মধুর। ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন আকাশে যখন বিদ্যুচ্ছটা দেখিলেন, ক্ষণপ্রভা জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া আবার লুকাইল, তখনই তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তর আসিল—এই ঈশ্বর, যিনি দুর্জ্জেয় তিনিই ভগবান্। এমনি করিয়া অগ্নির সত্তা অনুভব করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন কৌশল যখন শিখিলেন তখন আর্য্যঋষি বেদীমধ্যে হুতাশনকে বসাইয়া বলিলেন—

"অভিত্বা পূর্ব্ব পতয়ে সৃজামি সোমাং মধু"
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি" ॥

হে অগ্নি আমার এ সোম মধু গ্রহণ কর; মরুৎ সখে তুমি এ যজ্ঞে আগমন কর"। বৃষ্টিবারিসেবিত ক্ষেত্রভূমি যখন স্বর্ণ শীর্ষক শস্যরাজিবিভূষিত হইয়া উঠিত, আনন্দোৎফুল্ল আর্য্য কৃষক তখন সেইখানে পরমপুরুষের করুণা দেখিয়া বলিয়া উঠিতেন"

"যস্য ব্রত ওষধি বিশ্বরূপাঃ
সনঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ" ॥

সমগ্র ঋগ্বেদ গ্রন্থ এক বিশুদ্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস। এখানে 'নেতি' 'নেতি' নাই; এখানে পিতাপুত্র, সখা সুহৃদ্ভাবে ভগবান্‌কে ভক্তগণ আহ্বান করিতেছেন। হে পিতঃ! তুমি এস, রক্ষা কর ইত্যাদি। জাহ্নবীপ্রবাহধৌত আর্য্যাবর্ত্তে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য হৃদয়ে এ নূতন ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া মনে হয়, যখন বৈকুণ্ঠধামে ভক্তগুরু পঞ্চানন প্রাণারামের নামগানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন

তখন পরম পুরুষের চরণ নিঃসৃত ত্রিধারার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে প্রবাহ রূপে ভক্তি ও নিঃসৃতা হইয়া ভাগীরথীর কুলে কুলে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই আর্য্যগণ ভাগীরথীর তীরে আসিতে আসিতেই ভক্তির আবেশে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপরে ভারতে অনেকভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তির চরম লক্ষ্য ভগবৎপাদপদ্মে সকল জ্বালা ভার নামাইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, অনেক ভক্তিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক পুরাণকার ও শাস্ত্রকার ভক্তজীবনের প্রাতঃস্মরনীয় কাহিনী ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ও অটল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত রাখিয়া জগতের বরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কতশতাব্দী অতীত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন ঘটীয়াছে, কিন্তু এই দুই পুণ্য কীর্ত্তির কীর্ত্তিধ্বজা অবিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চ সুমেরুশৃঙ্গে প্রোথিত থাকিয় পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে, যে চাহিয়া দেখিবে তাহারই প্রাণে সেই পুণ্য কাহিনী শতধারে প্রবাহিত হইবে।

এই পবিত্র ধ্রুব চরিত্র বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই ভক্তি-শাস্ত্রেই বিবৃত দেখা যায়। এক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবদ্বর্ণিত ধ্রুবচরিত্র সমালোচনাই উদ্দেশ্য।

ধ্রুব স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর, উত্তানপাদ নৃপতির ঔরসজাত পুত্র। উত্তানপাদের দুই মহিষী—জ্যেষ্ঠা সুনীতি, কনিষ্ঠা সুরুচি। ধ্রুব জননী সুনীতি হতভাগিনী, স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, সুরুচি আদরের দুয়োরাণী পতিসোহাগের ষোলআনা দখলকারিণী। পাঠক! একেবার এই চরিত্র বিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুণ দেখি—মর্ম্ম পীড়িতা, কৌশল্যার কথা মনে পড়ে নাকি? সে তপস্বিনীর জীবনে ও এমনি ঘটনাবলীর সমাবেশ। তিনি রাম হেন পুত্রধনে জননী এইমাত্রই তাঁহার জীবনের সান্ত্বনা, সেই লোকাভিরাম রামই তাঁহার যাতনাক্লিষ্ট প্রাণের একমাত্র অবলম্বন। সুনীতিও কৌশল্যার মত দুঃখিনী, রামের জননীর মত তিনিও ধ্রুবের মুখ-

শশী দর্শনে পতির উপেক্ষা ভুলিয়া থাকিতেন। ধ্রুব রাজার জ্যেষ্ঠ-পুত্র, যার মনে কত আশা! কিন্তু সহসা এ কিরণরেখা এক কাল-মেঘে আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিল, আশাতরণী নিরাশার এক উদ্বেলতরঙ্গে ডুবিয়া গেল, কল্পিত প্রাসাদ যেন এক মহাবাত্যায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

প্রিয়পুত্র উত্তমাকে অঙ্কেধারণ করতঃ রাজা উত্তানপাদ স্বর্ণমণি-রচিত বিশাল সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, বাম ভাগে আদরিণী সোহাগিণী, রূপ-যৌবন-মদ-মত্তা সুরুচি অধ্যাসীনা।

এমন সময় পঞ্চম বর্ষীয় শিশুধ্রুব ক্রীড়াস্থলে তথায় উপস্থিত হইলেন। শান্তমূর্ত্তি স্নিগ্ধ বদন বালক কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পিতৃ ক্রোড়ে আসীন দেখিয়া, সুধাহাসিরঞ্জিত মধুর আস্যে পিতার দিকে চাহিয়া বড় সাধকরিয়া কোলে উঠিবার আশায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। অমনি সেই কোমল হৃদয়ে কাল ভুজঙ্গিনী দংশন করিল। কর্কশ ভাষায় নাগিনী সুরুচি বলিয়া উঠিল—

বালোসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রী গর্ভসম্ভৃতম্।
নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেহর্থে মনোরথঃ॥
তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈ বাণু গ্রহেণ মে
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদিচ্ছসি নৃপাসনম্॥

উঃ! কি কঠোর মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ! এই বজ্র সদৃশ কঠিন ভৎসনা ধ্রুবের সুকোমল হৃদয়তন্ত্র যেন পুড়িয়া ছাই করিতে উদ্যত হইল। দণ্ডাহত সর্পের ন্যায়, বাত্যা লোড়ত জলধির ন্যায় মহাশক্তিরআধার বালক নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পিতার সমক্ষে এবম্প্রকার তিরস্কৃত হইলেন অথচ পিতাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তাঁহার শোকাবেগে যেন বাক্-রোধ হইল। অতএব ধ্রুব পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে মাতৃ সমীপে গমন করিলেন।

সুনীতি সকল কথাই অন্তঃপুরস্থ লোক দিগের নিকট শুনিলেন এবং প্রজ্বলিত শোকানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া দাবাগ্নিগ্রস্ত

লতার ন্যায় ম্লান হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি যে করুণ ভাষায় বিলাপ করিতেছিলেন, কবি তাহা প্রাণস্পর্শী মর্ম্মবেদনার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। একটী ছত্রে তাঁহার সমস্ত দুঃখ পুঞ্জীভূতাকারে বাহির হইয়াছে—

"বিলজ্জতে মাং ভার্য্যেতি বোঢুমিড়স্পতির্মাং" ;

ধ্রুব! তুমি আমার গর্ভসম্ভূত সুতরাং এ লাঞ্ছনা অদৃষ্টে লইয়াই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কারণ যাহাকে রাজা তাঁহার ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেই কুণ্ঠিত সেই অভাগিনীর পুত্র তুই বাপ, এ শোকে শান্ত্বনা আমি কি দিব? এ দুঃখের প্রতিকার আমি কি করিব?" এই খানেই ধ্রুবের জীবন তন্ত্রী সুরুচীর পরুষ-বাক্যরূপ কঠিন অঙ্গুলী সঞ্চালনে বাজিয়া উঠিল। ধ্রুবের হৃদয়-বীণায় তারাস্বরে যে রাগিণী বাজিয়া উঠিবে, এই খানেই উদারা-গ্রামের প্রথম ঘাঁটে সেই মূর্চ্ছনার আভাস পাওয়া গেল।

ধ্রুবের অন্তস্তলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় যে মহাতেজোরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহা সুরুচির তিরস্কার ফুৎকারে উজ্জ্বল ভাস্বর হইয়া উঠিল। তুহিনাচ্ছাদিত চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় ধ্রুবের যে ভগবদাকর্ষণী অমানুষী ভক্তি গুপ্তাবস্থায় ছিল, বিমাতার শ্লেষবাণীতাপে তুহিনস্তরের ন্যায় তাঁহার সেই ভক্তি পরমাত্ম-সঙ্গলাভের জন্য ছুটিল। শৈত্যগুণযুক্ত, শান্ত জলরাশি অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইয়া যখন ফুটিয়া উঠে, তখন যেমন অলক্ষিতে সেই জলরাশি বাষ্পবিকার প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে গগন পথে চলিয়া যায়, তেমনি শান্ত স্নিগ্ধ, সরল বালক প্রগল্‌ভার জ্বালাময়ী রসনাস্ফুরিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়াই যেন এ তুচ্ছ মরতধাম হইতে অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত দুর্লভ লোক প্রাপ্তির আশায় ছুটিলেন। দুখের শিশু মাতৃক্রোড়ে সান্ত্বনা লাভের আশায় পৌঁছিয়াছিলেন, কিন্তু কই মা তো তাহা দিতে পারিলেন না! গিরিকুণ্ডবিনিসৃত নদ যেমন উপল প্রাচীরাহত হইয়া উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া যাইবার আশায় ক্ষণেক স্তম্ভিত হয়, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই কুণ্ড হইতে নির্গত অধিকতর জলসংযোগে শক্তিমান হইয়া শত বাধা বিঘ্ন

অতিক্রম করিয়া অপ্রতিহত গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, ধ্রুবও তেমনি শিশুরই মত জীবন যাপন করিতে করিতে বিষম বাধা পাইয়া, জগৎ বিঘ্নসঙ্কুল ভাবিয়া যখন মার কাছে শান্তি যাজ্ঞা করিলেন, তখন মা'ও সেই গিরিকুণ্ডের মত নির্দ্দেশ করিলেন—

"নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্দুঃখছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।"

"অনন্যভাবে নিজ ধর্ম্ম ভাবিতে সমস্তবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষং॥"

সেই শান্তির নিলয় অনন্তসাগর পাশে ধ্রুবের জীবনস্রোত স্বীয়শক্তিসংযোগে চালাইয়া দিলেন। সুনীতি তখন যাহা বলিলেন তাহা বড় গম্ভীর, বড় মধুর! দুর্ব্বলতার লেশ মাত্রও নাই। দুধের শিশু ধ্রুবের মনে যে দাগা লাগিয়াছে স্নেহময়ী জননী তাহা বুঝিলেন, ছেলেভুলান কত কথাই বলিলেন কিন্তু সেই প্রবীণ শিশুর ক্ষত্রিয় তেজ কিছুতেই শান্ত হইল না। তখন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ানীর মত, আদর্শ জননীর মত সুনীতি বলিলেন "সাধনার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ক্ষুব্ধ কেন বাপ? জন্মদাতা পিতা উপেক্ষা করিয়াছেন, বিমাতা অপমান করিয়াছেন তাহাতে দুঃখ কি? সেই দুর্ব্বলের বল, পতিতের শরণ ভগবানকে ডাক, তিনি তোমাকে উপেক্ষা করিবেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। ধ্রুব উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে যেন ভেলা পাইলেন। তখন সেই বালক হৃদয়ে তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিল, সমস্ত বিশ্ব সংসার বিস্মৃতির নীরে ডুবিয়া গেল, কেবল রহিল ধ্রুব আর তাঁর দুঃখবিমোচন হরি ঠাকুর। "আমার আহত হৃদয় কাহার পদ্মহস্তস্পর্শে শীতল হইবে? আমি তাঁহাকে লাভ করিব"—এই সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। কত ন্যায় কত দর্শন যাঁহার অস্তিত্ব বিচারে গোলমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান কঠোর সত্যের আশ্রয় লইয়া কত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে সৃষ্টিতত্ত্ব অবিশ্রান্ত আলোচনা করিয়াও যাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই, একটী দুগ্ধ পোষ্য বালক তাঁহাকে চোখে চোখে দেখিবার জন্য গৃহত্যাগী, একি বাতুলতা? বিজ্ঞানের চক্ষে হইও যাহাই হউক না কেন, ভারতাকাশে এ নক্ষত্র এক চিরন্তন আদর্শ; ভারতের উদ্যানে এ পবিত্র কুসুম।

সেই শুভ মুহূর্ত্তে, অবিচলিত স্থৈর্য্য ও অভাবনীয় ধৈর্য্যের সহিত সুনীতি স্নেহের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিলেন। জগৎকে কর্ত্তব্যকঠোরস্নেহের আদর্শ মাতৃত্বের সহিত দেবত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখাইয়া স্তম্ভিত করিলেন। জগতের ইতিহাসে এ হৃদয়ের তুলনা নাই। কোন দেশে, কোনকালে এমন করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বীয় শিশু তনয় উৎসর্গ করিতে কেহ কখনও পারে নাই। ঈদৃশী ঈশ্বর নির্ভরতা আর কোন জগতের ইতিবৃত্তে নাই। ধন্য জননী! ধন্য তোমার মহত্ব! এমন হৃদয় নইলে কি ধ্রুব হেন পুত্র রত্ন লাভ করা যায়? হায় ভারতের সেদিন কোথায়? মহাকালের ফুৎকারে যেন সে স্বর্গীয় আদর্শ এ ভারত হইতে উড়িয়া গিয়াছে।

যাক্ সে কথা। এখন আমরা দেখাইতে চাই যে ধ্রুবের বনগমনের সঙ্গে রামচন্দ্রের বনগমনের কিছু সাদৃশ্য আছে। ধ্রুবও যেমন অভাগিনীর সন্তান, রামচন্দ্র তেমনি, তবে রামচন্দ্র গন্ধরাজটীর মত পিতার আদরে উদ্যান মাঝে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, আর অনাদৃত যুঁই ফুলটীর মত এ ধ্রুব কুসুম আপনি ফুটিয়া আপনার সৌরভ বিস্তার করিতেছিল। এই মৌলিক পার্থক্যই দুই জনের জীবন দুইটী ভিন্ন পথে চালিত করিয়াছিল। রামচন্দ্র চিরসুখোচিত, এ পর্য্যন্ত দুঃখের বেদনা কি তাহা অনুভব করেন নাই; সেই সুখী জীবনে সুখের মাত্রা আরও বাড়াইতে অভিষেকের আয়োজন। সহসা রামশশী রাহুগ্রস্ত হইলেন। ধ্রুবেরই মত বিমাতার কুটিলাভিসন্ধি কালকূট উদ্গীরণ করিল। সে বিষে অযোধ্যাবাসী সকলেই জরজর হইল, কিন্তু যাঁহার সুখের কিরণ হরণ করিয়া দুঃখ তমিস্রা রজনী আসিয়া সমস্ত রাজ্য ঘিরিয়া ফেলিল, তিনি নির্ব্বিকার; নিষ্কম্প, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ লাভে অধিকতর হৃষ্ট। কালিদাস দুইটী শ্লোকে বড় কৃতিত্বের সহিত রামের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

"পিত্রা দত্তাং রুদন রামো প্রাঙমহীং প্রত্যপদ্যত।
পশ্চাদ্বনায় গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিতোঽগ্রহীৎ॥"

[illegible] নির্জ্জনে কেবল মায়ের আদরে বর্দ্ধিত, মাতৃস্নেহ

ব্যতীত আর কোন সুখ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। যখনই তিনি আর এক সুখের আশায় লালায়িত হইলেন, অমনি নিরাশার কুটিল মূর্ত্তি সন্দর্শনে সংসারের কুটীল গতি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সুখলিপ্সু হৃদয় উচ্চতর সুখের আশায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ধ্রুব চরিত্রে পুরুষকারের পূর্ণ বিকাশ, রামচরিত্রে ধৈর্য্য ও মহত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ। রামচরিত্রে কঠোর সত্য নিষ্ঠা—অঙ্কুশের ন্যায়, প্রচণ্ড ক্ষত্রিয় বীর্য্যকে দমিত করিয়া রাখিয়াছে, ধ্রুব চরিত্রে ভক্তি মিশ্রিত পুরুষকার ক্ষত্রিয় বীর্য্যকে উত্তেজিত করিয়া ইষ্টসাধনে ব্রতী করিয়াছে। রামের বনগমন জগতের জন্য, ধ্রুবের বনগমন আত্মার জন্য। কিন্তু উদ্দেশ্য যাঁহার যাহাই থাকুনা কেন, বিদায় দৃশ্য উভয়েরই এক; কৌশল্যা ও সুনীতি উভয়ে যেন একই ছাঁচে গঠিত, উভয়েই অতুল নৈতিক সাহসে বুক বাঁধিয়া, ভগবানের মুখ চাহিয়া স্ব স্ব সন্তানকে বনে পাঠাইতেছেন। একজনের বিদায় বাক্য আর একজনের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। কৌশল্যাও স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, কিন্তু তথাপিও তিনি সপত্নীগণের সম্মানের পাত্রী, —এ বিষয়ে সুনীতি কৌশল্যাপেক্ষাও দুর্ভাগা, সে যাহা হউক কৌশল্যা ও সুনীতি উভয়েই পুত্ররত্ন লাভে অনাদর, উপেক্ষা সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আশার মোহিনী শক্তি উভয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সে সুখও যেন কাহার প্রাণে সহিল না। সহসা এক জীবন মরণ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সমস্যাস্থলে কৌশল চরিত্র সুনীতি অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ভাবে প্রস্ফুটিত। যে পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছে, তাহাকে কর্ত্তব্যের দায়ে অবিকৃত মুখরাগে বনগমনে বিদায় দেওয়া কোন্ রমণীর সাধ্যায়ত্ত? সুনীতিও যেমন শক্তিমান্ শিশুর তেজোময় সংকল্প বাণীতে তাঁহার শক্তির পরিমাণ বুঝিলেন, কৌশল্যাও তেমনি বুঝিলেন, কিন্তু তথাপি সুনীতি চরিত্রে ভগবন্নির্ভরতা দশরথ মহিষী অপেক্ষাও বলবতী। সুনীতির অনুমোদনে যদিও একটু কামনার গন্ধ আছে, তথাপি এ কথা মনে রাখা উচিত যে ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় দুধের শিশু, আর রামচন্দ্র লোকাতীত বলবীর্য্য সমন্বিত, ভার্গবদর্পচূর্ণকারী রাজ্যশাসনক্ষম ক্ষত্রিয় যুবক। আরও মনে

রাখিতে হইবে, রামচন্দ্র অবতার, আর ধ্রুব মরতের শিশু। সুতরাং উভয়ের তুলনা যদিও অসম্ভব, তথাপি স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যে তুলনা চলে, মানুষে ও ঈশ্বরে যে তুলনা চলে, নভস্থলে ও ধরাতলে যে তুলনা চলে, শমীলতায় ও নীলোৎপলে যে তুলনা চলে তাহা দেখাইলাম। এত বিস্তৃত তুলনায় আমাদের যে উদ্দেশ্য তাহা উপসংহারে নির্দ্দেশ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ।

আমার ছুটি।

(গল্প)

চাকুরী হইয়াছিল অবধি আর বাড়ীর নামটি করি নাই। একেত ডাক্তারী তার উপর আবার রেলের ডাক্তারী—মোটেই মেলে না। কতদিন হইল সকলের নিকট বিদায় লইয়া এই আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবহীন বিদেশে আমার এই ডাক্তারী জীবনের দিন গুলি Stethoscope ও হাসপাতালের করুণ-কাতর দৃশ্যের মধ্য দিয়া গুনিয়া গুনিয়া কাটাইয়া দিতে সুরু করিয়াছি। এই বৎসর গুলির মধ্যে আমার জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

বাড়ীতে আর কিসের জন্যই বা যাইব? সুখই বা কি আছে? বাবার একান্ত অনুরোধে এক সোণার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিলাম। হায় নীলিমা! তোর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমরা কত ছোট! আমার বেশ মনে পড়ে তোর সেই ফুলের মত মুখটি! বাবার অনুরোধে আমি আবার বিয়ে করিলাম—আর এক সোণার প্রতিমাকে ঘরে আনিলাম, কিন্তু তাহাকে আদর যত্ন করিতে পারিলাম কৈ? মরণ সময়েও ত তাহাকে একবার দেখাটি দিতে পারিলাম না। হায় চাকুরী! তোমার ঐ মোহিনী শক্তি দিয়া আমাদের এই বাঙ্গালী জীবন এত মরুময় করিয়া রাখিয়াছ! রেলের গার্ড ও কুলী যখন আমার নিকট অসুখের সার্টিফিকেটের জন্য আসিত, তখন আমি তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতাম। আমার বেশ মনে

পড়ে, এক কুলি একদিন আমার পা ধরিয়া কাঁদিয়াছিল—একখানি সার্টিফিকেটের জন্য! সে বলিয়াছিল—"বাবুজী আমার মায়ের বড় বেমারী একবার তুমি একটু লিখিয়া দাও—তুমিই গরিবের মা বাপ।" হায়! তখন তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম! কে জানিত বিধাতা তখন অলক্ষ্যে আমার প্রতিও সেরূপ পদাঘাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন? যে দিন টেলিগ্রাম পাইলাম আমার স্ত্রীর অসুখ-তার পরের দিনই আমাদের বড় সাহেব Inspection এ আসিবেন কথা ছিল—ছুটি মিলিল না—যাওয়া হইলনা। স্ত্রীকে শেষ মুহূর্ত্তে একবার দেখিতেও পাইলাম না!

তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। বাবা আবার সম্বন্ধ করিবেন বলিয়া চিঠি লিখিলেন—আমি নিষেধ করিলাম। রেলের চাকরের আবার বিয়ে কেন? আর এখন আমি তেমন ছোটও নই যে এক স্ত্রী থাকিতে আবার বিয়ে করিব। শুধু বাবার অনুরোধ রাখিতেই ত গত-বার বিয়ে করিয়াছিলাম। আর সেই বালিকা নীলিমাই বা কি দোষ করিয়াছে যে তাহাকে আমি একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিব না? আমার বেশ মনে পড়েএকবার পূজার সময় নীলিমাকে আমাদের বাড়ী হইতে আনিতে যাওয়া হইয়াছিল তখন নীলিমার বাবা নাকি বলিয়া-ছিলেন যে—আমাদের বাড়ী মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর মেয়ের গলায় টাকার ঘড়া বাঁধিয়া নদীতে ডুবাইয়া দেওয়া একই কথা। তিনি নীলিমাকে নেওয়াবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, বাবা দেন নাই। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে আমি যত দিন চাকুরী করিতে না পারিব ততদিন নীলিমা পিত্রালয়েই থাকবে। বাবাত এই সব কথা শুনিয়া চটিয়া লাল—পিসিমা ত আগুন! মা বাবাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না—এক রকম বাধ্য হইয়াই আমাকে আবার বিয়ে করিতে হইল। হায়! বিয়ে করিয়া ত একদিনের জন্যও স্ত্রীর সহিত কথাটি কহিতে পারি নাই—অকালেই ফুলটি শুকাইয়া গেল! জল সিঞ্চনের যে একান্ত অভাব হইয়াছিল তা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম। মনে ভাবিলাম একবার ছুটি লইয়া বাড়ী যাইব—বাড়ী যাইয়া নীলিমার নিকট ক্ষমা চাহিব, তাই এবার পীড়ার নাম করিয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। এবার ছুটি না

দরখাস্ত করিবার দিন কএক পরে এক সন্ধ্যা-বেলায় হাসপাতালে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলাম। বৈদ্যুতিক আলো Instrument caseগুলির মধ্যে পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছিল। উপরে পাখা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিয়া আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। পূজা আসিতেছিল—মনটা বাড়ী যাওয়ার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত—মনে মনে নালিমার ও অস্ফুটণ্ড বালিকা আমার অযত্নে নিজের মৃত্যু নিজে বরণ করিয়া লইল তাহার কথা ভাবিতেছিলাম। এমন সময় আমার অধীন এক কর্ম্মচারী আমাকে সংবাদ দিল ১৯নং আপ্ পেসেঞ্জারে এক রোগী আছে—তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তাড়া তাড়ি করিয়া উঠিয়া দেখি এক যুবক এক বেঞ্চের উপর শুইয়া আছে আর তার মস্তকের নিকট বসিয়া এক অবগুণ্ঠনাবৃতা কিশোরী। যুবকের বয়স ২০। ২১ বৎসর হইবে আর কিশোরীর বয়স অনুমান ১৪।১৫ হইবে। যুবক বলিষ্ঠ সুগঠিত, তাহার মুখমণ্ডলে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছিল না। বালিকার মুখ দেখা যাইতেছিল না তবুও যে দেখিত সেই বোধ হয় এই অনুমান করিত যে বালিকা সুন্দরী। যুবকের মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম—এমন সময় বালিকার উষ্ণশ্বাস আমার হাতে লাগিল—আমি শিহরিয়া উঠিলাম—নাড়ি দেখিয়া এবং Stethoscope লাগাইয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অনেকে হয়ত মনে ভাবিবেন যে নিকটে এক কিশোরী বসিয়া থাকিলে অনেকেই সে সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে যুক্তি এখানে বোধ হয় খাটে না, কারণ মেডিকেল কলেজে পাঁচ পাঁচটি বৎসর পড়িয়া এ বিষয়ে একেবারে পাকা হইয়া গিয়াছিলাম। যুবক চোখ বুঁজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল—আমি যারপর নাই অপ্রতিভ হইলাম। একটা সামান্য রোগের যদি ঠিক্ ঠিকানা করিতে না পারিলাম তবে এত পরিশ্রম করিয়া নামের পেছনে—ল্যাজ-মোটা শেয়ালের (L. M. S.) উপাধি কেন লইয়াছিলাম। কিশোরীকে প্রশ্ন করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, অগত্যা গত্যন্তর না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ইঁহার কি মৃগী রোগ রোগ আছে?"

কিশোরী মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—না। কি করিব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি দুই একটা Stimulant mixture খাওয়াইয়া দিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যুবকের জ্ঞান না হইল ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কি আপনার স্বামী?" তিনি মাথা নাড়িয়া আবার জানাইলেন—'না'। আরো কত কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিব—এমন সময় পাখার বাতাসে রমণীর অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল—বিদ্যুতালোকে একবার মুখখানি দেখিলাম—মনে হইল এই মুখ যেন কত কালের চেনা। সেই সঙ্গে বহুকাল বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের মত আর একখানি মুখও মনে জাগিয়া উঠিল—বুক ফাটিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল।

সেই রাত্রি তাহাদিগকে আমার বাসায় রাখিয়া আমি আমার আপিসে আসিয়া শুইলাম। আমার ঠাকুর চাকরই তাহাদের রান্নাবান্না করিয়া দিল। সারা রাত্রি নানা চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। আমার হৃদয়ে আজ এই কিসের স্পন্দন? আমি আজ হৃদয়ের নিভৃত কোনে একটা কি যে অনুভব করিতে লাগিলাম তাহা আমি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম এই যৌবনোন্মুখী কিশোরী কি বিবাহিতা? আর যদি বিবাহিতাই না হইবে তবে তাহার মুখই বা অবগুণ্ঠনাবৃত কেন? হায়! যদি বিধাতা সুপ্রসন্ন হইতেন তবে ত আজ আমিও এইরূপ স্ত্রীরত্ন দ্বারা নিজেকে সুখী করিতে পারিতাম। হায়! Man proposes God disposes. কতকক্ষণ পরে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম—ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম।

বড় অন্ধকার! ঘন মেঘের গুরুগর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শরৎকালে এমন মেঘ বড় দেখা যায় না। আকাশে কে যেন রাশি রাশি কালি ঢালিয়া দিয়াছে জল পড়িতেছিল—বৃষ্টিকণা আমার ললাটের ঘর্ম্ম বিন্দুর সহিত আসিয়া মিশিতেছিল। আজ আমার হৃদয়ও এইরূপ অন্ধকারাবৃত এইরূপ ঘনাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতে লাগিল। দূরের পর্ব্বত গুলি সেই বিদ্যুতালোকে এক একটা দৈত্যের মত বোধ হইতে লাগিল—মনে ভাবিলাম আমার হৃদয় ঐ পর্ব্বতগুলি হইতেও পাষাণ।

পর দিন সকালে যখন জাগিলাম তখন আমার জানালা দিয়া 'শরতের কনক তপন' ধীরে ধীরে তাহার স্বর্ণরশ্মি ছড়াইতেছিল। আমি উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া একবার উপরে যাইয়া সেই যুবকের তত্ত্ব লইব ভাবিলাম কিন্তু দেখি তখনো উপরের দরজা বন্ধ। অগত্যা আমি হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলাম। Out door এর দুই এক জন রোগী তখন হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পায়চারি করিতে করিতে দেখি হাসপাতালের দরজায় একখানি চিঠি পড়িয়া—উৎসুকচিত্তে তুলিয়া দেখিলাম—আমার সমস্ত শরীরে হৃদয়ে হর্ষ এবং মিলনের একটা স্পন্দন যুগপৎ অনুভব করিলাম—দেখিলাম বিবাহের পর আমি যে চিঠি নীলিমার নিকট লিখিয়াছিলাম এ সেই চিঠি। ব্যাপার বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না। আমি দৌড়াইয়া উপরে উঠিলাম—উপরে উঠিয়া দেখি নীলিমা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

আমি আনন্দের আতিশয্যে নীলিমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—আমার হৃদয় জুড়াইল। হাসিয়া বলিলাম "নীলিমা এ অভিনয়ের কারণ কি?'

"তোমার মন পরীক্ষা করিতে।"

"তোমার সঙ্গে উনি কে আসিয়াছেন?"

"আমার দাদা, দাদাকে চেন না?"

তখন যোগেশবাবু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

নীলিমা আমাকে বলিল "আজ এই আনন্দের দিনে আমার সইএর কথা মনে পড়ে—"

"কে তোমার সই?"

"জান না? সত্য যে আমার সই হয়—আমার কষ্ট লাঘবের জন্যই ত সে তাহার জীবনটি নিজের ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিল! রংপুরে আমরা দুই জনে এক সঙ্গে পড়িয়াছি—এক সঙ্গে খেলিয়াছি—তার বাবার বাসা আর আমাদের বাসা খুব নিকটে ছিল।"

সেই আনন্দের মধ্যেও আমার হৃদয়ে এক বিষাদের রাগিণী বাজিয়া উঠিল—সে রাগিণী কি আর থামিবে?

আমার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু সে ছুটি আর কোনো কাজে আসিল না।

শ্রীরঙ্গিনচন্দ্র হালদার।

৺সখারামগণেশ দেউস্কর।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] পৌষ, ১৩১৯ [৯ম সংখ্যা।

হাফেজ।

"আগর্ আঁ তুর্ক এ-সিরাজী বদস্ত্ অরদ্ দিল-এ-মারা
বখ-হাল-এ-হিন্দ অস্ বখহ সম্ সমরখহন্দ-ও-বোখহারারা"

হাফেজ—

পাগল হাফেজ কবি—
পরম প্রেমিকে লভেছিল প্রাণে
যেন প্রেয়সীর ছবি।
মুগ্ধ বিভোর ব্যাকুল নয়নে,
চাহিত যে কবি সে প্রিয়ার পানে,
সে রূপের কাছে তুচ্ছ দেখিত নিখিল বিশ্ব সবি।
ভক্ত হাফেজ কবি।
জগতের সব সুষমা লহরী,
প্রিয়ার তাহার অঙ্গ মাধুরী,

ধন্য হইত মরম মাঝারে সে প্রিয় পরশ লভি,—
প্রেমিক হাফেজ কবি।
নিত্য রচিত কত প্রেমগীতি,
অঞ্জলী দিত তারে নিতি নিতি,
তুলনা করিত ঈঙ্গিত সাথে কত তারা শশি রবি।
মুগ্ধ প্রেমিক কবি।

গাহিল হাফেজ গান—
"বোখারা সমরখন্দ সহর
তাহারে করিব দান
তুরকি সিরাজ দেশের মাঝারে,
এমন রূপসী যে মিলাতে পারে
প্রিয়ার মতন লাবণ্য যার—" মাধুরি মুগ্ধ প্রাণ,
গাহিল হাফেজ গান।
"রক্তিম যার গণ্ড যুগল,
সে মাধুরী করে পরাণ পাগল
গোলাপ কপোলে কাল তিল এক করিবে অধিষ্ঠান,
গাহিলহাফেজ গান।
সারাটি জনম ঈঙ্গিতে মাগি,
রক্ত কপোলে কাল তিল লাগি
বোখরা সমরখন্দ সহর করিতে পারি যে দান।"
গাহিল হাফেজ গান।

তাইমুর শাহ কয়—
সে গান শুনিয়া কবিরে ডাকিয়া
"এও কি কখন হয়?"
"আমার দুইটি শ্রেষ্ঠ নগরে,
দান করে দিতে পার অকাতরে
হে বিভোর কবি কখন কি তুমি রাজ্য করেছ জয়?"

"বোখারা সমরখন্দ গ্রাসিতে,
কত যে সৈন্য হয়েছে নাশিতে,
স্রোতের মতন রাজ কোষ হতে অর্থ হয়েছে ক্ষয়।"
তাইমুর রাজা কয়।
"ধন সম্পদ ধরার বিভব,
সাম্রাজ্য আর যত কিছু সব
তোমার প্রিয়ার রূপ তুলনায় সকলি কি ধূলিময়?"
তাইমুর রাজা কয়।

পাগল হাফেজ কবি—
মাধুরী-কাঙ্গাল হৃদি মাঝে তার
পরম রূপের ছবি।
কহিল রাজারে "সুষমা মাগিয়া,
ফিরি যে ভুবনে ভিখারী সাজিয়া,
শ্রেষ্ঠ রতন বিলাইতে পারি অতুল শোভায় লভি!"
মাধুরিকাঙ্গাল কবি
"জগতের মাঝে ফিরি উদাসীন,
শোভার লাগিয়া রাজা আমি দীন,
দুখ দারিদ্র্য দারুণ অভাব
সহিতে পারি যে সবি।"
মাধুরী কাঙ্গাল কবি।

হিয়ার মাঝারে পরম রতন,
সে রূপেতে কবি থাকিত মগন,
চিত্ত আকাশ আলো করে তার ভাতিত যে প্রেম রবি,
প্রেমিক হাফেজ কবি।

শ্রীঅবনীকুমার বসু।

পণ্ডিত ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর।

আজকাল জাতীয় মহাসমিতির কল্যাণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের অধিবাসীবৃন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুল্য আশার আকাঙ্ক্ষা অভাব অভিযোগালোচনায় সমবেত হইয়া পরস্পর ভাব বিনিময়ে ভারতের আন্তর্জাতিক ঐক্য সংস্থাপনে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু পরম্পরা সঞ্চিত জাতীয় ভাব—যে ভাব অবলম্বন করিয়া একটী জাতি গড়িয়াউঠিয়াছে—সেই মূলভাবটী সেই জাতির ভাষা ব্যতীত অন্য কোথায়ও পূর্ণ বিকশিত ভাবে পাওয়া যাইবে না। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে সপ্রমাণ এবং একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হইলেও কোনও প্রদেশের সাহিত্য—নিহিত ভাব রাজির বিনিময় ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশ পূর্ণ একপ্রাণতা লাভে সক্ষম হয়না। রূপ কথার ভাষায় বলিতে গেলে কোনও জাতীর প্রাণ তদ্দেশের সাহিত্য কৌটার মধ্যে সুরক্ষিত আছে। সেইজন্য অপর প্রদেশের প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইতে হইলে ঐ সাহিত্যের কৌটাটির অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোনও জাতির সাহিত্যের সহিত পরিচয়ই, তজ্জাতীয়ের অন্তরে প্রবেশ করিবার একমাত্র সুগমদ্বার। এই হেতু যিনি স্বকীয় প্রাদেশিক ভাষায় সঞ্চিত ভাব সমূহ, অন্য প্রদেশের ভাবের সহিত সম্মিলিত করিতে পারেন, তিনি যে আন্তর্জাতিক ঐক্যবন্ধনে একজন বিশিষ্টভাবে উল্লেখ যোগ্য স্মরণীয় মাননীয় ব্যক্তি—একথা সহজেই অনুমেয়।

আমরা বহুভাগ্যফলে এমনই একটী রত্ন লাভ করিয়াছিলাম যিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, ঐকান্তিক সাধনায় ও অনুরাগে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া উক্তভাষায় স্বজাতীয় ভাব প্রবাহ বঙ্গবাসীর চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তুহায়! দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর এবং দুর্ভাগ্য বঙ্গভাষার যে—সেই স্বদেশপ্রেমিক বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের প্রেমপ্রণোদিত অযাচিত দান সম্যক লাভ করিবার পূর্ব্বেই কালের করালহস্ত

তাঁহাকে ইহধাম হইতে অপসারিত করিল! আজ আমরা যে রত্নটী হারাইলাম, কালচক্রের আবর্ত্তনে আবার তেমনটি ফিরিয়া পাইব কি না—সর্ব্বনিয়ন্তৃ ভগবানই জানেন। আমাদের সেই পরম আদরের রত্নটী—শান্ত, সৌম্য, সদাচার, তেজস্বী, সুলেখক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর! এইজাতীয় নবভাবোন্মেষের যুগে—সমগ্র ভারতীয় নেশনগঠনের যুগে-সমগ্র ভারত ব্যাপী সম্মিলনের যুগে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কেবল একটী সখারামই, ভিন্নপ্রদেশের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে স্বজাতীয় ভাবরাজি বিতরণ করিয়াছেন, এবিষয়ে সখারামই পথপ্রদর্শক, এখন আশা করা যায় যে তাঁহার এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তদীয় পদাঙ্কানুসরণে তৎপ্রদর্শিত পথে অনুগামী হইয়া অনেকেই একজাতীয়ত্বের পথ প্রশস্ত করিবেন। তাই বলি, বঙ্গ সাহিত্যে ও ভারতীয় আন্তর্জাতিক ঐক্য সংগঠনে সখারামের স্থান নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই, কালে তাহা স্বতঃই স্থিরীকৃত হইবে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে স্বনামধন্য নৌরাজী, গোখলে, মেটা, তিলক প্রভৃতি মহানুভবগণের তুলনায় সখারাম নগন্য ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহার জীবনে প্রশংসা বিমুখীনীরব সাধনা এবং ঐকান্তিকী কার্য্যকারিতা ও প্রভাব জাতীয় নব উদ্বোধনে ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূণ নহে।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত রঘুজী ভোঁসলা, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত একটী সন্ধিসূত্রে বঙ্গদেশের যৌথরূপে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রাপ্ত হন, তৎকালে কৃষ্ণভট্টরায়কর নামক একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ রঘুজীর দূতরূপে মুর্শিদাবাদে আলিবর্দ্দীখাঁর সভায় কিছুকাল বাস করেন, নবাব বীরভূমের শাসন কর্ত্তা বাদিয়াৎজামা খাঁর প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দণ্ডদিতে স্থির সঙ্কল্প হন, কিন্তু রায় করের সহায়তায় তিনি দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রায়করকে দেওঘরের নিকটবর্ত্তী করোঁ গ্রামটী দান

পরিবারের একটী কন্যার পাণিগ্রহনান্তর যৌতুক স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া সখারামের পিতামহ কচোঁতে বাস করিতে থাকেন এই কচোঁগ্রামেই আমাদের সখারাম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশাবলী দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায় যে তিনপুরুষ তাঁহাদের বাঙ্গালায় বাস সুতরাং বাঙ্গালা জলবায়ুর প্রভাব তাঁহার বঙ্গদেশানুরাগিতার হেতুভূত, ইহা পরিকল্পনা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হইলেও অন্য কোথায়ও এরূপ প্রভাব ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হয়, কর্ম্মসূত্রে কিম্বা অন্য বহুবিধকারণে অনেকে বঙ্গদেশের অধিবাসী হইলেও কই এমন প্রাণ ঢালিয়া বাঙ্গলাকে ত কেহ ভাল বাসে নাই—নিজত্ব ভুলিয়া এমন করিয়া ত কেহ বাঙ্গালী হয় নাই—ইহাই সখারামের বিশেষত্ব।

সখারামের বাল্যশিক্ষা গ্রামস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হইতে পারে সেবিষয়ে সঠিক আমাদের কিছু জানা নাই, তার পর দেওঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় অধ্যবসায়শীল, মেধাবী, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র ছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জনে একাগ্রনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ 'মাইকেলের জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, যোগীন্দ্রবাবু সখারামের গুণগ্রামে ও মধুর চরিত্রে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিতেন এবং বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষায়, তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া উক্ত ভাষাশিক্ষাকল্পে তাঁহাকে যথোচিত সহায়তা করিতেন, সখারাম তৎকালে এমন সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন যে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও রচনা নৈপুণ্যে যোগীন্দ্রবাবু মুগ্ধ হইতেন। 'জাতীয়ত্বের পিতামহ' প্রবীণ সাহিত্যিক ধর্ম্মপ্রাণ ৺রাজনারায়ণ বসুও সেই সময় দেওঘরে বাস করিতেন। যোগীন্দ্রবাবু সখারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট যাইতেন এবং তথায় সাহিত্যালোচনা হইত। প্রকৃতপক্ষে

নারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহ এবং আনুকূল্য বারিসিঞ্চনেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি দেওঘর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু পারিবারিক অবস্থার প্রতিকূলতা নিবন্ধন তাঁহাকে অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। পাঠত্যাগের পর তিনি কিছুদিন উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইলেও সখারামের জ্ঞান পিপাসা পূর্ব্ববৎ বলবতী ছিল। অবসর কালে তিনি অতি যত্ন সহকারে মহারাষ্ট্র সাহিত্য বিশেষতঃ ইতিহাস এবং বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন।

এই সময় জনৈক রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে তিনি হিতবাদীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় তিনি দেওঘরের শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মনে পূর্ব্বহইতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, মহারাষ্ট্র জাতীর ইতিহাস ও গৌরব প্রচার দ্বারা তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে অমূলক বর্গীভিতি ও অশ্রদ্ধার অপনয়ন করিবেন, এই বিষয়ে তাঁহার সাফল্য লাভের অন্তরায় ও বিশেষ কিছুই ছিলনা। কারণ যিখন তিনি স্বকীয় প্রাণপণ চেষ্টায় বঙ্গ ভাষা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তখন তাহাদেরই একজন হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রের ভাব প্রচারে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন সখারামকে বর্গী বলিলে তিনি বলিতেন 'দেখো, বর্গী কি ক'রে তোলে, প্রকৃতই সখারাম তাঁহার কলিকাতা বাসের পর হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বর্গীভয় নিরাকৃত করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে মাহারাষ্ট্র জাতী ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হিতবাদীর প্রুফসংশোধকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি উচ্চশ্রেনীর মাসিকপত্রে মহারাষ্ট্র ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন; ক্রমে তাঁহার কার্য্যনিপুণতার ফলস্বরূপ তিনি হিতবাদীর

দক নির্ভীক পণ্ডিত কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। পণ্ডিত কাব্য বিশারদ তাঁহাকে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, কাব্য বিশারদের মৃত্যুর পর সখারাম হিতবাদীর সম্পাদকের পদে উন্নীত হন।

তিনি সম্পাদকের কার্য্যভার কিরূপ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন তাহা হিতবাদীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। হিতবাদীর সম্পাদকত্বকালে তিনি উক্ত পত্রিকায় মহারাষ্ট্র ইতিহাস ও শিবাজী মহারাজ সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন; দুঃখের বিষয় সেই রত্নরাজি হিতবাদীর অঙ্কেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সেই প্রবন্ধ সমূহ সংগৃহীত হইয়া সুরক্ষিত হইলে ভাবী মহারাষ্ট্র ইতিহাস লেখক ও শিবাজী জীবন চরিতকারের অনেক সাহায্য হইতে পারে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কলঙ্ককালিমাচিত্রিত শিবাজী চরিত্র পাঠে তিনি ব্যথিত হন এবং সেই মহাপুরুষের কলঙ্ককালিমা মোচন করিয়া তাঁহার শুভ্র-ভাস্বর চরিত্রের অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকটনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা। সখারামের রচনার বিশেষত্ব এই ঐতিহাসিক এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী ব্যতীত তরল রচনা কখনও তাঁহার লেখনীমুখ হইতে বহির্গত হয় নাই, তিনি সম্পাদকের কার্য্য কিরূপ দায়ীত্বপূর্ণ ও মহনীয় জ্ঞান করিতেন উহা তাঁহার জনৈক সহকারীর উক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেন 'সখারাম আমাদিগকে বলিতেন "দেখ সম্পাদকের লাভালাভের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না, যদিও এইকার্য্যে লভ্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু বিলাস বহুল জীবনযাপন না হইতে পারে তবু ও এর একটা মহত্ব আছে—সম্পাদকের দারিদ্র্যেরও একটা মহত্ব আছে। ভগবান যখন আমাদের এই কাযে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন দেশ ও দশের সেবা করিতে পারিলেই আমরা সফলজীবন।" একটী বাক্য হইতেই তাঁহার সম্পাদকজীবনের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি হয়।

কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তদীয় বিবেকবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে বলায় কিরূপ তেজস্বিতার সহিত একবার হিতবাদীর কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এমনই বিরাট বিশাল হৃদয় ছিল সখারামের!

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবগুলিই ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ এবং তাঁহার অতুলনীয় অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। তিনি সকল পুস্তকেই ভাষাশুদ্ধির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার গ্রন্থ নিচয় বঙ্গসাহিত্যের ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য, তিনি বঙ্গবাসীর নিকট মহারাষ্ট্রশ্লাঘার পরিচয় প্রদান জন্য বাজীরাও, ঝান্সীর রাজকুমার ও আনন্দীবাই এই তিন খান গ্রন্থপ্রণয়ন করেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার দেশের কথা, তিলকের মোকর্দ্দমা, মহামতি রানাডে এটা কোন যুগ? বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ? এই কয়খানি গ্রন্থ আছে।

এতন্মধ্যে তাঁহার 'দেশের কথা' তাঁহাকে জনসমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। এই পুস্তকখানি হিন্দীতে 'দেশ কি বাত' নামে অনুবাদিত হইয়াছিল, দেশের কথা যেরূপ সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছিল বাঙ্গালাভাষার কোন পুস্তক বোধ হয় এরূপ বহুল পরিমানে প্রচারিত হয় নাই। এই পুস্তকে তিনি যেরূপ অসামান্য অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। 'দেশের কথা' সখারামের অমর কীর্ত্তি। এই পুস্তক প্রচারেও সখারামের মহত্ব বিশেষভাবে অভিব্যক্ত; তাঁহার পুস্তকের প্রচার যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল তিনিও সেই অনুসারে মূল্য হ্রাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ মহদ্দৃষ্টান্ত বঙ্গীয়সাহিত্যিক সমাজে বিরল এবং তাঁহাদের অনুকরণযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তক খানি হঠাৎ 'নিষিদ্ধ' প্রচার হওয়ায়, পুস্তক মুদ্রনের ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। সখারাম দেশের দৈন্য ও দুর্দ্দশায় প্রাণে প্রাণে ব্যথিত হইয়াছিলেন, দেশের দুরবস্থায় যথার্থই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের

ছিলেন, কর্ত্তব্যপরায়ন সখারাম দেশের নিকট তাঁহার ব্যক্তিগত দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অমৃতময় ফল তাঁহার 'দেশের কথা।' ক্ষুদ্রগল্প ও প্রণয়কবিতাপ্লাবিত দেশে ইহা এক অপূর্ব্ব নূতনত্ব ও গম্ভীরত্বময়। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন 'আমি দেশের কথা পড়িয়া কাঁদিয়াছি'—দেশের কথা পাঠে এইরূপ অনেকেরই চক্ষু ঝরিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এই সমপ্রাণতার অশ্রুবিন্দুই সখারামের 'দেশেরকথার' সার্থকতা সূচনা করিতেছে। এইত গেল তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর কথা। সারাজীবন ধরিয়া তিনি মহারাষ্ট্র ইতিহাস ও শিবাজীর সুবিস্তৃত জীবন চরিতের যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, তাহার সুপরিপক্ক ফল বঙ্গবাসীর নৈবদ্যে উপহার দিতে পারিলেন না। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে এই যুগলরত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। গৌণভাবে তিনি বঙ্গভাষায় আরও দুইখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে সখারামের সহায়তা না পাইলে তিনি 'অহল্যা বাই' ও 'তুকারাম চরিত' রচনা করিতে পারিতেন না।

দেউস্কর মহাশয় কিছুদিন জাতীয় বিদ্যামন্দিরে ভারতেরইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন, তাঁহার অধ্যাপনার কৃতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্রগণ শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত তিনি National Reading Room এর সভ্যবৃন্দের নিকট, ছয়মাস কাল, বৈদিকযুগের ইতিহাস অধ্যাপনা করেন। এখানেও তাঁহার পারদর্শিতা সুপরিস্ফুট। সখারাম একাধারে বহুগুণের আধার ছিলেন। তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার হৃদয়ভাব সহজেই অনুমিত হইত। বিলাসিতা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। সেই শিখাসমন্বিত সরলবেশ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে দেখিলেই মস্তক অবনত হইত।

কিন্তু হায়! সখারামের শেষ জীবন বড়ই কষ্টময় ও মর্ম্মভেদী-

তাহার উপর আবার দুইটী সংঘাতিক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার যাতনা সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিল। প্রথম তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম একমাত্র পুত্রের বিয়োগে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ শোকশেল বিদ্ধ হইল এবং সেইক্ষত শুকাইতে না শুকাইতে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী উচ্চহৃদয়া সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। সখারাম ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন এবং বিগত চৈত্রমাসে তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবৎ কৃপায় সখারাম সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য আর ফিরিল না। এই সময়ে তিনি ব্যাধি ও শোকের তুষদাহে যেমন দগ্ধ হইতেছিলেন দারিদ্র্য এবং অভাবের নিষ্পীড়নে ও তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট পান নাই। কলিকাতায় অবস্থানকালে অর্থাভাবে তাঁহার সুচিকিৎসা ও সুপথ্যের ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা স্মরণ করিলেও লজ্জায় অবনত মস্তক হইতে হয়। যে সখারাম, যে, মারাঠার সখারাম বাঙ্গালার হইয়া-বাঙালীর হইয়া—বাঙ্গালাভাষার নিজের হইয়া যাঁহাদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমে রত্ন সংগ্রহ করিলেন হায়! সেই সখারামের রোগশয্যায় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, সেই মহানচেতা ব্রাহ্মণের রোগশোক ভারাক্রান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট মর্ম্মে কেহত সহানুভূতির হস্ত বুলাইলেন না! অনেকে হয়ত আক্ষেপ করিবেন, চিরাভিশপ্ত বাণীসেবকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে সখারামের জীবনেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। মাইকেল হেম চন্দ্রের যুগ ত চলিয়া গিয়াছে, আজকাল—বঙ্গসাহিত্য পূর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়াছে, এখন ত অনেক অনুরাগী সাহিত্য সেবী দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও কি সেই মামুলীধরণে বিধাতার অভিশাপের দোহাই দিতে হইবে? সুলেখক জলধর বাবু সেদিন বড় কষ্টেই মেয়েদের কথায় বলিয়াছিলেন—'থাকৃতে দিলে না ভাতকাপড়, ম'লে কর্‌বে দান সাগর' সত্যই দুঃস্থ সাহিত্যেসেবীর জীবতাবস্থায় তাঁহাকে রোগে শোকে শান্তি ও সাহায্য দান না করিয়া, জীবনান্তে একখানি তৈল চিত্রে তাঁহার স্মৃতি পর্য্যবসিত হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্তনহে। ইহা অতি মাত্র পাশ্চাত্যানুকারিতার বিষময় ফলও অতীব হাস্যকর।

যাহা হউক তাঁহার দেওঘরে অবস্থান কালে বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক যে বাঙ্গালীর দ্বারাই কিয়ৎ পরিমানে অপনীত হইয়াছিল ইহাই সান্ত্বনা ও আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং সখারামের কতিপয় ছাত্রের যত্নে ও চেষ্টায় দেওঘরে তাঁহাকে অভাব নিষ্পেষিত জীবন যাপন করিতে হয় নাই। ছাত্র কয়টি তাঁহার ঘরভাড়া ও ঔষধের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার লন এবং যোগীন্দ্র বাবু তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সখারামের সময় হইয়া আসিয়াছিল, আর অধিক দিন তাঁহাকে যন্ত্রনাদিগ্ধ প্রাণে হাহুতাস করিতে হইল না। ৮ই অগ্রহায়ন শণিবার জ্বালা যন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যভবন ত্যাগ করিয়া চির শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রামলাভার্থে অমর লোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন। সখারামের দগ্ধ হৃদয় জুড়াইল! থাকিল একমাত্র অনাথাবালিকা, জীবনের শেষ সম্বল, আশ্রয়তরুপিতাকে হারাইয়া বিলাপের জন্য বুক আছাড়িয়া কাঁদিবার জন্য। ভাই বাঙ্গালী তোমাদের সখারামের অনাথা নিঃসহায়া তিনবর্ষ বয়স্কা এই কন্যার মুখের দিকে চাহিবে না কি?

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সেকালের চিত্র।

সূচনা।

১৮৬৭ সাল

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ।

তখন কিশোরগঞ্জ মাইনার স্কুলে পড়িতাম। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি তাহা জানিতামনা। কিন্তু নূতনে ও পুরাতনে যে একটা সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে তাহা অনুভব করিতাম। দেখিতাম পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের দিকে যাইবার জন্য প্রাণের টান, শুধু আমার নহে, সমসাময়িক অনেকেরই। কিন্তু কোন্ খানে পুরাতন ছাড়িয়া নূতন ধরিতে হইবে, পুরাতন কোনটা কি প্রকারে ছাড়িব নূতন

কোন্‌টা কেমন ভাবে ধরিব তাহা নিজেও বুঝিতামনা, বুঝাইয়া দিবার অন্য লোকও ছিলনা,—বোধ করি কেহই বুঝিতে পারিতনা।

সুবিজ্ঞ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন কিশোরগঞ্জের সবডিভিসনেল অফিসার ছিলেন। তখন সেই মহকুমা (সবডিভিসন) মাত্র অল্পদিন যাবৎ খোলা হইয়াছে ; রাস্তা ঘাট, আফিস হাট, সমাজ সভ্যতা, আদব কায়দা সকলই রাম শঙ্করবাবুকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে ও সকলকে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত হস্তেই উপযুক্ত বিষয়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি স্থির ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার তীব্র শাসনে এলাকার যত দুর্দ্দান্ত লোক সর্ব্বদা সন্ত্রাসিত থাকিত অথচ তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সদুৎসাহে শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাইত। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল লিখা পড়া হইত তাহা শুদ্ধ রূপে লিখা তখনকার লোকের অভ্যাস ছিলনা, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও ষত্ব ণত্ব বোধ ছিলনা। বাবু রামশঙ্কর সেন কোথাও ব্যঙ্গ করিয়া, কোথাও মিষ্ট শাসন করিয়া কোথাও উপদেশ দিয়া সকলকে শুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে শিখাইতেন। যাহারা কখনও কোন স্কুলে পড়ে নাই তাহারাও তাঁহার নিকট কোন কাগজ লিখিয়া উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে শুদ্ধরূপে লিখা হইয়াছে কিনা তাহা অপর কেহকে দেখাইয়া লইত; একবারে "গুরুদাষ" "চোরামনী,, "তক্রবাগিশ, "চর্কবর্ত্তি" লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে সাহস করিতনা।

সেসময়ে মাজিষ্ট্রেট যাহাকে সার্টিফিকেট দিতেন সে-ই মোক্তার হইতে পারিত। কোন বুদ্ধিমান (intelligent) ভদ্র সন্তান সে জন্য রামশঙ্কর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে কোন বহুদর্শী প্রাচীন মোক্তারের অধীনে মোহরের রূপে কাজ করিতে দিয়া, কিছু শিক্ষা হইলে পর, মোক্তারি সার্টিফিকেট দিতেন। নিতান্ত বোকা কেহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। শেষোক্তরূপ একটী লোক একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার

করিয়া লিখিবে বল দেখি, তবেই তোমাকে মোক্তারীতে পাশ করিয়া দিব"—কিন্তু সে বেচারা তাহা পারিল না, তাহার নানারূপ প্রয়াশ দেখিয়া কাছারীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সেই রামশঙ্কর বাবুর বাসায় রবিবার সন্ধ্যার পর, সভা বসিত শুনিতাম। সেখানে তিনি নিজে বই দেখিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া উপাসনা করিতেন, স্কুল মাষ্টার ও পণ্ডিত প্রভৃতি দুই চার জন উপস্থিত থাকিতেন, কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টার তবলা বাজাইয়া গান করিতেন। ইহার নাম ছিল 'ব্রহ্ম সভা' উপাসনা শব্দ তখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই,—অনতন্তঃ আমরা শুনিতে পাই নাই। ইহাতে আমাদের যাইতে সাহস হইত না, কেহ যাইতে বলিতও না। আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এই সভা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আমরা স্কুলেই শুনিতে পাইতাম।

মাষ্টার মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতিকূলে অনেক কথা অনেক সময় আমাদিগকে শুনাইতেন, কিন্তু আমার কাছে সে সকল বড় ভাল লাগিত না। কারণ নূতন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিষ ধরিবার পন্থা দেখাইয়া না দিয়া, যদি কেহ ঘরের জিনিষটার কেবলই নিন্দাবাদ করে, তবে তাহা ভাল লাগিবে কেন? কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ ঝুলনমেলার বাজার হইতে উক্ত মাষ্টার মহাশয় তালতলার এক জোড়া হল্‌দে রঙের চটী জুতা খরিদ করিয়া বলিলেন "এবার কার্ত্তিকের চামের জুতা কিনিয়াছি।" সেই সময়েই দেখিলাম রামশঙ্কর বাবুর পায় এক জোড়া চটী জুতা একবারে টুক্‌টুকে লাল, তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম "ইহাকে হয় তো আপনারা গণেশের চামড়ার বলিবেন"—শুনিয়া তিনিও হাসিলেন। এরূপ ব্যবহারদ্বারা হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রাচীনলোকদের প্রাণে অকারণ কেবল ব্যথা দেওয়া হয় মাত্র, তাহাতে সমাজ সংস্কারের বা ধর্ম্ম সাধনের, কি ধর্ম্ম প্রচারের কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হয় না। কিন্তু তরুণ বয়স্ক যুবকদিগের মনে এরূপ ধীর চিন্তা স্থান পায় না। ঐরূপ

মহেশবাবু ও গোবিন্দবাবু হয়বৎনগরের দেওয়ান সাহেবের খানা খাইয়াছেন। সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাঁহা- দিগকে বাড়ীতে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইতে লাগিল।

গোবিন্দবাবুর একটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি একজন সুলেখক ও কবি ছিলেন—বিক্রমপুরের কুলীন ব্রাহ্মণ—নাম গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্কুলের পণ্ডিতী কাজে সে স্থানে গিয়াছিলেন কিন্তু গুণগ্রাহী রামশঙ্করবাবু যেখানে একটী ভাল লোক পাইতেন সেখান হইতেই তাহাকে আনিয়া তাঁহার আফিসে কাজ দিতেন। এই ভাবে গোবিন্দবাবুকে এবং বাবু রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আরো একজন স্কুল মাষ্টারকে আনিয়া আফিসে কাজ দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজনেই পরে ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করিয়া হোসেনপুরের মুনসেফী আদালতে উকীল হইয়াছিলেন।

গোবিন্দবাবুর "কুলীন কুলাঙ্গণা" কাব্যের

ওরে ও কৌলীন্য দুরাচার, তুই শুধু পাপের আধার,
কতগুলি কুলাঙ্গার, পূজি তোরে অনিবার,
মোদের দুঃখের নদী করেছে অপার।
ছাড় রে কৌলীন্য ছাড় বঙ্গ অধিকার
তা না হলে পদাঘাতে ভেঙ্গে দিব হাড়
তোর ভেঙ্গে দিব হাড়॥"

তাঁহার "পদ্যপ্রভার"

"কে করেছে মানবের মুখশশি রচনা ?
সুনীল গগনোপরে, শারদীয় শশধরে,
যেই জন কৃপা করে, করিয়াছে স্থাপনা।
সে করেছে মানবের মুখ শশি রচনা।

"কে করেছে মানবের বাহু যুগ রচনা ?
গড়িয়া মৃণাল নাল, বেড়িয়া কণ্টক জাল,
জাল রাখি চিরকাল যে দিতেছে যাতনা

প্রভৃতি কবিতাগুলি যে তখন পড়িতাম আর মুখস্থ হইয়া যাইত তাহা অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই।

হেডমাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, তিনি তখনকার দিনের একজন Junior scholar ছিলেন। বিক্রমপুরের কোন পল্লীগ্রামস্থ একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ছিলেন, এক জেঠাই মা ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। হয়বৎনগরের জমিদার দেওয়ান সাহেব এবং তাঁহার কর্ম্মচারী দেওয়ান মুনসী প্রভৃতির চেষ্টায় হয়বৎ-নগরে একটী স্কুল খোলা হয়, মহেশ বাবু মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে সেই স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসেন। বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের সময়ে সেই স্কুল হয়বৎনগর হইতে উঠাইয়া কিশোরগঞ্জে আনা হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক হন। পরে এই স্কুলের নানাবিধ উন্নতি হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে মহেশ বাবুর এমনি দখল ছিল যে তাহা দেখিয়া নূতন পাশ করা B, A, ও M, A, অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ও উচিত বক্তা এবং বিদূষক লোক ছিলেন। তাঁহার মিত-ব্যয়ী স্বভাব কার্পণ্যে পরিণত হইয়াছিল, সে জন্য অপরিণামদর্শী ও অপব্যয়ী অনেকে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত—তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল এবং শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার কাছে মাইনর স্কুলে ছাত্রদের যেরূপ ইংরেজী শিক্ষা হইত এখনকার কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যেও অনেকের সেরূপ হয় না।

এই মহেশ বাবু ও গোবিন্দ বাবু সেকালের সংস্কারকদিগের অগ্রণী ছিলেন। সংস্কারক বলিয়া তখনও কোন দলের সৃষ্টি হয় নাই, তাহার পন্থাও কেহ জানিতেন না সুতরাং অনেক সময়ে অনেক বিষয়েই তাঁহারা বিপন্ন ও উৎপীড়িত হইতেন।

ময়মনসিংহ হইতে "বিজ্ঞাপনী" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির

উঠিয়াছে, তাহাতে পড়িয়া কোন কোন শিক্ষক বাবু ডুবু খাইতেছেন, কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে আবর্ত্ত চলিয়া যাইবে।"

(ক্রমশঃ)

ভুলোনা।

১

সংসার আবর্ত্তে পড়ি,   দুজনায় ছাড়া ছাড়ি
কভু যদি হয় সখা, এ দুঃখী ধরায়—
মনে রেখো ভুলোনা আমায়।

২

যদি ক্ষুব্ধ ঝটিকায়—   প্রেম ফুল ঝরে যায়
স্মৃতির মন্দিরে তুমি তুলে রেখো তায়,—
মনে রেখো ভুলোনা আমায়।

৩

মিশি প্রিয় বন্ধুদলে   সংসারের কোলাহলে
বারেক ভাবিয়ো সখা, এই অভাগায়—
মনে রেখো ভুলোনা আমায়।

৪

যবে মৃত্যু ঘনঘোর   ঢাকিবে জীবন মোর
দুই ফোঁটা আঁখিজল দিয়ো তুমি তায়,—
মনে রেখো ভুলোনা আমায়॥

নির্ম্মলা বালা—

ধ্রুব চরিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২

ধ্রুব জননীর অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখাহত হৃদয়ে,

এদিকে নারদ ধ্যানযোগে ধ্রুবের মানস জানিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং প্রণত ধ্রুবের মস্তক সর্ব্বপাবন মঙ্গল হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। ধ্রুবের জীবন নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনা হইল। নারদ ধ্রুবের সংকল্পের দৃঢ়তা ও সাধনার গভীরতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৃষার্ত্ত ব্যক্তি জল পানের আশায় বড় আগ্রহের সহিত অন্তঃ সলিলা স্রোতস্বিনীর গর্ত্ত খনন করিতে থাকিলে যদি কেহ আসিয়া বলে, "তোমার খননবৃথা এখানে প্রবাহ নাই," তখন তাহার যে দশা হয়—ধ্রুবও নারদের বাক্য শ্রবণে তদবস্থ হইলেন। নারদ নিরাশার ভীষণ মূর্ত্তি ধ্রুবের সম্মুখে ধরিলেন। যে সমস্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানব জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, পরীক্ষাবচনচ্ছলে একে একে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। ভারতে অদৃষ্টবাদ বড় প্রবল। যে pessimism না বুঝিতে পারিয়া ভারতে কর্ম্মের আদর্শ মুছিয়া গিয়াছে নারদ প্রথমে সেই অদৃষ্টবাদের কথা পাড়িলেন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার কি অর্থ বুঝিয়াছিলেন জানিনা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ আপনার স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী অর্থ বাহির করিয়া সকলেই "হাতকাটা জগন্নাথ" হইয়া পড়িল।

সুজলা, সুফলা, অক্ষয় শস্যশালিনী ভূমি জীবনযাত্রা সহজসাধ্য করিয়া, জীবন-সংগ্রামের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মৃদু হইতে মৃদুতর করিয়া ফেলিল; বিলাসবর্দ্ধক জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে আলস্য-সহোদর অদৃষ্টবাদ যুক্ত হইয়া ভারতের ইতিহাসের এক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। মানুষ বড় চমৎকার আদর্শ পাইল—"লিখিলেও মরণং না লিখিলেও মরণং—কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং"। এ বাক্যটী কেবল হাসি-মস্করা নহে, ইহার ভিতরে অতি দুঃখের কাহিনী নিহিত। ভারতের দুর্দ্দশার দিনে অদৃষ্টবাদের তত্ত্ব মানুষ এমনি করিয়া বুঝিয়াছিল, এবং এইরূপ বুঝিয়াই, নিষ্কর্ম্মা হইয়া আহার, বিহার ও নিদ্রার সেবা করিতেছিল। জলাতঙ্ক রোগের ন্যায় দেবাতঙ্ক রোগের উৎপত্তি হইল; সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত উদ্যোগ দৈবের নামে ... ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় দৈবের বোঝা অবিতর্কিতভাবে

সকলে সহ্য করিতে লাগিল। দৈব যেন ডাকিয়া কহিল,—"রে গর্দ্দভ, যে বোঝা চাপাইলাম, ইহা নীরবে, বিনা ওজর আপত্তিতে, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় বহিয়া লইয়া যাও। আদেশ অগ্রাহ্য করিওনা, কারণ তোমার বোঝা না বহিবার পক্ষে কোন নজির নাই, সুতরাং এক তরফা ডিক্রি আমিই পাইব, কারণ আমার নজির অকাট্য—"নিয়তি কেন বাধ্যতে"। এতদর্থে এই বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া গেল।"

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি নারদ সেই উৎসাহান্তক দৈবের কথা উঠাইলেন—

"যস্য যদ্দৈব বিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী আত্মনঃ পার মৃচ্ছতি॥

ধ্রুব অবহিতচিত্তে সে কথা শুনিলেন, কিন্তু অমনি তাঁহার হৃদয়ে কে যেন মহ্লারে তান তুলিয়া দিল—

"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা॥"

ধ্রুব পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি, সুতরাং দৈবকে বিনাশ করিয়া তিনি আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প। আবার যখন নারদ বলিলেন, "তোমার ধর্ম্মসাধনের কাল উপস্থিত হয় নাই, "নিবর্ন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।" ফিরিয়া যাও,—বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মসাধন করিও, এখন নহে"—ধ্রুব তখন মাতার কথা মনে করিলেন। তাহার সেই শিশিরসিক্ত-নলিনীর মত অশ্রু-প্লাবিত মুখ মণ্ডল স্মরণ করিয়া তাঁহার আশ্বাস ও নির্দ্দেশবাণী মনে করিলেন একবার ভাবিলেন, "ফিরিয়া যাইব কি?" কিন্তু তখনই ধীরে ধীরে বেহাগের করুণ ছন্দে, হৃদয়-যন্ত্রে নিরাশার চরম রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল "যত্নে কৃতে যদিন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। ধ্রুব ভাবিলেন ফিরিব কেন? সাধনার পরপারে যাই বা না যাই সে পরের কথা, কিন্তু তীরে এসেই ঢেউ দে'খে কেন ফিরিব?" উপেক্ষাই যদি সহিতে হইল, তবে মানবের উপেক্ষা বক্ষে লইয়া মরমে মরিয়া থাকি কেন? এই জনশূন্য কাণ্ডারি, সেই অতিমানুষ পিতার উপেক্ষাঘাতে

উপস্থিত হইলে তাহাকেও সুখ কল্পনা করিয়া আলিঙ্গন করিবে।" ঠিক এই ভাবেই John of Gaunt স্বীয় পুত্র Bolingbroke এর অন্যায় বিচারদলিত, আহত হৃদয় শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সেই পুরুষ সিংহ যেমন বলিয়াছিলেন,

"O, who can hold a fire in his hand
By thinking on the frosty concasas ?

তেমনি ভাবে,—না, আরও মিঠা মোলায়েম ভাবে, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, পাশ্চাত্যভাবের প্রতিকূলতায়, ঋষিবাক্য প্রত্যাখ্যানের কারণ আপনার বালকত্ব ও শোকজনিত মোহে আরোপ করত ধ্রুবও বলিয়াছিলেন,—

"অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ।
সুরুচ্যা দুর্বচো বাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি॥

নারদের একটী শ্লোকে, মানবমনের একটী রহস্য সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেটী জগতের একটী রোগ বিশেষ—"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং"। উপদেশ দিবার সময় অনেকেই ভাববাদী (Theorist) হইয়া বসেন। তাঁহারা এক মত ধরিয়া সর্ব্বত্রই তাহা খাটাইতে চাহেন, বিশেষত্বের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। নারদের একটি কথায় এভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—"গুণাধিকান্মুদংলিপ্সে দনুক্রোশং-গুণাধমাৎ।" এইরূপ আচরণ করিলেই জগতে পরাভূত হইতে হয় না; কিন্তু ধ্রুব যে এরূপ আচরণ করিয়াও পরাভূত হইলেন, সুতরাং এ সাধারণ সূত্র তো ধ্রুবের বেলা খাটিবে না। এখানে সে অপরাধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখানে আরও দেখিতে পাই নারদের কথা অনুমান (Theory) আর ধ্রুবের লাঞ্ছনা যে বাস্তব ঘটনা (practical) সুতরাং অনুমানকে ধরিয়া প্রত্যক্ষকে অবহেলা করা সে একটা দোষ। দোষ ঠিক নয়, জগতের একটা চাল হইয়া উঠিয়াছে। যত বড় বড় মাতব্বর উপদেষ্টা সকলের মুখেই পুঁথিগত, চিরপুরাতন উপদেশ "এটা কর, ওটা কর,—সুখে থাকিবে"। যদি বলা যায় যে "এ সকল করেও তো সুখে থাক্‌তে পারিনা, এখন উপায় কি ?" তবেই মুস্কিল।

উপায়টা যে কি তাহা তো কোন দিনও জানি না, অথবা ভাবিও নাই কি হ'তে পারে।"—"তোমার যেমন অদৃষ্ট তেমনই ফলভোগকরিতেছ", নারদও ধ্রুবের অধ্যবসায় পরীক্ষা করিতে পাটোয়ারী গুরুদের মত উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ধ্রুব ভাবুক নহেন, ধ্রুব কঠোর পৌরুষযুক্ত কর্ম্মবীর। ধ্রুব চান কর্ম্মের কথা, ওসব অনুমান ধ্রুবের কাণেও পশিতে পারে না। ধ্রুবের মনে যেন কে বলিয়া উঠিল "এ হবেনা, ও হবেনা, এটা হওয়া উচিত, ওটা উচিত, এ নিয়মের অধীন হ'তে তুমি আস নাই। তোমার দৃষ্টি উচিতানুচিতের পরপারে, বাধা বিপত্তির বাহিরে, কঠোর কর্ম্মের ভিতরে, নিয়ম প্রথার গণ্ডী ছেড়ে, এক চিরপুরাতন আদর্শের দিকে। এক নূতন পথে, নূতনতর সাধনায় তুমি ব্রতী। তুমি পুরুষ, তুমি শক্তিমান্—যাহা কখনও হয় নাই তাহা যে কখনও হবে না, একথা মিথ্যা—এ কথার অসত্যতা তুমি প্রমাণ কর।" উত্তেজিত হৃদয়ে ধ্রুব আর একবার মা'র কথা মনে করিলেন—'তিনি সকলের পিতা, তিনি তোমাকে উপেক্ষা করিবেন না।" আরনা—দূর হও নিরাশা। নিরাশার সকল রকম মূর্ত্তিই ধ্রুব দেখিলেন, কিন্তু সেই তরুণ তপনের সম্মুখে একত্রিত, ঘনীভূত বিঘ্নরাশি, কৃষ্ণশ্যাম পয়োধরের ন্যায় উপস্থাপিত হইয়াও তাঁহাকে অভিভূত করিতে চাহিলেও, স্নেহ উৎসাহজ্বলিত হৃদয় ধূলি সমাচ্ছন্ন হইলেও, তৎক্ষণেই অনুরাগভরে সেই মেঘজাল ও ধূলিরাশি দূরীভূত হইয়া গেল। ধ্রুব নারদবাক্যের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কষিত কাঞ্চনের মত স্বীয় জ্যোতিতে আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, জলদগম্ভীর স্বরে, অকম্পিত ভাবে, বায়ুমণ্ডল স্তম্ভিত করিয়া, জগৎকে চমকিত করিয়া তেজোগর্ব্বিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধুবর্ত্ম মে।
ব্রূহ্যস্মৎ পিতৃভিব্রহ্মন্ন ন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥"

কি উচ্চাভিলাষ! কি স্পর্দ্ধার কথা!—স্পর্দ্ধা সাজে বই কি? এমন শক্তি নিয়া যদি কেহ স্পর্দ্ধা করতো করিও। এ স্পর্দ্ধা অন্তর্নিহিত শক্তির উচ্ছাস মাত্র। এ স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে জগতের কেহ দাঁড়াইতে

পারে না, এ বাক্যের প্রতিবাদে কেহই সমর্থ নহে। এ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে বিঘ্নরাশি, তীক্ষ্ণ অসিমুখে কদলী তরুর ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই পরমভক্ত, অভিমানী বালক, নারদের সকল তর্কজাল ভেদ করিয়া মেঘমুক্ত প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই তর্কব্যূহে প্রবেশ করিয়া মহদাশা সূত্র ধরিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। সেই কূট প্রশ্নমালা ধ্রুবের প্রবল ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া গেল। নারদ বুঝিলেন, এ কেবল নির্ব্বোধ, চপলমতি শিশু নহে, এটী মুক্তলক্ষণাক্রান্ত দেবশিশু।

ঈগল যেমন মধ্যাহ্ন গগণে দীপ্তভাস্করের প্রখর উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার দিকে সবেগে ছুটিয়া যায় ধ্রুবও তেমনি সাধনার তীব্রতা, কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া অতিবড় কৃচ্ছ্র সাধনকে ধরিয়া লইয়া ভাস্করের দিকে ছুটীলেন। চকোর যেমন চাঁদের সুধা পানের আশায় জগৎ ভুলিয়া তাহারি দিকে অতি উচ্চে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ধ্রুব ও তেমনি মরতের স্তর ছাড়িয়া কঠোর তপস্যার বলে "যাহারা পদপথে পড়ে আছে চাঁদ কতগুলা" সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রেম সুধাপানের জন্য চিত্ত চকোরকে ছুটাইয়া দিল। সেই পাঁচ বছরের শিশু তৃণাসনে বসিয়া মন সূক্ষ্ম-যোগ সূত্রে আনন্দ ময়ের সহিত যুক্ত করিল। দুঃখের কাহিনী জ্ঞাপন করিবার জন্য ধ্রুব মানস কপোতকে এক প্রিয়তমের দেশে পাঠাইয়া দিল।

সোফিয়া।

(ইংরেজি হইতে)

সোফিয়া এখন হয়েছে বৃদ্ধা পেকেছে তাহার চুল,
ভূতের মতন রুক্ষ চেহারা এ কথা নহেক ভুল।
কিন্তু শুনেছি সকলেরি মুখে জানি না সত্যি কিনা,
আঁধারে গোপনে রেখেছে লুকায়ে সোফিয়া তন্বীক্ষীণা,
সুনীল সূত্রে বাঁধিয়া যতনে ধূলি ঝুল হ'তে দূরে
এক রাশি প্রেমপত্র তাহার সেগুন বাক্সে পুরে।
যদিও সোফিয়া কঠোর কঠিন পরুষ মলিন আজ,
ফুটে উঠেছিল গণ্ডে তাহার কুসুম কোমল লাজ।

হয়ত শুনিলে হইবে স্তব্ধ এই যে হৃদয়হীনা,
জ্বলেছিল সেথা প্রেমের আগুন কাহারো চেষ্টা বিনা।
হারায়েছে আজ কাজল বরণ এই মসি, সূতা নীল,
এক দিন ছিল আপন গরবে উজ্জ্বল অনাবিল।
পরিনামে তার কি হল জানিনা,—দেখিনি তাহার চিঠি,
কখনো তাহার যাই নাই পাশে—হিংস্র রুক্ষ দিঠি!
কোমলতা ছিল বক্ষে তাহার সন্দেহ হতে পারে,
কিন্তু এ কথা সত্যি সকলে কহিয়াছে বারে বারে।
চিঠির আখর উজ্জ্বল ছিল সূত্র আছিল নীল,
যৌবন তার উঠেছিল ফুটি নির্ম্মল অনাবিল।

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ।

নিরুদ্দেশ।

চৈত্রের শেষ। বি, এ, পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, বেলা ১১টা বাজিয়াছে, আমি Philosophy লইয়া ব্যস্ত। 'Fitnen' ও Perfectionist theory কে এক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছি, আবার এদিকে চাকর-আসিয়া বাবু স্নান করুন বেলা হইয়াছে বলিয়া বিরক্ত করিতেছে। একবার তাহাকে তাড়াইতেছি, আবার পুস্তকের বিষয় ভাবিতেছি, পড়াটায় ত মন লাগিতেছে না কারণ ভাল করিয়া বুঝিতেছি না। একবার চক্ষু মুদিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করি, আবার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঢুলিতে থাকি।

হঠাৎ কে যেন আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। কান পাতিলাম, পুনরায় দরজায় শব্দ করিয়া বলিল বাবু চিঠি। পুস্তক বন্ধ করিলাম, রামলালকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলাম। রামলাল দরজা খুলিয়া একখানা খাম আনিয়া হাতে দিল, চিঠিখানা আমারই, পত্রখানা খুলিবার পূর্ব্বেই ভাবিতে লাগিলাম কে লিখিয়াছে, হাতের লেখা দেখিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিলাম সিল দেখিয়া ও

তাহাই বুঝিলাম। অনেক দিন পরে সুরেশের পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। এখন ভাবিতে লাগিলাম এতদিনপরে সুরেশ কি মনে করিয়া পত্র লিখিতেছে, পত্রখানা আবার খামে, কত প্রকার অনুমান করিলাম, অনুমান যেন ফুরায় না—তাইপত্রখানা খুলিতেও পারিতেছি না। আশাতেই লোকের সুখানুভূতি। এক একবার মনে হইতেছে বিশেষ কোন গোপনীয় খবর আছে।

উপরেই লেখা রহিয়াছে 'ঢাকা হইতে এবং My dear Dinesh. আগ্রহাতিশয্যে পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলাম লেখা রহিয়াছে—'অভাগা সুরেশ'। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম! সুরেশ এরূপভাবে কখন পত্র লেখে না, তবে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিপদ উপস্থিত। পত্র পড়িতে লাগিলাম ; পত্রে কথা অল্পবটে কিন্তু তাহার প্রত্যেক শব্দ সুরেশের গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে, প্রথম আমার একটু হাসি আসিয়াছিল কিন্তু যখন তাহার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলাম তখন সহানুভূতির কোমলস্পর্শে অশ্রুঝরিতে লাগিল। আমি সুরেশকে জানি, সে আজকালকার ছেলেদের মত নয়, তাহার আদর্শ অতি উচ্চ। আমি তাহাকে যে শুধু ভালবাসি তাহা নহে তাহাকে মনে মনে ভক্তি করি, অনেক সময় তাহার নিকট অনেক শিক্ষার জিনিষ পাইয়াছি। আজ তাহার পত্র পড়িয়া একবার তাহার সেই কল্পনা রাজ্যের কথা ভাবিলাম তাহার কাতরোক্তির সঙ্গে অশ্রু না মিশাইয়া পারিলাম না—সুরেশ লিখিয়াছে—

"My dear Dinesh, শৈশব হইতে দুই জনে এক সঙ্গে খেলিয়াছি, এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, এক সঙ্গে পড়িয়াছি, এক সঙ্গে মানস প্রতিমা গড়িয়াছি তাই তুমি আমাকে ভাল করিয়া জান সন্দেহ নাই, কল্পনায় যে সোণার রাজ্য গড়িয়া আসিতেছিলাম তাহা কল্পনায়ই মিশিয়া গেল—আজ তাহা স্বপনের মত প্রতীয়মান হইতেছে—বাতাহত ধূলিগৃহের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িল, আমি আমার ব্যক্তিত্বকে হারাইয়াছি এবং কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অপরের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, আগামী ১৭ই বৈশাখ আমার আমিত্ব বিনাশের দিন

নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ সমবেদনা প্রকাশ করিতে আর কাহাকে ডাকিব? তুমি পূর্ব্বাপর সকলই জান, আমার জীবনের ঐ অশুভ মুহূর্ত্তে তুমি কাছে থাকিলে একটু অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব তাই লিখিতেছি পরীক্ষান্তেই চলিয়া আসিও, একবার শেষ চিকিৎসাও করিয়া দেখিতে পার।

আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, কেমন দিয়াছি চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই",

ইতি হতভাগা সুরেশ

সুরেশের পত্র পড়িয়া মনে বড় কষ্ট হইল। ১লা বৈশাখ আমার পরীক্ষা শেষ হইলেই আমি ঢাকা চলিলাম। সুরেশের পিতা যোগেশ বাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তার মাও আমাকে খুব ভালবাসিতেন, আমাকে দেখিয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন, যোগেশ বাবু বলিলেন সুরেশের ত বিয়ে, তুমি আসিয়া বেশ করিয়াছ এখন দেখিয়া শুনিয়া কাজ কর্ম্ম কর; আমি যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এইরূপে উত্তর করিলাম—'সুরেশের বিয়ে? আপনি না বলিয়াছিলেন এখন সুরেশের বিয়ে দিবেন না, এখন হঠাৎ কোথায় ঠিক করিয়াছেন? দেশের মধ্যেই কি? যোগেশবাবু—"কেন, তুমিত জানই দেশের মধ্যে কাজ করা আমার বরাবরই অমত। দেশের কুটুম্ব ভাল হয় না, তাই বিক্রমপুরে প্রাণধনবাবু সবজজের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, বিবাহ ১৭ই বৈশাখ ঢাকাতেই সম্পন্ন হইবে, নবাবপুরে প্রাণধন বাবুর বাড়ী আছে, তিনি বেশ একজন বড়লোক, এবং তাঁহার ব্যবহার বড়ই মধুর, এইরূপ লোকের সহিত কাজ করাই বাঞ্ছনীয়, ভাল এক ঘর কুটুম্ব হইল।"

আপনাকে একাকী থাকিতে হইবে, সমাজে মিশিতে পারিবেন না।

যোগেশ বাবু—"দীনেশ, তুমি বুঝিতেছ না, আমাদের বৈদ্য জাতির সংখ্যা খুব কম, ইহাতে যদি সকলের সহিত সকলে না মিশি আমরা অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িব—সমাজ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে

আমি গোঁড়ামী পছন্দ করিনা এখন মাত্র সংস্কার আবশ্যক, বংশে ছোট হলেই কি তিনি আর বৈদ্য নন। আজ কাল বংশ দেখিলে চলিবেনা। প্রাণধনবাবু বিশেষ শিক্ষিত সামাজিক ভদ্রলোক ইহার সহিত আত্মীয়তা করিতে কোনই আপত্তি থাকা উচিত নয়, আমি সমাজের ভয়ে ভীত নই। সমাজ যাহা করিতে পারে করুক, আমি এই কার্য্য করিবই। আমি কাহারও কোন উপদেশ গ্রহণ করিতে চাই না, যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহা করিয়াছি, কাহারও পরামর্শানুসারে এই কাজে হাত দেই নাই এবং কাহারও পরামর্শানুসারে বিরত হইবনা।"

"এই বিবাহে কি আপনি সুরেশের মত নিয়াছেন? আমি জানিতাম তাহার এখন বিবাহ করার মত নাই, সে নিজে কার্য্যক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবেনা।" যোগেশবাবু উত্তর করিলেন—"বাপু এখনও কি আমি তোমাদের মত নিয়া কাজ করিব, সুরেশ কি আমার অভিভাবক না আমি তার অভিভাবক? কতকগুলি বদছেলের দলে মিশিয়া বলিয়াছিল বটে যে বিবাহ করিবে না কিন্তু আমি একটু ভৎসনা করিলে সে চুপ মারিয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম—আপনি কি মেয়ে দেখিয়াছেন? মেয়েটী কেমন? আপনি যখন টাকা পয়সা নিবেন না জানি তখন মেয়েটী নিশ্চয়ই সুন্দরী ও সদ্‌গুণসম্পন্না হইবে।

যোগেশ বাবু—সে বিষয় আমাকে বলিতে হইবে না, আমি মেয়েটী নিজেই দেখিয়াছি, মেয়ের যদি কোন দোষ থাকে তবে তাহা তাহার রং। মেয়েটী তত ফরসা নয় তাহাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যাইতে পারে অপর এক দোষ ধরিলে সে ক্ষীণাঙ্গী নচেৎ তাহায় আর কোন দোষ নাই। লক্ষ্মী শ্রী আছে, বুদ্ধিমতী, লেখা পড়া জানে। শুনিলাম কাজ কর্ম্মেও চতুরা, বিবাহ হইলেই শরীর ভাল হইবে, তখন আর ক্ষীণাঙ্গী বলা যাইবে না। মোটের উপর মেয়ে সুন্দরী। কপালে ছোট বেলার একটী কাটা দাগ আছে বটে কিন্তু

তারপর দীনেশ, টাকা নেওয়ার কথা বল, তুমি ত জানই কোন দিন আমি টাকা নেওয়ার পক্ষপাতী নই তবে আমি এখন শ্রীমানের পড়ার খরচ চালাইতে পারি না, এবার সে কলিকাতাতে M. A. পড়িবে বলিতেছে কি করিব তাই পড়ার খরচ বাবদ মাত্র ৫০০০৲ টাকা নিলাম। প্রাণধন বাবু নিজেই এই টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন আমার নেওয়ার আপত্তি কি? গরীবকে যদি কেহ সাহায্য করিতে চায় তাহা গরীবের উপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রাণধন বাবু ঐ টাকা দিতে পারেন তাহার উহা দিতে কষ্ট হইবে না। আমিও শ্রীমানের পড়ার বিষয় নিশ্চিন্ত হইতে পারিব অতএব আমার পক্ষে এ টাকা নেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে যিনি না নিয়া পারেন তাহার নেওয়া উচিত নয়। আমি পড়ার খরচ বাবদ কিছু না নিয়া পারিলাম না এবং ইহাতেই আমি যে টুকু Reformation করিলাম সেই টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার ছেলে আমি ছোট সমাজে ছোট বংশে বিবাহ দিলাম এখন অন্যে আমার পদ অনুসরণ করুক।

এই কথা শুনিয়া মনে হাসিও আসিল রাগও হইল, আমি বলিলাম "আর কিছু দিন কষ্ট করিয়া পুত্রকে পড়াইয়া টাকার উপর দিয়া সংস্কারটা চালাইলে ভাল হইত না? সমাজে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত থাকিত। কলিকাতায় Private মাষ্টারী করিয়াও সুরেশ পড়িতে পারিত আপনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার নিজের বিবেকের নিষেধ বাণী সত্ত্বেও সমাজের একটি অমঙ্গল জনক কার্য্য করিলেন। আপনি এরূপ কাজ করিবেন ভাবি নাই। আপনিই একদিন পণ প্রথা রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আজ আপনিই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন—এই কি সমাজের নূতনত্ব, সমাজ কাহাকে বিশ্বাস করিবে।"

আমার এই কথা শুনিয়া যোগেশ বাবু যেন একটু রুষ্ট হইলেন। রাগে কিছু বলিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। সুরেশ ঘর হইতে এই সব কথা শুনিতেছিল সে আড়াল হইতে আমাকে ডাকিল, আমি ঘরে গেলাম। যোগেশবাবুর ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া একটু

ভয় হইল, তাই বলিয়া গেলাম, 'যাহা করিয়াছেন ভালই হইয়াছে, এখন আমাদের কি করিতে হইবে বলুন' ইহাতে যোগেশ বাবু বোধ হয় একটু সন্তুষ্ট হইলেন!

ঘরে যাইবামাত্র অশ্রুসিক্ত নয়নে সুরেশ আমার নিকট তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, সে এখন নিরুপায় হইয়া বসিয়া আছে একবার মনে করিতেছে—পিতার সমক্ষে বলিবে 'আমি এখন বিবাহ করিব না,—আবার ভাবিতেছে ঐ তারিখে স্থানান্তরে গিয়া থাকিবে, কিন্তু আবার দেখিতেছে এই উভয় কার্য্যেই অবাধ্যতার পরিচয় দিতে হইবে ও পিতাকে অপমানী হইতে হইবে, তাই এখন কাঠের পুতুলের ন্যায় বসিয়া আছে—পিতা যেরূপ ভাবে চালাইবেন সেইরূপই চলিতে হইবে।

আমি সুরেশকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু এই বিবাহ যে তাহার জীবনের উন্নতির পথে একটি বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে এ ধারণা তাহার হৃদয় হইতে দুর করিতে পারিলাম না, সে যতই বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে ততই সে ইহার কটু-কঠোর-ফল অদূরে দেখিতে পায়। অগত্যা সে বিমর্ষ বদনে পিতার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুরেশের মার মনেও সেরূপ আনন্দ নাই। ছেলের বিষন্ন বদন দেখিয়া তিনিও বিমর্ষ।

এদিকে আত্মীয় স্বজন আসিয়া বাড়ী ভরিল। অদ্য সেই ১৭ই বৈশাখ। যোগেশ বাবুর আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলাম। বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল. কিন্তু সুরেশের মুখে একবারও হাসি দেখিলাম না।

রজনী প্রভাত হইল। বাড়ীর ভিতর মেয়ে মহলে একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, ব্যাপারটা কি জানিতে গেলাম। শুনিলাম নবীন দম্পতীর বাসর শয্যার পার্শ্বে অলক্ষিতে বাড়ীর মেয়েরা দম্পতীযুগলের কথোপ-কথন শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা কথার পরিবর্ত্তে বরের অনুচ্চ ক্রন্দনশব্দ শুনিতে পাইলেন। একথা মেয়ে মহলে রটিয়া গেল সকলেই

বলিতে লাগিল 'বরের কনে পছন্দ হয় নাই'—কেহ বলিল 'এমন পাশ করা ছেলে তার কপালে কাল মেয়ে, পছন্দ হবেই বা কেন, ছেলের বাপ টাকা দেখিয়া ভুলিয়াছে।'

সুরেশ বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিল। সুরেশের মা বৌ দেখিয়া কাঁদিয়াছিলেন কিন্তু যোগেশবাবুর তিরস্কারের চোটে চুপ করিয়া গেলেন। এই রূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। দেখিলাম সুরেশের মন ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে, পরীক্ষার খবর আসিল সুরেশ ও আমি উভয়ে পাশ হইয়াছি, আমি যোগেশবাবুর নিকট সুরেশকে লইয়া কলিকাতায় যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি মত দিলেন।

আমরা কলিকাতা গিয়া Presidency Collegeএ ভর্ত্তি হইলাম। দুই জনেই ইংরেজীতে M. A পড়িতে লাগিলাম, College Squareএ মেছ করিলাম, নূতন স্থানে আসিয়া সুরেশ কিছুদিন অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আজ কাল তাহাকে Eden garden প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে বিবাহিতজীবনের সুখের কাহিনী বলিতাম, ক্রমে ইহাদ্বারা দেখিলাম যেন তাহার মতি একটু ফিরিয়াছে। বিবাহ করিয়াও লোক বড় হইতে পারে এরূপ ধারণা এখন তাহার হইল, আমি সুরেশের এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

আজ সুরেশের একটু মাথা ধরিয়াছে, সে কলেজে যায় নাই, আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি সুরেশ বিছানায় শুইয়া আছে ও নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে, আমি ব্যগ্র হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে একখানি পত্র হাতে দিল, পড়িয়া দেখিলাম সুরেশের মা লিখিয়াছেন,—

"বাছা সুরেশ, আমি তোমার জন্য পাগলের ন্যায় আছি, আমি যখন তোমার বিষন্ন বদন মনে করি তখনই অস্থির হইয়া পড়ি তুমি ছুটী পাইলে শীঘ্র আমার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইও, শ্রীমতী বধু মাতাকে অনেক বার আনাইতে লোক পাঠাইয়াছি তাঁহারা শ্রীমতীকে এখানে দিতে চান না; আমরা তাহার উপযুক্ত যত্ন করিতে পারিবনা ইহাই তাঁহাদের ধারণা, তুমি উপযুক্ত হইয়া [illegible]

তাঁহারা এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। বড় লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলে পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে। আগমীতে তোমার ও দীনেশের মতামত লিখিও ইতি। তোমার মাতা।

পত্র খানা পড়িয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল, আমি আর সুরেশকে কিছু বলিতে পারিলাম না, সুরেশও সে দিন আর আমার সহিত কোন কথা বলিল না। পরদিন সকালে আর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। খুলিয়া দুই জনেই পড়িলাম। নিম্নে লেখা রহিয়াছে 'সেবিকা দাসী'। দেখিয়াই বুঝিলাম সুরেশের স্ত্রীর চিঠি। পত্রখানি পড়িয়া অবাক হইলাম। হিন্দু ঘরের স্ত্রী স্বামীর নিকট এইরূপ লিখিতে পারে পূর্ব্বে ভাবিতে পারিতাম না। প্রথমে স্ত্রীর স্বামীর পত্র না পাইয়া পত্র লেখা লজ্জাজনক। তাহার পর অসংখ্য ভাষা—এই প্রকার পত্র বিশেষ দোষাবহ। ইহাতে সুরেশকে যথেষ্ট ভৎসনা করা হইয়াছে—শুনিয়া পাঠকগণ লজ্জিত হইবেন, স্ত্রী লিখিয়াছেন "তুমি আমাকে ভুলিয়া কাহার প্রেমে মজিয়াছ জানিতে চাই?" এক স্থলে লিখিয়াছেন—"তোমার মার একা কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হয় তাই বলেই আমাকে কি তোমার বাড়ীর দাসীভাবে গ্রহণ করিয়াছ?" চিঠি পাওয়া অবধি সুরেশ গোপনে গোপনে কাঁদিয়া থাকে। আজও কলেজের সময় হইয়াছে, সুরেশ বলিল আজও আমার মাথা ধরিয়াছে, আমি কলেজে যাব না, দীনেশ, তুমি যাও। আমি কলেজে চলিয়া গেলাম, ৪টার সময় মেছে আসিয়া দেখিলাম সুরেশ নাই। তাহার জুতা জামা সব পড়িয়া আছে, সুরেশ নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহই সুরেশের খবর বলিতে পারিল না।

বড়ই চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। বিছানার প্রতি নজর করিয়া দেখিলাম একখানি কাগজ, সুরেশের হাতের লেখা—পড়িলাম। যাহা অনেক সময় ভাবিয়াছি আজ তাহাই হইয়াছে—সুরেশ নিরুদ্দেশ, সুরেশ লিখিয়া গিয়াছে—

ভাই দীনেশ, আমি চলিলাম, বহু পূর্ব্বেই ভাবিয়াছি সংসারে থাকিয়া জীবনের কোন কাজ করা কঠিন। তবুও অনেক চেষ্টা

করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই দেখিতেছি সাংসারিক বাধাবিঘ্নসমূহ ঘনীভূত হইয়া আমাকে ঘিরিতেছে। তাই আমি তোমাদের এই মায়ালীলাস্থল সংসার ছাড়িয়া চলিলাম। যদি কোন দিন মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত করিতে পারি দেখা করিব। বাবা ও মাকে বুঝাইও—আমার বৃথা অনুসন্ধান করিও না।

বাবাকে লিখিয়া দেও—সুরেশ নিরুদ্দেশ। ইতি—

অভাগা সুরেশ,

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র সেন।

প্রাপ্ত পুস্তক সমালোচনা।

Report of the National Council of Education, Bengal for 1911.—

আমরা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের রিপোর্ট পাঠে পরিতৃপ্ত হইলাম। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ আমাদের পূর্ব্ব লুপ্ত গৌরব কাহিনী উদ্ধার কল্পে কতদুর প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাধাকুমুদ বাবুর Indian Shipping and Maritime Activity যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে তিনি "চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য" (Empire of Chandra Gupta) বিস্তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছেন—তাঁহার এ গ্রন্থ শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়। বিনয়বাবুর শিক্ষাসোপান গ্রন্থাবলী বঙ্গ সাহিত্যের এক অসম্পূর্ণ অধ্যায় আলোকিত করিতেছে সন্দেহ নাই।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ হইতে যে সমস্ত ছাত্র বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই তথায় ভাল ফল দেখাইতেছেন, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। মিশিগান য়ুনিভার্সিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"Mr. Surendra nath Bal has satisfactorily completed all the Studies which he elected. Quantitative analysis, Germa microscopical Botany, Inorganic Pharmacy and Hygiene. * * * It is not customary in this University to report students in percentage grades, but I will state that the work of Mr. Bal has been highly

satisfactory in all of his branches"—বাঙ্গালী যুবক বিদেশে যাইয়া এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

হারভার্ড য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক লানম্যান লিখিয়াছেন—

It is a great pleasure to me to hear that the four young men, who have come here together, as comrades and friends, Ray, Sen-Gupta, Sarkar and Seth, have been doing so admirably, in the College, and have passed such good examinations. I have excellent accounts, not only of their studies, but also of their general behaviour. * * *

I believe that if a good number of men such as these four, men of good health, of good intelligence, of good character and high moral purpose can be sent to this country, no more effective way can be found to secure for India a release from many of that worst misfortunes which now distress all lovers of that great land."

হারভার্ড য়ুনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাদের প্রত্যেককে ১৫০ শত ডলার বৃত্তি দান করিয়াছেন—ইহা সুখের বিষয়।

হারভার্ড কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ Mr. E. H. Wells ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের নিকট লিখিয়াছেন—

"My dear sir,

It gives me a great pleasure to send you a word of congratulation on the academic record of the following students who have studied at Harvard during the past year, namely J. N. Seth, H. L. Ray, N. N. Sengupta and B. K. Sarkar.

The records of Seth, Ray & Sengupta place them in the 2nd group of scholar, an admirable performance when one considers their age and the natural difficulties of the language and different customs.

Hoping that these young men are only the advance guard of other Hindu Students of similar high quality, I remain,

Sincerely yours,

E. H. Wells,

Acting Dean.

আমরা আশা পথে চাহিয়া আছি। ইঁহারা গৌরবমণ্ডিত উন্নত মস্তকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতজননীর মুখ উজ্জ্বল করুন। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ]　　　মাঘ, ১৩১৯　　　[১০ম সংখ্যা।

গান।

বাহার মিশ্র—একতালা।

আর কত দিন কলুষ মলিন ছায়ায় ভুলিয়া থাকিব।
কবে　জীবনে মরণে আপনার জেনে তোমারে শুধু ডাকিব
নাথ! হৃদয় ভরিয়া ডাকিব॥
কবে বুঝিব যশোধন মান, সকলি মিথ্যা সকলি ভাণ,
উপেখি তব সকল দান, চরণ শুধু চাহিব॥
কবে　ভুলিয়া সকল অসার শিক্ষা, লইব পুণ্য প্রেমের দীক্ষা,
তব শ্রীচরণ রেণু ভিক্ষা, প্রণত শিরে মাগিব॥
কবে উজ্জ্বল তব রাজ আসন হেরিব হৃদয়ে রাজে.
তুমি　নির্ম্মল করে টানিয়া আমারে লইবে তোমার কাজে,
মত্ত মম বাসনা রাশি, তব পদ তলে লুটিবে আসি,
আমি আনন্দ সাগরে ভাসি, গৌরব তব গাহিব॥

শ্রীকামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য

সেকালের চিত্র ।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-কিশোরগঞ্জে ।

কিশোরগঞ্জের অবস্থা যখন এইরূপ তখন মহাত্মাবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রচারক ও প্রচারকার্য্য কাহাকে বলে তাহা কেহ জানিত না। বাবু রামশঙ্কর সেন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন করিয়া আপন বাসায় রাখিলেন এবং স্কুল ঘরে একটা বক্তৃতার আয়োজন করাইয়া দিলেন।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানী আসিয়াছে -- সে এক ঈশ্বর সম্বন্ধে ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবে এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল। মফঃস্বলের একটী ভদ্র লোক মোকদ্দমার কার্য্য উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন "কি ভায়া! তোমাদের তো একজন আসিয়াছে—কি জানি বলে?" আমি বলিলাম "দাদা! একবার সেই বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, মনের অন্ধকার সব ঘুচিয়া যাইবে", তখনই আবার মনে মনে ভয় করিয়া বলিলাম "না আপনাদের মনের অন্ধকার যেরূপ গভীর তাহা কি ঘুচিবে? যাহা হউক তথাপি বক্তৃতা শুনিতে অবশ্য অবশ্য যাইবেন।"

বক্তৃতা হইল; প্রকাণ্ড স্কুল ঘর ভরিয়া লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া ছিল, সকলে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় নীরবে সেই বক্তৃতা শুনিল। তেমন সুমিষ্ট বিশুদ্ধ ভাষা ইতি পূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই; একটা লোক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া কোন কাগজ বা পুঁথি পত্র না দেখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে এমনও আর কোথাও দেখি নাই। আমরা-তো শ্রদ্ধা সহকারে, আশান্বিত হৃদয়ে শুনিতে গিয়াছিলাম আমাদের ভাল লাগিবারই কথা, বিরুদ্ধ মত লইয়া যাহারা গিয়াছিল তাহারাও বক্তার যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রানুমোদিত উক্তি সকল শুনিয়া মনে মনে পরাস্ত না হইয়া পারিল না।

সভা সমিতি ও তাহার নিয়ম প্রণালী তখন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই। রামশঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিজাশঙ্কর সেন, যিনি পরে

ব্যারিষ্টার হইয়া ছিলেন, তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেন। তিনি বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় উপবেশন করিবা মাত্র, হেড মাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "আমি প্রস্তাব করি বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে দূর দেশ হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এরূপে বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।" তখন উক্ত গিরিজা বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন 'আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করি।" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন "আমি প্রস্তাবককে বল্‌ছি গো, আমি ধন্যবাদ পাবার জন্য এখানে বক্তৃতা কর্ত্তে আসি নাই,যাহা সত্য যাহা ধর্ম্ম তাহা লোক সমাজে প্রচার করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য বোধ ক'রে আমি এখানে এসে যা কিছু বলেছি তার জন্য ধন্যবাদ চাইনে।" তখন মাষ্টার মহাশয় ও গিরিজা বাবু মনে করিলেন "যা কি গুরুতর অপরাধই বা করিয়া ফেলিয়াছি।" তাঁহারা এসব নিয়ম কিছুই জানেন না এই মর্ম্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন বক্তৃতার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমার সেই ভদ্রলোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি দাদা, কেমন শুনলে?" তিনি উত্তর করিলেন "না ভাই আর কিছু বলবার নাই, বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে।"

কাছারীতে যশোদল নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা রামশঙ্কর বাবুকে বলিলেন যে এমন সুন্দর বক্তৃতা হইল অথচ তাঁহাদিগকে তাহা শুনিতে দেওয়া হইল না কেন? যশোদল ব্যবসায়ী-গুরু, গোস্বামী ও ভট্টাচার্য্য দিগের বাসস্থল। সে গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগ্রহান্বিত হইয়া বিজয় বাবুর বক্তৃতা শুনিতে চান দেখিয়া রামশঙ্কর বাবু আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই দিনই চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সকলকে সংবাদ দিয়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। কাছারী ও স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হইল। সন্ধ্যার পর বক্তৃতা হইল তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, বক্তৃতা সুদীর্ঘ এবং হৃদয় গ্রাহী হইয়া ছিল।

কিশোরগঞ্জ টাউনের মধ্যে কাটাখালি গ্রামে প্রামাণিকদিগের বাস। তাহাদের বাড়ীতে একুশ রত্ন প্রভৃতি মঠমন্দির দেখিবার জিনিস ছিল এবং সেই প্রামাণিকদিগের বিবরণ ইতিহাসের বিষয় ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই প্রামাণিকদিগের বাড়ীখানা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। রামশঙ্কর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারকনাথসেন, স্কুলের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এক বাসায়ই থাকিতেন, তিনি বিজয় বাবুর সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে প্রামাণিকের বাড়ী দেখাইতে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পরিধানে একখানা সামান্য থানের ধুতি হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়াছে, গা'য় একখানা সামান্য-চাদর আর কিছু নাই। দাড়ি গোঁফ কামান, পায় জুতা নাই। এই সাত্বিক বেশে সাধু পুরুষ হাঁটিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পথ প্রদর্শক তারক বাবু একটী পূরা সাহেব, তিনি কোট প্যাণ্ট পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। রামশঙ্কর বাবু কাছারীতে বসিয়া তাহা দেখিলেন এবং উঁহারা কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ছুটিয়া স্কুল ঘরে গেলেন, যাইয়া হেড-মাষ্টার মহেশ বাবুকে বলিলেন "উঁনি হাঁটিয়া যাইতেছেন—তারক ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে এটা ভাল দেখায় না, তোমরা কেহ হাঁটিয়া তাঁহার সঙ্গে যাও।" গিরিজা শঙ্কর তখন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, পিতার ঐ কথা শুনিয়া "Uncle return, Uncle return" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তারক বাবুকে ফিরাইলেন। তারকবাবু সকল কথা শুনিয়া ঘোড়া রাখিয়া নিজেই হাঁটিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে গেলেন এবং সকল দেখাইলেন।

প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কার্য্য করিয়া কিশোর-গঞ্জ হইতে চলিয়া গেলে সেখানে নূতন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠন বা তাহার সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি এমন কিছুই হইল না কিন্তু হিন্দুসমাজ চঞ্চল এবং স্থানে স্থানে নানা আন্দোলনে আলোড়িত হইতে লাগিল। বিজয় বাবুর বক্তৃতা ও জীবন্ত দীষ্টান্তে ময়মনসিংহ নগরে যে আন্দোলন ও উত্তেজনা উপস্থিত করিয়াছিল সে সকল সংবাদ ক্রমে কিশোরগঞ্জে পঁহুছিল এবং তার পর সাক্ষাৎকারে তাঁহার বক্তৃতায় যাহা শুনা গেল

এবং বিপ্লব ও পরিবর্ত্তণের দিকে যুবকদিগের যেরূপ আকর্ষণ দেখা গেল তাহাতে হিন্দুসমাজকে টলমলায়মান করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শুনিলেন ময়মনসিংহে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতেছে সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাদেরও একটা কিছু করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিশোরগঞ্জ নগরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রশস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গনযুক্ত একটী সুন্দর আখড়া আছে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুগণ মিলিয়া সেই আখড়ায় এক সভা করিলেন। গৌরচন্দ্র পাঠক নামে সেখানকার একজন টোলের পণ্ডিত সেক্রেটারী রামশঙ্করবাবুর নিয়োগক্রমে আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা পড়াইতেন। এই উপলক্ষে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক প্রভৃতি নূতন সভ্যসমাজের সঙ্গে পাঠক মহাশয়ের মেশামেশি হইত। তিনি জামা গায় দিয়া এবং নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে যাইতেন। উল্লিখিত আখড়ার সভাতে উক্ত পাঠক মহাশয়ও গিয়াছিলেন।

জনৈক পণ্ডিত পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌরচন্দ্র, বল তো ব্রহ্মজ্ঞানীরা কি বলে ?" তিনি উত্তর করিলেন "তাহারা বলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই মানুষ ও এক ঈশ্বরের সন্তান সুতরাং সকলেই সমান।"

পণ্ডিত—বল কি গৌরচন্দ্র, তাহারা এত বড় কথাই বলে ?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ, ওরা আরও অনেক বড় বড় কথা বলে।

পণ্ডিত—না, তা কেন হইবে ? ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সেইজন্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আর ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে শূদ্রের উদ্ভব তাই শূদ্র নিকৃষ্ট।

পাঠক—তাহারা বলিবে "আমরা এই যুক্তি মানিনা।"

পণ্ডিত—কি বলিলে গৌরচন্দ্র, তাহারা এই কথাই বলিবে যে "শাস্ত্র মানিনা" ?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ; তাহারা এইরূপই বলিবে।

পণ্ডিত—তখন ধরিয়া দিব এই বেদ খানা।

পাঠক—তোমার বেদ মানি না।

পণ্ডিত—আরে ও গৌরচন্দ্র বলিস্ কি ? তাহারা কি এই কথাই বলিবে যে 'বেদ মানিনা ?'

পাঠক—হাঁ।

পণ্ডিত—বেদ মান না ? তবে মান কি আমার।—এই বলিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন।

এই ভাবে তাঁহাদের আপনাদের মধ্যেই নানারূপ বাদানুবাদ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, কিছুই অবধারিত হইল না। প্রাচীন দিগের মধ্যে অনেকেই, "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা, ঘোরকলি উপস্থিত, আর কিছুই থাকিবে না," ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বায়ু ও দীপ।

বায়ু গর্জ্জি কহে, "দীপ, নিবাই তোমায় ?"
দীপ বলে, "বিন্দু মাত্র খেদ নাহি তায়।
দুঃখ শুধু, গৃহস্থের গৃহ দীনতম,
দগ্ধ করে যবে সখে, লোল জিহ্বা মম,
সে প্রবল দাহনের তুমিই সহায়,
আজি ক্ষীণ দীপ্ত আমি, নিবাও আমায়।"
বায়ু কয়, "জগতের এই ত নিয়ম,
প্রকাশে দীনের কাছে যত পরাক্রম,
গৃহদাহে আমি তব সহায় প্রবল,
নিবাই যখন তুমি গৃহীর সম্বল !"

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

ফ্যান্সী চিন্তা।

আজ ফ্যান্সীর সাহায্যে স্ত্রীপুরুষ-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব; হয়ত বিঁধিবে না, তবু ফ্যান্সীকে ধারাইতে ছাড়িব কেন? অনেক দিনের অব্যবহারে ফ্যান্সী ভোঁতা হইয়া গিয়াছে; তীক্ষ্ণমুখ সরু শরের মত হইয়া তাহা যদি না বিঁধে, অন্ততঃ বৃহৎকায় কুড়ুলের মত ভেদিবে ত, অর্থাৎ চলিত কথায় বলিতে গেলে, ধারে না কাটিলেও ভারে কাটিবে।

জগতে আদৌ স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি কেন এ জিজ্ঞাসা প্রত্যেক ফ্যান্সী চিন্তকের মনে জীবনে একবার না একবার আসিবেই। উত্তরে মনের প্রাকৃতদিকটা কিছুমাত্র ভাবিবার সময় না লইয়া বলিয়া উঠিবে,—স্ত্রীপুরুষ রহস্যের মূল কথা সৃষ্টি রক্ষা। জগতে একাকার হইতেই প্রভেদের সৃষ্টি। স্ত্রী পুরুষেরও একটা একাকারের যুগ গিয়াছে; আদিমকালের Hepmaphrodite সম্প্রদায়ই সেই যুগের প্রতিনিধি। সেগুলি স্ত্রীপুরুষকে এক করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট ছিল। তারপর কোথা হইতে একটা ব্যক্তিত্বের নেশা আসিয়া একাধি স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করিয়া দিল। কি উদ্ভিদ কি জীবজগতে সকলই ভাবিল পৃথক হইয়াই বুঝি সুখ, একটা বিভিন্ন বৃত্তির দেহভার আর কেন বহন করিয়া মরি, জীবন সংগ্রামে এখন লঘু হইয়া আপন মনে যথা-ইচ্ছা এখন বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিব, আমাকে আর এখন পায় কে? কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম! হে জগতের নরনারীগণ, পৃথক অস্তিত্ব লইয়া এখন তোমাদের সুখ কোথায়? এখন যে আবার মিলনের জন্য আকুল হইয়া ফিরিতেছ। এই যে বিশ্বব্যাপী বিরহের হাহাকার উঠিয়াছে তাহার নিবৃত্তি কোথায়? এই তৃষাদীর্ণ চাতকের কণ্ঠে কোনো দিক দিয়াই ত প্রেমবারি বর্ষিত হইতেছে না! লঘু দেহের চঞ্চনৃত্যে কোথায় গিয়া পড়িয়াছ, প্রিয়-মিলনের নান্দীও ত কোথাও বাজিয়া উঠিতেছে না। চির-বিরহের যমুনা ভিতর দিক বহিয়া চলিয়াছে, এ পারে ওপারে বসিয়া ডাক ছাড়িয়া

কাঁদা ছাড়া এখন আর উপায় কি? বিচ্ছেদ পথে কত মৌমাছি এবং মলয়ের আনাগোনা চলিয়াছে, কত মরাল এবং মেঘের দূত বসিয়া গিয়াছে কিন্তু কুলশীল টাকা এবং স্বার্থের বাধা ত কিছুতেই ঘুচিতেছে না। কত সাগরের উপর দিয়া সেতু রচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এই কৃত্রিম কাঠ বিড়ালের বাহু সেতু দিয়া কি আর হৃদয় অন্তঃপুরে পৌঁছা যায়! কোন্ সুদুর অতীতে ব্যক্তিত্ব-প্রেরণা রাবণের বেশ ধরিয়া আসিয়া স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করিয়া গিয়াছে, এখন যত সেতুই বাঁধ আর যত হনুমানের দৌত্যই বসাও, যত সুগ্রীব-বিভীষণের মিতালিই কর, আর আগুনেই পোড়াইয়া লও, হে সংসারকাব্যের রামেরা, তোমাদের কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন যাইবে। * কত পাহাড় কাটিয়া বাষ্পযান, কত আকাশ কাটিয়া ব্যোমযান প্রেমের লিপি বহন করিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু সেই লিপির অর্থ কেউ বুঝে না, বিচ্ছেদও তার জন্য কিছুতেই ঘুচিতেছে না। প্রত্যেক বিচ্ছেদের রেখায় রেখায় বোমা ফাটিতেছে, রক্ত-লেখা ঝলকিয়া উঠিতেছে; সেই বিচ্ছেদ রেখায় প্রভুর শাসন আর ভৃত্যের দাস্য, বাণিজ্যতরীর স্ফীতপাল আর দারিদ্র্যের কঙ্কালসার রিক্ততা; সেইখানেই বিরহিনী যুবতীর রক্তচক্ষু আর যুবক কবির হাওয়ায়-উড়া উদাস দৃষ্টি, সেই সূক্ষ্ম রেখায় বড় বড় লঙ্কা ট্রয়গুলি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। আপনা আপনি বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলে এখন মিলনের জন্য কাঁদিয়া মর। তোমাদের কণ্ঠে এখন চির-বিরহের গান—"চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে।" এই যমুনা তোমাদের "স্বখাদ সলিল।" দেখিও, অন্ততঃ একটি শবের ভেলাকেও না পাইয়াই প্রেমের আবেগে ভাসিয়া পড়িও না। কিন্তু ওপারে গিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইলেই কি হইবে? সেখানেও "দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া!"

বৈজ্ঞানিক রেখাকে আদিমতার দিকে তার চরম স্থানে বাড়াইয়া

* এই হয়েছে আমার উদ্ভাবিত রামায়ণের নূতন রূপক ব্যাখ্যা। চোখে আঙুল দিয়া বলিয়া দিলাম, কি জানি কেহ আবার না ধরিতে পারে। ফ্যান্সী চিন্তক।

৺মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

লইয়া গিয়া আমরা স্ত্রীপুরুষ-রহস্যের দার্শনিক সমাধান পাই। পূর্ণতার নিগুর্ণ পরব্রহ্ম আপনাকে প্রকৃতি পুরুষে বিভক্ত করিয়াদিলেন; তখন হইতেই পুরুষ ভগবান, সর্বৈশ্বর্যময়, অনন্ত লীলার আধার, আর প্রকৃতি নিত্যরসোদ্বেল, তরুলতা ফল ফুল এবং জীব পর্য্যায়ের লীলা-নিকেতন। পরব্রহ্ম আকাশে শিকায় তুলা থাকুন, নিম্নে প্রকৃতি পুরুষের দৈনন্দিন ঘরকন্না লইয়াই আমাদের কারবার। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলন-রসই জীবনের উৎস, সেই মিলন রেখায় গাছ গজাইয়া উঠে, পাখী গান গাহে, আর কত ফ্যান্সী-চিন্তকের রস-কল্পনা উধাও ছুটে। এই পুরুষ আমাদের নিত্যকালের নায়ক আর প্রকৃতি চিরন্তনী নায়িকা। পুরুষ এক; কিন্তু প্রকৃতি বৈচিত্রপন্থার পথিকা, কভু তিনি পশুবশকারিণী মানবের আদি-মাতা জগদ্ধাত্রী, কভু বা শত্রুসংহারিণী শিবরূপী-অনন্তমঙ্গল-বিধৃতা বরাভয়দাত্রী কালী। প্রকৃতি যখন চিরন্তনী মাতা, পুরুষ তখন নিশ্চয়ই চিরন্তন পিতা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো দরকার নাই। পুরুষ যখন বংশীবদন চিকণ কালা আর প্রকৃতি অভিসারিণী ব্রজবধূ শ্রীরাধিকা আমরা সেই কথাই বলিতেছি।

কিন্তু এই নিত্য-প্রেমের রসলীলা লইয়া তোমাদের পেট ভরিবে না। হে ব্যক্তিগত-প্রেমব্যাপারওয়ালারা, তোমাদের জন্যও কিছু কথা বলিয়া রাখিতেছি, শুনিয়া লও। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রস-জীবনগুলিও আমার সর্ব্বদিক-স্পর্শী ফ্যান্সী লেখনীকে এড়াইয়া যাইবে না। সাগর তাহার উপাদান রহস্য লইয়া ক্ষুদ্র বিন্দুতেই ধরা দিয়াছে, প্রমাণ পাইতে চাও, বিন্দু লইয়া পরীক্ষাগারের কারবারে লাগিয়া যাও, দেখিবে সাগরের 'জান' দুটি বিন্দুর মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে; তবে এই একরূপী পুরুষ অম্ল-জান হইতে বহুরূপিণী প্রকৃতি উদজান জানকে পৃথক করার দাম্পত্য অভিশাপ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে সেটি কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি। তার চেয়ে একটা পেয়ারা পাতা কামড়াইয়া ফেল, দেখিবে একই রকম রসগন্ধ বীজ

গাছের পাতা হইতেই আমরা গাছকে জন্মাইয়াছি। আদিম জীবাণু বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়াও প্রত্যেক অংশেই জীবনস্পন্দনময় আদিম জীবাণুই থাকিয়া যায়। অতএব হে ফ্যান্‌সীচিন্তার পাঠক পাঠিকারা, (অর্থাৎ যারা ফ্যান্‌সী চিন্তা না পড়ে তা'রা নয়) তোমরা সকলেই ছোট সংস্করণের পুরুষ এবং প্রকৃতি এই কথা জানিয়া রাখ এবং আজ হইতে তোমাদের স্বভাব-রসস্রোত অক্ষুণ্ণ হইয়া বহিয়া চলুক।

সমষ্টি-আত্মা যেমন বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে জন্মিয়াছে প্রত্যেক ব্যষ্টি-আত্মা (জীবাত্মা ইত্যাদি কথা পুরোণো হইয়া গিয়াছে, ফ্যান্‌সী-চিন্তকের যোগ্য নয়) তেমন কোনো বিশেষ নর এবং নারীতে বিভক্ত হইয়া এই বিপুল সংসারের মধ্যে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, এই কথা না মানিয়া উপায় নাই, কারণ ইহা স্বয়ং প্লেতোর কথা। প্রত্যেক অর্দ্ধ-আত্মার সঙ্গে অপরার্দ্ধের মিলনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং বুক-ভাঙা নিরাশার মধেই করুণ সাহানার মত পার্থিব ব্যাপারের অনন্ত বিরহ-গান বাজিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক নর নারীই তার অপরার্দ্ধের প্রেমপাশেই বদ্ধ, কাজেই দেখা যাইতেছে যে মানব ভাষার 'অভিন্ন-হৃদয়', 'প্রাণ', 'প্রাণপ্রিয়', 'অভেদাত্মা', 'হৃদয়বল্লভ', 'হৃৎপিণ্ডেশ্বর' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী', 'Better-half' প্রভৃতি কথাগুলি সার্থকনামা। আমি ফ্যান্‌সীর প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পৃথিবী জুড়িয়া এই অর্দ্ধ-আত্মার শিকার-খেলা দেখিতেছি। জগতের ইদন-বিদন এবং কোম্পানি বাগানের কুঞ্জে কুঞ্জে এইরূপ কত অর্দ্ধ-আত্মা একা অথবা জোড়া লাগিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই চির-বুভুক্ষু অর্দ্ধ-আত্মাগুলি বাঙ্গালী পেটের মত আকণ্ঠ ভাতে-জলে কোণে কোণে পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অপরার্দ্ধের শিকারে বাহির হইয়াছে এবং যে কোনো একক অর্দ্ধ-আত্মার দেখা পাইলেই তার গা ঘেষিয়া খাঁচে খাঁচে আপনার সঙ্গে জোড় লাগিয়া যাইতেছে কি না পরখ করিয়া লইতেছে। অনেক সময় দূরের দেখাতেই

মাঝে মাঝে ওষ্ঠে ওষ্ঠে ঠেকাঠেকি হইয়াও দুই আত্মার দুই দিকের দুই 'এভেনিউ' ধরিয়া চলিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যদিও কোথাও আপাতদৃষ্টির মিলন হইল, তবুও জোড়ার রেখা-চিহ্ন কিছুতেই মিলাইয়া যায় না, সেই রেখারই ফাঁকে ফাঁকে কৃত্রিমতার চাষ আর পান-হইতে-চুণ-খসার সর্ব্বনাশ, খিটি-মিটি আর ইস্তফার চিঠি। এই মৌলিক অঙ্গুলির দোসর খুঁজিয়া ফিরার ইতিহাসে শতসহস্র কৃত্রিম যোগের মধ্যে দুই একটাও যে রাসায়ণিক সংযোগ পাওয়া যায় না তাহা বলিতেছি না। ফরুহাদ তাহার আদর্শের অথবা অপরার্দ্ধের প্রতিমা মন হইতে গড়িয়া মানবী শিরীতে তাহার সার্থকতা করিয়াছিল। ঔপন্যাসিক গতিয়ের নায়ক ওষ্ঠের চেয়েও অনেক দূরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া "ম্যাডেময়জেল দে মঁপি"তে আসিয়া সেই আদর্শ লাভ করিয়াছিল। আদর্শের কথা না থাক্, বিনয়ের ললিতা-লাভ কিম্বা ডেভিড কপারফিল্ডের এগ্নেস লাভের পথে অপরিচিত অর্দ্ধ-আত্মাকে ছুঁইয়া আসিতে হইয়াছিল; বিনয়ের মাত্র একটি এবং সেটিকে একই হাতের তৈরি বলিয়া নিজের বলিয়াই ভ্রম করা বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ডেভিডের বেলায় অনেকগুলি। ডেভিডে ডিকেন্স ধরা দিলেও মোটের উপর এগুলি 'কল্পকথা', অর্থাৎ গল্পকথা কিম্বা কল্পনার রাজ্যের কথা। কবি শেলির জীবনের বাস্তব ঘটনার কথা মনে করা যাক্। সন্তান-সহ দুর্ভাগিনী হ্যারিয়েটকে ফেলিয়া আসিয়া বোধ হয় কবিটি এই আদর্শের প্রেরণায়ই মেরীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তার পর দাম্পত্য প্রেমের সুপ্রতিষ্ঠার দিনে কবি কারারুদ্ধা এমিলিকে লইয়া যে মানব সম্বন্ধাতীত প্রেম-কথা ফাঁদিয়াছিলেন তাহাতে মেরীটি স্বয়ং লেখিকা না হইয়া যদি খাঁটি স্ত্রী হইত তাহা হইলে নাক ও চোখের জল একত্র করিত, চাই কি, হ্যারিয়েটের মত সেই জলে ডুবিয়াও মরিতে পারিত।

শেলি লিখিয়াছেন,—

"In many mortal forms I rashly sought

এমিলিতে কবি সেই আদর্শকে অর্থাৎ কবির অপরার্দ্ধ আত্মাকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের এই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কাব্যে যাহা এত সহজ জীবনে তাহা তত সহজ নহে। আরো কয়েক বৎসর বাঁচিয়া গেলে যে আরো মেরী-এমিলিতে তিনি আদর্শ খুঁজিয়া ফিরিতেন না তাহা ত জোর করিয়া বলিতে পারিনা।

এই আত্মার অর্দ্ধটিকে খুঁজিয়া ফিরার আকাঙ্ক্ষায় সচরাচর আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি না হউক অন্ততঃ জগদ্ব্যাপারের সৃষ্টিরক্ষার কার্য্যটি হইয়া যায়। অর্থাৎ এই কার্য্যটি অর্দ্ধ-আত্মা দুটির পরস্পরের মিলনের অপেক্ষা রাখে না। আর সৃষ্টিরক্ষা! সেও ত পুরাকালে শরীর ভাগ করিয়া কিম্বা এক শরীরেই হইয়া যাইত! আর তাই বা কেন, জল ও আলোক-উত্তাপেই যে সেই কার্য্য হইত না তাই কি করিয়া বলিব? স্পেন্সরের কবিতায় আলোকের জনন-ক্ষমতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করা চলে না, কারণ সেটি অশ্লীল। উদ্ধৃত করা যায় না, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে স্পেন্সরের চেয়ে আমার কিম্বা অনেক কুঞ্চিত-নাসা নীতিব্যবসায়ীদিগের নীতিজ্ঞান অনেক বেশী, (পাঠকগণ দেখিবেন, এখানে নীতিনিষ্ঠদিগের প্রতি পরোক্ষে একটু কষাঘাত আছে)। খৃষ্ট-রামকিষ্টের জন্ম-বিবরণেও এই আলোকের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। দেশ বিদেশের রূপকথায় অথবা পুরাণ-কথায় ছিদ্রপথাভিসারী আলোক-শরের কারা-সহচরী কুমারীর রাজ-লক্ষণ-যুক্ত সুপুত্র লাভের রহস্যও সেই জায়গায়। আমার বিবেচনায় আদর্শ-শিকার-পথের-কুৎসিৎ অঙ্গ হইতে মানব সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই আলোক-বিজ্ঞান-রহস্য প্রকাশ-কল্পে একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি গঠিত হওয়া উচিত।

প্রকৃতি পুরুষে এবং জীব-মেলায় এই দ্বৈত মহিমার কথা আলোচনা করা গেল। এই দ্বৈত মহিমা সর্ব্বত্র বিরাজিত। শিলনোড়া ছাতি লাঠি আয়না-চিরুণী, সকলেতেই ইনি আছেন। আর হুকা-কল্কি কিম্বা দোয়াত-কলমে ত কথাই নাই; তাদের রসলীলার ধুয়ার সাগরে কত

প্রতাপ-শৈবলিনী সাঁতার কাটে, বিষবৃক্ষের বীজ গজাইয়া উঠে, আর লীলাকালির রেখায় রেখায় কত ফ্যান্সী-চিন্তকের অব্যক্ত ভাবমালা মূর্ত্তি পাইয়া উঠে তাহার গণনা কে করে? দ্বৈত মহিমা এইরূপ কত অজ্ঞাত স্থানে ফুটিয়া উটিয়াছে তাহার নিপুণ চয়নিকা তৈরি করিয়া তুলা অনুপ্রাস-শিকারীর কাজ, ফ্যান্সী-শিকারীর নহে। এই দ্বৈত-রহস্যের অন্যান্য দিকে ভবিষ্যতে ফ্যান্সী চালাইব, আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

চিন্তা-ফ্যানাটিক।

সত্য।

মেঘের কোলে চাতক য'ন করুণ গীতি গায়,
চপলা সে পলক মাঝে ঝলক দিয়ে যায়;
সুদূর হ'তে বাঁশীর সুরে ভেসে আসে গান,
কাহার আভাস জাগে তখন, কেমন করে প্রাণ!
প থর বেয়ে পাহাড় মেয়ে যখন নেমে আসে,
তুফান বাদল কোমর বেঁধে অট্ট হাসি হাসে;
বাতাস যখন আকাশ ছুঁতে উর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
পরাণ তখন আপনি যেন লোটে কাহার পায়!
সুদূর হ'তে নিতুই তুমি কতই ভাবে ডাক,
নীলাম্বরে রং ফলায়ে কতই ছবি আঁক;
সাগর পাশে রক্ত বাসে দাও গো যবে উঁকি—
পরাণ মাঝে তোমায় যেন তখন আমি দেখি।
ধূ ধূ মাঠে বিজন বাটে পরাণ কারে চায়?
আপন মনে বিজন বনে তটিনী কি গায়?
ধরিত্রী সে কাহার ধ্যানে চিত্ত অবসান?
তোমার ওগো তোমার তরে, তুমি তাদের প্রাণ।
কাহার হাসি ফুটে উঠে কুসুম সুষমায়?
কাহার ধারা নেমে আসে স্নিগ্ধ জোছনায়?

সাগর কোলে ঢেউএর তালে জোছ্‌না শুধু নাচে ?
সেই নাচনে সত্যি কিছু আরো যেন আছে।
সত্যটাকে খুঁজে নেওয়া বিশ্বজনের কাজ,
থাকুক পাছে মান অপমান, বিঘ্ন ভয় লাজ।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ।

ধ্রুব চরিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধ্রুব মধুবনে এক পবিত্র জলাশয়ে অবগাহণ করিয়া, তৃণাসনে উপবেশন করতঃ শুদ্ধ সংযত চিত্তে ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ধ্রুবের এই সাধনা বড় সুন্দর, বড় মধুর। ইহাতে 'নোত' 'নেতি'র পাপ গন্ধও নাই; সংশয়ের লেশমাত্র নাই। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে বড় সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। শুদ্ধ, সরল বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, তিনি কেবল ডাকিতে ছিলেন, "হে ঠাকুর দেখা দেও।" সংসারে সুখের মুখ কখনও দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে কোনও সংসারের ছাপ লাগে নাই। তাঁহার চিত্ত নির্ব্বিকার, হৃদয়ে অতুল অধ্যবসায়। সুতরাং একাগ্রতা লাভের জন্য তাঁহাকে আর বেগ পাইতে হইল না। তিনি জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র কামনার বস্তুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের হৃদয়ে নূতনতর ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যেখানে কেবল এক পুরুষকারের প্রবাহই গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় প্রবাহমান ছিল, সেখানে ভক্তির পূত প্রবাহ সরস্বতী-প্রবাহের ন্যায় আসিয়া মিলিত হইল। ধীরে,ধীরে এক অতুল জ্যোতি ধ্রুবের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া উঠিল; ইহার নাম আধ্যাত্মিকতা আনন্দ সাগরে আনন্দের ঢেউ খেলিতেছিল। ধ্রুব তাহারই তীরে বসিয়া বাঞ্ছিতকে পূজিতে ছিলেন। "প্রবল ইচ্ছা জগতের আর সমস্ত ছাড়িয়া কেবল এক

বাঞ্ছিতকে আকর্ষণ করায় প্রতি মুহূর্ত্তে ধীরে, ধীরে, তিনি নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন।”

ভবসাগরে তরী ভাসাইয়া দিয়া ধ্রুব আকুল ক্রন্দনে বিজন বিপিন মুখরিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার কাষ্ঠের তরী সোণা করিয়া দিল, এবং তাঁহাকে কোলে করিয়া নৌকার হাল ধরিয়া বসিল। কে এ? যাঁহার ধ্যানে ধ্রুবের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গিয়াছে, এ তিনিই ;—কিন্তু ধ্রুব নয়ন মেলিলেন না। তিনি ধ্যান-মগ্ন চিত্তে, হৃদয়ের অতি নিভৃততম প্রদেশে প্রিয়তমকে লইয়া বিহার করিতেছিলেন, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রকাশিত আরাধিত ঈপ্সিত ধনকে চাহিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু যখন সেই কায়ারূপী বিভু ধ্রুবের মানসস্থিত ছায়াকে টানিয়া লইলেন, অমনি পতিহীনা নারীর ন্যায়, বৎস হীনা গাভীর ন্যায় ধ্রুব কাঁদিয়া উঠিলেন। তরুচ্যুত লতিকার ন্যায়, কাণ্ডারীহীন তরীর ন্যায়, ধ্রুব কাঁপিয়া উঠিলেন। নিষ্পীড়িত অলক্তের ন্যায় ধ্রুবের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। যেই উন্মুক্ত নয়নে চাহিলেন অমনি দেখিতে পাইলেন “প্রভু গদাশঙ্খাসিচক্রধৃক্।” ধ্রুব কিছু বুঝিতে পারিলেন না ; আবার চক্ষু মুদিলেন, দেখিলেন সব অন্ধকার! চাহিলেন সব আলো! একি এ! সত্যই কি তবে আসিলে? আমার বাঞ্ছিত, দয়িত আমার সর্ব্বস্ব তুমিই কি ঠাকুর? বালকের রোদন শুনেছ ঠাকুর?”—তখন প্রেমাবেগে ধ্রুবের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। ধ্রুবের সকল অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ধ্রুবের হৃদয় পর্য্যন্ত ভক্তি-বিনম্রচিত্তে সেই প্রণামীয় চরণে লুটাইয়া পড়িতেউদ্যত হইল। ধ্রুবের পবিত্র প্রেমোচ্ছাস লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী অসংখ্যধারে প্রবাহিত হইতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ধ্রুবের একটী মাত্র কণ্ঠ। তাহাও ভাবাবেগে রুদ্ধ। ধ্রুবের তপক্ষীণ দেহে এক মহান্ পুলক স্পন্দন আরম্ভ হইল। ধ্রুবের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে কে যেন পীযুষ ধারা নিষিক্ত করিয়া দিল। ধ্রুবের দুই নয়ন সহস্র নয়ন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ধ্রুব জগৎ ভুলিয়াছিলেন, আজ আপনাকে

প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধ্রুবের কর্ণে শুধু এক মোহন মূর্চ্ছনা বিশ্ব প্লাবিয়া বাজিয়া উঠিল,—"ত্বমব্যয়ং শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা" ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

ধ্রুব আত্মহারা হইয়া গলিত পাদ মোমের পুত্তলীর মত বিশ্বরূপের সর্ব্বাশ্রয় চরণতলে নিপতিত হইলেন; এবং অমনি সেই সৃষ্টিধর জগদারাম বাহু বেষ্টনে ধ্রুবকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ধ্রুবের সাধনা শেষ হইল। প্রতিষ্ঠা আসিয়া সাধনার পীঠে বসিল: তখন দৈবশক্তি যমুনা, আত্মশক্তি (পুরুষকার) গঙ্গা ও ভক্তি অন্তঃসলিলা সরস্বতী প্রবাহ রূপে মিলিত হইয়া ধ্রুবের হৃদয় ক্ষেত্রে এক পবিত্রতর ত্রিবেনী তীর্থের সৃষ্টি করিল। আবার যখন সচ্চিদানন্দময় অনন্তস্বরূপ ধ্রুবকে কোলে টানিয়া লইলেন, তখন এক জগৎপাবন মধুর সাগর সঙ্গম দৃশ্যের সূচনা হইল। ধ্রুবের হৃদয়ে প্রবাহিত ত্রিধারা একধারা হইয়া পুরুষকার রূপে সেই কারণ সাগরে মিশিয়া গেল। পুরুষকারের চরম লক্ষ্য আজ সিদ্ধ হইল। গঙ্গা প্রবাহ সাগর সঙ্গমে চিরতৃপ্তি লাভ করিল। অনন্ত বিষ্ণুর অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ধ্রুব, অনন্ত গগনে উজ্জ্বল সান্ধ্যতার কাটীর ন্যায়, নীলগিরিপৃষ্ঠে উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, বারিধি বক্ষে তাড়িদালোকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান্ সস্নেহে ধ্রুবের দেহে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ধ্রুবকে স্তুতি করিতে বড়ই ব্যগ্র জানিয়া হস্তস্থিত বেদময় সঙ্খদ্বারা তাঁহার কপাল দেশ স্পর্শ করিলেন আর অমনি ধ্রুব সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষের নিকট সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বই সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহাদের জ্ঞান কোন বস্তু বিশেষে আবদ্ধ থাকে না উহা বিশ্বজনীন।

সে যাহাই হউক, যাঁহার উদ্দেশে ধ্রুব শ্বাপদ সঙ্কুল বনে আসিয়া অকুল বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, বহু আরাধনায় তাঁহাকে পাইলেন। ক্ষণেক আত্মবিস্মৃত থাকিয়া ধ্রুব যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সমস্ত বনস্থলী পবিত্রীকৃত ও মুখরিত করিয়া গৈরিক স্রাবের

সে উচ্ছ্বাস কি মধুর! সে স্তোত্র কি হৃদয়স্পর্শী! সে সঙ্গীতে পাষণ্ড হৃদয়ও পুলকিত হইয়া নাচিয়া উঠে। সে ধ্বনিতে দিক্ সমূহের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

ধ্রুবের বালকত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে! ধ্রুবের আহত হৃদয় মঙ্গলহস্ত স্পর্শে সবল হইয়া উঠিয়াছে। এক স্বর্গীয় সৌরভ আসিয়া নিরাশা গন্ধ কলুষিত হৃদয় আমোদিত করিয়াছে। এক দিব্যজ্যোতিঃ আসিয়া ধ্রুবের হৃদয়কুটির উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সেই আলোতে ধ্রুবের এক অনর্থ ঘটাইয়া দিল। সে বিমল জোছনায় ধ্রুবের হৃদয়ের দাগ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল, সেই উপেক্ষার কথা ধ্রুবের মনে পড়িল, অভাগিনী মাতার ছবি ধ্রুবের হৃদয় জুড়িয়া বসিল। তিনি আকুল হইয়া ভাবিলেন এ আদর, এ স্নেহ বুঝি চিরদিনের নয়, আবার বুঝি সেই সর্পিণী বিমাতার ঘৃণাকুঞ্চিত নাসিকার বিষোদ্গারী শ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। আবার বুঝি সেই ঐশ্বর্য্য সম্ভারে পরিপূর্ণ, অতুল সুখ সমৃদ্ধি সমন্বিত পিতৃপুরে, অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া নিতান্ত অভাগার মত কালযাপন করিতে হইবে। এই দারুণ চিন্তা ধ্রুবের সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল; ধ্রুবের জীবনে সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিফলিত হইল না। বিষ্ণু বলিলেন "বর প্রার্থনা কর"—আর ধ্রুবও অমনি সোৎসাহে, বলিয়া উঠিলেন "হে ঠাকুর, মনের ব্যথা তো বুঝেছ? এমন ক'রে দাও যেন আর সে অবজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা না থাকে। সেখানে গেলে কারো কোনো ধার ধারিতে না হয়, কোনো মানবের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে হয় না; যে স্থান শাশ্বত, অবিনশ্বর, সে স্থান আমার পিতৃ পুরুষ কেহ কখনও অধিকার করিতে পারেন নাই, আমাকে সেই ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর।" হায় ধ্রুব! একি করিলে? সকল লোক লোক, সকল সম্পদ সম্পদ, অখণ্ড আনন্দময় বাঞ্ছাকল্পতরুকে প্রাপ্ত হ'য়ে একি করিলে? ভক্তির ডোরে আজ যাহাকে বাঁধিয়া ছিলে, তুচ্ছ জাগতিক প্রতিষ্ঠার আশায় তাঁহাকে ছাড়িয়া কামনাকে আলিঙ্গন করিলে?

কিন্তু এই কামনার সম্পর্কই তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত করিয়াছে। এই সকাম সাধনা দেখিলেই মনে হয় তিনি জীবন্ত, জ্বলন্ত, চিরবর্ত্তমান, এবং আমাদেরই একজন, কারণ তাঁহার ভিতর অতি মানুষিক কিছুই নাই, সকলি সম্ভবপর। তিনি আসিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখনও আছেন ও আবার আসিতে পারেন। যখন সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভক্তগণের পূতচরিত্র আলোচনা করি তখন এই ভক্ত বালকের উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তিও হৃদয়পটে আবির্ভূত হইয়া প্রাণের সাগ্রহ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে। মস্তক আপনা আপনি, সেই পুরুষকারের নিকট নমিত হইয়া পড়ে। রসনা স্বতঃই প্রেমাবেগে তাঁহার স্তুতিগান করিতে থাকে।

ধ্রুব চরিত্রের এত বিস্তৃত নীরস সমালোচনা অনেকের ধৈর্য্য-হানি-কর হইতে পারে, কিন্তু সাধুচরিত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তিচর সহিত আলোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। বিশাল বারিধি বক্ষে যেমন অনন্ত বীচিমালা নাচিয়া বেড়ায়, সেইরূপ মহাত্মাদের চিত্তে অনন্ত-শক্তিও অসংখ্য ভাবরাশি অলক্ষ্যে ক্রীড়া করিতে থাকে। কাহার সাধ্য সম্যক তাহার বর্ণনা করিতে পারে? তবে মানবদৃষ্টি যতদূর ততদূরেরই বর্ণনা সম্ভব। যিনি যেদিক্ লক্ষ্য করেন তিনি সেই দিক্ বর্ণনা করিতেই সমর্থ। সুতরাং এত অবান্তর কথার ভিতরে যদি সুমহৎ ধ্রুব চরিত্রের দিগ্‌ভাগও প্রদর্শিত হইয়া পড়ে, এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছি। ধ্রুব পুরুষকারের একটী সনাতন আদর্শ। আমরা ঠাকুরমার কাছে অদৃষ্টের দোহাই শিখিয়া পরিণত বয়সে সকল বিফলতা তাহারই ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অলস জীবন যাপন করিতেছি। আমাদের আশা আছে উচ্চ, অথচ চেষ্টা নাই, তাই এ পুরুষকারের কথা পাড়িলাম। সকলে চাহিয়া দেখুন এই উদীচিগগনে সপ্তর্ষি মণ্ডল বেষ্টিত হইয়া, ভক্তপ্রধান নিশ্চল; নির্ব্বিকার ভাবে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন,— "আইস মানব সন্তান, এ অমৃত লোক, আরও কত আনন্দ নিকেতন তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র মানব ঐশী শক্তিতে নির্ভর

কর, অগ্রসর হও।" সপ্তর্ষি হীরকহার গলায় পরিয়া ধ্রুব মনি বক্ষে ধারণ করিয়া দিগঙ্গনা আশীষ বর্ষণ করিতেছেন, সে মঙ্গলাশীষে আমাদের সমস্ত জড়তা সমস্ত ক্লৈব্য দুরীভূত হউক্।—শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ বি, এ,।

পাহাড়িয়া প্রিয়া।

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া;
হেথায় গৃহের কুঞ্জে তোমার
কি দিয়ে তুষিব হিয়া?
কোথায় তমাল পিয়াল সর্জ্জ
ছাতনী সেগুন নীপ,
মহুল গাছের ললাটের পরে
কোথা সে চাঁদের টিপ?
শিরীষ ফুলের কেশর শিহরি
পচন হে থানা কুরে;
মহুয়ার বনে মাতাল হইয়া
মৌমাছি নাহি ঘুরে।
বনদেবী হেথা শৈল সোপানে
এলায়না তার বেণী,
কোথা দিগন্তে কাজল বরণ
গিরি পর গিরি শ্রেণী?
পাষাণ বক্ষ চিরিয়া হেথায়
বহে না বিমল বারি,
সিকতা হৃদয় বিদারি হেথায়
ভরে নাক কেহ ঝারি?
কোথায় উদার মুক্ত জীবন
শৈলের পাদ মূলে?

চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি
গিরিনদী কূলে কূলে ?
ওগো পাহাড়িয়া প্রেয়া,
হেথায় গৃহের আঙ্গনে তব
কি দিয়ে তুষিব হিয়া ?
ওগো পাহাড়িয়া বালা,
লয়ে এস করে লতার বলয়
গলে বন ফুল মালা।
প্রকৃতি হেথায় কল্যাণী রূপে
বেঁধেছে কুটীর খানি,
আলিপনা ভরা আঙিনার তলে
এস গিরি বনরাণী।
হেথায় জড়ায়ে শতেক বন্ধ
গৃহ কাজ হেথা শত,
মানবের পূত হিয়া ছায়া তলে
তৃপ্তি লভিবে কত ?
ফুল পল্লব ভূষণ তেয়াগি
গৃহের ভূষণ পর,
টানো শির পরে লাজ গুণ্ঠন,
শঙ্খ বলয় ধর।
লহ সীমন্তে সিঁদুর বিন্দু
বাঁধ কুণ্ডল রাশি,
অচপল হোক্ চরণ যুগল,
সংযত হোক্ হাসি।
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা
মুক্ত স্বাধীন পাখী
হরিণ নয়নে ঘেরিয়া দাঁড়াল
শতেক মানবআঁখি।
ওগো পাহাড়িয়াবধূ
তার মাঝে আনো প্রকৃতি ফুল্ল
অন্তর ফুল মধু।

শ্রীকালীদাস রায়।

দুখীরাম।

গভীর রজনী। কলিকাতার ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কচিৎ দুই একটী ছ্যাঁকরা গাড়ী ট্রাম লাইনের উপর অবাধ রাজত্ব স্থাপন করিয়া অলস মন্থর গতিতে উৎকট ঘড়্ ঘড়্ খর্ খর্ শব্দে সুপ্তোত্থিতের কর্ণ ঝালাপালা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সমস্ত দিবসের কর্ম্মাবসানে আহারান্তে কোনও মেসের ত্রিতলের ছাদে ভৃত্য দুখীরাম—তাহার প্রিয় হুকাটিকে পার্শ্বে রাখিয়া নৈশপ্রকৃতির নিস্তব্ধতা মুখরিত করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল—

দুনিয়া আমার আপন ভাইরে
　　আমি দুনিয়ার পর।
আমি—পরের লাগি কাঁদি হাসি
　　করি পরের ঘর।
দিন বয়ে যায় নানা কাজে,
　　রাত্তির আসে ঝুঁকে,
সারা জগৎ ঘুমিয়ে পড়ে,
　　নিদ নাই মোর চোকে;
ওরে পরের ভাবনা ভাবি আমি
　　পরের অনুচর।

এ সঙ্গীতটী দুখীরামের নিত্যসহচর। তাহার স্বরলহরী ইতস্ততঃ প্রতিধ্বনীত হইয়া পবন হিল্লোলে ধীরে ধীরে শূন্য আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

দুখীরামের দুইটী ছেলে ও একটী শিশু কন্যা ছিল। তাহারা দারুণ প্লেগ রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাদের জননীও সেই শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অল্পকাল মধ্যেই মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করেন।

দুখীরাম কিছুকাল কাঁদিয়া কাটিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কাটাইল।

পাগল করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে একদিন গৃহ বাড়ী বিক্রয় করিয়া হতাশভাবে দেশের বাহির হইয়া পড়িল। বর্ত্তমানে সে কলিকাতার এক মেসে আসিয়া চাকরী আরম্ভ করিয়াছে।

দুখীরামের মনটী বড়ই কোমল। সে মেসের চাকরী করিয়া স্কুল কলেজের ছেলেদিগকে আদরযত্ন ও শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং সেই সূত্রে তাহার অতৃপ্ত ও সংক্ষুব্ধ অপত্য স্নেহ-রাশি ঢালিয়া দিবার অবকাশ পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। যে সকল ছেলেদের সঙ্গে তাহার মৃত পুত্রগণের আকৃতি-গত কিম্বা প্রকৃতিগত কোনও প্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিত দুখীরাম তাহাকে পুত্রবৎ আপন বাৎসল্য দ্বারা তাহার দগ্ধ ও তাপিত বক্ষে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহার নিজ বেতনের টাকা ভাঙ্গিয়া মিঠাই রাবড়ী দই সন্দেশ ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিত। কিন্তু তাহাতেও তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইত না। মেসের বাজার করিয়া যাহা কিছু দস্তরী মিলিত তাহাও সে এই ভাবেই ব্যয় করিয়া আপন অর্থের স্বার্থকতা সম্পাদন করিত। অপর বালকদিগের কাহারো কাহারো ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ ছিল বটে—এবং মাঝে মাঝে তাহাকে বাজারের হিসাব নিকাশ করিবার বেলায় দু'চার আনা গড়মিল করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি কেহ কেহ অসন্তুষ্টও হইত, কিন্তু আহারের সময় যখন দুখীরাম বৃদ্ধাপিসীমার ন্যায় স্নেহের আসন পাতিয়া নিকটে বসিয়া "বাবা এটা খাও, ওটা খাও" বলিয়া আদর করিত;—ঠাকুরকে ধম্‌কাইয়া বাছিয়া বাছিয়া মাছের কোল দেওয়াইয়া তাহাদের আহারে তৃপ্তিসাধন করাইত, তখন তাহারা বৃদ্ধ দুখীরামের সকল দোষ, সকল ত্রুটী বিস্মৃত হইয়া তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং সে সামান্য ভৃত্য হইলেও সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত।

দুখীরামের তাড়ায় কাহারো পাঠের সময় গল্প করিবার কিম্বা নিদ্রা যাইবার সাধ্য ছিল না এবং সান্ধ্য ভ্রমণে সামান্য বিলম্ব

হইলেও তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হইত। তাহার সস্নেহ শাসনের এমনি একটা শক্তি ছিল যে তাহার বাক্য কেহই উপেক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইত না। তাহার ফলে দুখীরামের মেসের কোনও ছেলেই পরীক্ষায় কখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই। তাহারই যত্নাধীনে থাকিয়া অনেকে ডেপুটী মুন্সেফ হইয়াছেন এবং অনেকে হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। দুখীরাম তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া অপরকে উৎসাহিত এবং সাবধান করিত।

দুখীরামের যত্নে প্রবাসে ব্যাধীর পীড়নেও কেহ মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিতে পারিত না। দুখীরাম নিদ্রাহীণ চক্ষে শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া শিরে শরীরে তাহার স্নেহহস্ত সঞ্চালন করিয়া ব্যাধীর যাতনা লাঘব করিয়া দিত।

এইভাবে বহুবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; দুখীরামের ক্রমে বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে যে সকল ছেলে লইয়া মেস গঠিত হইয়াছে তাহাদের সকলে দুখীরামের এই সকল সস্নেহ ভাব পছন্দ করিতে পারিত না। কেহ বলিত—"বেটার বড় বাড়াবাড়ি" কেউবা বলিত—"এসব চুরি করবার ফন্দি।" দুখীরাম ইহাতে মর্ম্মাহত হইত, কিন্তু তবুও নীরবে তাহার অন্তরের স্নেহের উৎসটীকে তাহাদের জন্যই উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিত। ইহাদের মধ্যে নিরঞ্জন নামক একটী বালকের প্রতি দুখীরামের অপত্য স্নেহ অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তজ্জন্য নিরীহ নিরঞ্জনকেও সময়ে সময়ে অপরের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত।

একদিন মেসের তহবিল হইতে দই কিনিয়া আনার জন্য দুখী-রামকে ছয় আনা দেওয়া হইয়াছিল। দুখীরাম তন্মধ্যে মাত্র সাড়ে চারি আনার দই কিনিয়া বাকী ছয় পয়সা দ্বারা রাবড়ি ক্রয় করিয়া নিরঞ্জনের কক্ষে রাখিয়া দিয়াছিল। দই কম দেখিয়া বালকগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল এবং দুখীরামের বাপান্ত সুরু করিয়া দিল। শৈলেশ "ল" কলেজের ছাত্র। সে বলিল "বেটাকে এবার ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। [illegible]

বেটা কি পরিমাণ দই কিনিয়া আনিয়াছে।" শৈলেশ তাহার দলবল-সহ গোয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে দুখীরাম সাড়ে চারি আনার দই এবং ছয় পয়সার রাবড়ি লইয়া গিয়াছে। শৈলেশ চীৎকার করিয়া বলিল—'Theft, Theft' (চুরি, চুরি) বেটাকে এবার পুলিশে দিতে হইবে।" বাড়ীতে আসিয়া নিরঞ্জনের কক্ষে মাটির ভাণ্ডে রাবড়ি দেখিতে পাইয়া সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল এবং "বাঁধ বেটাকে, ধর বেটাকে" বলিয়া লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। নিরঞ্জন বলিল "ভাই তোমরা কেন মিছামিছি গোল করিতেছ, আমি রাবড়ি আনিতে বলিয়াছিলাম বলিয়াই সে তাহা আনিয়াছে ইহাতে যদি তোমাদের কোন আপত্তি থাকে তবে এই ছয় পয়সা বরং আমার নিকট হইতেই নিও।"

শৈলেশ—তাকি কখনও হ'তে পারে? বামাল শুদ্ধ ধরা পড়েছে বাবা, ৩৭৯ ধারায় Summary trial এ একমাস ফাটক হ'য়ে যাবে। নন্ এপীলেবল্ সেন্টেন্স! ব্যাটাকে এবার সোজা হ'তে হবে।" নিরঞ্জণের কোনও অনুরোধই কার্য্যকরী হইল না। শৈলেশ পুলিশ ডাকিয়া দুখীরামকে গ্রেপ্তার করাইল।

পুলিশ এমন একটি তাজা মোকদ্দমা সম্মুখে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দুখীরামের হস্তে লৌহ বলয় আঁটিয়া দিল এবং দই ও রাবড়ির ভাড়ে টিকিট আঁটিয়া হেপাজতে লইয়া গর্ব্বিত পাদক্ষেপে প্রস্থান করিল। দুখীরাম সতৃষ্ণ নয়নে নিরঞ্জণের ম্লান মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে পুলিশ প্রহরীর তাড়নায় তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রুজল সেই উত্তপ্ত বক্ষে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল।

এদিকে নিরঞ্জণ তাহার সপক্ষের কতিপয় বালক সমভিব্যাহারে পুলিশ কোর্টে যাইয়া একটী উকীলকে দুখীরামের পক্ষে নিযুক্ত করিয়া আসিল।

* * *

বিচারের দিন সমাগত হইয়াছে। বিচারক একটি বাঙ্গালী

যুবক। নাম মোহিনীমোহন। তিনি এজলাসে আসিয়া বসিয়াছেন, পেস্কার নাসিকার অগ্রভাগে তাহার বড় বড় দুই চশমা আঁটিয়া, উর্দ্ধে চক্ষু তুলিয়া, কানে মসিরঞ্জিত-মুখ-ব্যাদানকারী চির-পিপাসীত একটি পেন্ কলম গুঁজিয়া, নথীপত্র পেশ্ করিতে লাগিলেন। কোর্ট ইন্স্পেক্টার প্রহরীবেষ্টিত, লৌহ বলয়ালঙ্কৃত আসামীদিগকে কাঠগড়ায় উপস্থিত করিলেন। চাপড়াশী দর্শক মণ্ডলের প্রতি তাহার কুক্ষিগত চক্ষু বিঘুর্ণিত করিয়া বজ্র গম্ভীরনাদে মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—"চুপ, আস্তে।"

দুখীরাম হাকিমের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে, তাহার অন্তরের ভিতরে কি ভাব যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার স্ফীত বক্ষ দুই হাতে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বিচারক দুখীরামের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইয়া উঠায় বৃদ্ধের দুর্ব্বল হৃদয় আর সেই ভাবের আবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না; সে বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ডেপুটীর মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনিও মর্ম্মান্তিক ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু মানসিক ভাব মুখে ব্যক্ত করিলেন না। কোর্টইন্স্পেক্টারকে মোকদ্দমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সকল অবস্থা আমূল বিবৃত করিলেন এবং এই প্রকৃতির লোকদিগকে বিশেষ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ছাত্রসমাজকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। হাকিমের মুখ হইতে কালিমার রেখা অপসৃত হইল। তিনি প্রসন্ন মুখে অপর পক্ষের উক্তি শ্রবণ করিতে চাহিলেন। দুখীরামের পক্ষের উকীল দণ্ডায়মান হইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"হুজুর, এ মোকদ্দমা টিঁকিতেই পারে না। আমার মোয়াক্কেল কোনও অপরাধ করে নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নাই। চৌর্য্য বিষয় হচ্ছে—ছয় আনা দধির মূল্যের মধ্যে ছয়টী মাত্র পয়সা। এই ছয়টী পয়সার মালিক একা বাদী নহে, মেসের সকল ছাত্রের অংশই তাহাতে বর্ত্তমান। নিরঞ্জন নামক যে বালকের কক্ষে ছয়

পয়সা মূল্যের রাবড়ি পাওয়া গিয়াছে তাহার অংশও তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিরঞ্জন দই খাইবে না বলিয়া তাহার জন্য রাবড়ি আনা হইয়াছিল। অতএব যাহাতে নিরঞ্জনের অংশ রহিয়াছে এবং যদ্বারা তাহার জন্যই জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছে তাহাতে চৌর্য্যাপরাধ কিছুতেই স্পর্শিতে পারে না। তবে ছয় আনার মধ্যে নিরঞ্জনের যে অংশ ছিল তদতিরিক্ত দ্রব্য তাহার ভাগে পড়িয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত ছয় পয়সার অংশে মেসের অপর সকলের ভাগ বাদ দিয়া বাদীর যে কয়েক ক্রান্তি দাবী থাকিতে পারে তজ্জন্য তিনি দেওয়ানীতে মোকদ্দমা করিতে পারেন। হুজুর আমার মোয়াক্কেলকে বেকসুর খালাস দিতে আজ্ঞা হয়।"

উকীলের বক্তৃতা শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিল। বাদী ও নিরঞ্জনের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া হাকিম আসামীকে মুক্তি প্রদান করিলেন। দুখীরাম কাঠগড়া হইতে নামিতে না নামিতেই ডেপুটী মোহিনীমোহন বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ দুখীরামকে দুই হাতে নিজবক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—"দুখী, কাকা—তুমি এখনও জীবিত, তোমার এই দুর্দ্দশা! যাহার কল্যাণে, যাহার যত্নে, যাহার সস্নেহ তাড়ণে আজ আমার এই উন্নতী তাহার এই দশা! চল দুখীকাকা, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চল, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ—তোমাকে আর চাকরী করিতে হইবে না। তোমার জীবনের বাকী-দিন-কটি আমার গৃহেই যাপন করিবে।" এই বলিয়া মোহিনীমোহন সেই দিবসের কর্ম্ম সেখানেই শেষ করিয়া বৃদ্ধ দুখীরামকে আপনশকটের ভিতরে, নিজের পার্শ্বে বসাইয়া বাড়ী লইয়া গেলেন।

দুখীরামকে মোহিনীমোহন কিম্বা তাঁহার স্ত্রী কোনও কাজ করিতে দিতে চাহেন না, কিন্তু দুখীরাম কি বসিয়া থাকিবার লোক? সে মোহিনীর স্ত্রীর হাত হইতে কাজকর্ম্ম কাড়িয়া লইত। তাঁহার পুত্র কন্যাকে কোলে কাঁধে করিয়া তাহাদিগকে আদর যত্ন করিয়া মহানন্দে দিনাতিপাত করিত এবং দিবসের কার্য্যাবসানে নিত্য গম্ভীর

নিশীথে তাহার হুঁকাটিকে হাতে করিয়া ছাদে বসিয়া উচ্চ কণ্ঠে গাহিত—

"দুনিয়া আমার আপন ভাইরে
　　আমি দুনিয়ার পর,
পরের লাগি কাঁদি হাসি
　　করি পরের ঘর॥"

বেহুলা।

কে গো তুমি রাঙ্গা মেয়ে আঁখি ছল ছল
　　মৃত পতি কোলে করি,
　　ক্ষীণ আশা বুকে ধরি,
বাহিয়া যেতেছ একা 'গাঙ্গুড়ের' জল
কে গো তুমি রাঙ্গা মেয়ে আঁখি ছল ছল।

নীলাকাশ দুই কূলে চুমিতেছে ধরা
　　চারিদিকে কেহ নাই
　　নদী জল সাঁই সাঁই,
কেবলি উঠিছে ঢেউ ভেলা জলে ভরা,
বহু দূরে দেখা যায় মসি রেখা ধরা।

ফিরে এসো, কোথা যাও পাগলিনী মেয়ে,
　　মৃত কি বাঁচান যায়,
　　সৃষ্টি ছাড়া কথা হায়!
পতি নাই, পতি-শব আছ বুকে লয়ে
একাকিনী কোথা যাও পাগলিনী মেয়ে!

জীবন মরণ পারে অমৃতের দেশ,
　　চির সুখ চির শান্তি,

মরণের দ্বার দিয়া লভিয়া প্রবেশ,
পতি তব গিয়াছেন অমৃতের দেশ।

সে দেশ হইতে কেহ ফিরে নাই আর,
বিষম রহস্যে ঘেরা
অশরীরী রক্ষী বেড়া,
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে নাম শুনে যার,
সে দেশ হইতে পতি ফিরিবে না আর!

পশিল না কোন কথা বেহুলার কাণে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ দুটি আঁখি,
'লখায়ের' মুখে রাখি
চুমিল, কাঁদিল সতী আপনার মনে,
পশে নাই কোন কথা বেহুলার কাণে।

ভাসিয়া চলিল ভেলা গাঙ্গুড়ের টাণে;
চল চল্ ছল ছল্
চারিদিকে ছোটে জল,
মূকদিক চেয়ে আছে ভেলকের পানে
ভাসিয়া চলিল ভেলা গাঙ্গুড়ের টাণে।

যাও তবে, হে তাপসী মৃত পতি লয়ে
যে দেশে মরণ নাই,
মিলনে বিরহ নাই,
মৃত দেহে প্রাণ পায় সঞ্জীবনী পিয়ে,
সেই দেশে যাও সতী মৃত পতি লয়ে।

শ্রীঅবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত পুস্তক সমালোচনা।

জাতীয় মঙ্গল—প্রকাশক নূর লাইব্রেরী, ৫৬, রিপণ ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য ।৵০ ; কাপড়ে বাঁধাই ।৸০ ; শ্রীযুক্ত মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত কবিতা পুস্তক। এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত ছাপা সুন্দর। দেড় বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে এ গ্রন্থ সকলের নিকটই আদর লাভ করিয়াছে।

সবগুলি কবিতাই স্বজাতি প্রেমউদ্দীপক ও স্বসমাজকল্যাণ বিধায়ক। পুস্তকের ভাষায় কিছুমাত্র জটিলতা নাই, কোনখানে কৃত্রিমতার ছায়াপাত নাই, ভাব অতি সরল ও সহজবোধ্য। প্রত্যেক কবিতায় এমন একটি মধুর ঝঙ্কার আছে যা প্রত্যেক পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে। কবি প্রথমেই কেমন সুন্দর ভাবে তাঁহার স্বজাতিবর্গকে আহ্বান করিয়াছেন, কেমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় আকুল কণ্ঠে কহিতেছেন—

"ওই শোন ওই সুর—
ভরেছে বিশ্বপুর।
দেশ মহাদেশ— আকুলি অশেষ,
সহস্র জীবন,— সাগর সুদূর!
আয় ভাই আয় কে আছ কোথায়!
সে সুর নিখিল প্লাবি' চলি' যায়,
আমরা রহিব পড়ে' কি ধরায়,—
এমন মরণাতুর?"

কবি আপন সমাজের কল্যাণকল্পে সকল প্রকার সংস্কারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"শিখরে শিল্প উৎসাহে সবে
যতেক পুরুষ রমণী"
"বিদ্যার অমল আলোক দিয়া,
আলোকিত কর ললনার হিয়া,
যেন হতে পারে অচিরে সবাই
প্রকৃত মানব-জননী।"

স্বজাতি প্রেমোদ্দীপ্ত কবিহৃদয়-নির্ঝর হইতে মাঝে মাঝে যে পবিত্র জল ধারা উদ্দাম বেগে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা অতি নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ—

"ধনী ছিনু, জ্ঞানী ছিনু, পুনঃ উদ্ধারিব
বিলুপ্ত মোদের জ্ঞান, ধন"
বলিয়া ছুটগো যদি এ নব প্রভাতে
করিয়া ভীষ্মের মত পণ,
একেলা ছুটিলে কিছু ফল নাহি হ'বে—
ছুটিতে হইবে কোটি প্রাণ,
নিশ্চয় জানিও তবে জ্ঞান-লক্ষ্মী আসি'
করিবেন শিরে অধিষ্ঠান।"

কবি ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন—

"ধর্ম্ম তোদের জীবন হ'বে,
রক্ত-মাংসে জড়িয়ে র'বে,
ধর্ম্মহীনের মুক্তি-গতি
হয় কি কভু ভাই?"

"আশার সঙ্গে কাজ করে যা,
ফল দিয়ে কাজ নাই"—পাঠ করিতে করিতে

গীতার সেই পবিত্র শ্লোকটি মনে পড়িয়া যায়—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ।"

"দেখ্‌লে অসীম উদার আকাশ
বুকে পাবি বল,"—ভাবটি সুন্দর।

যেরূপ দৃঢ়তার সহিত কবি

'দাও' ব'লে হাত পেতোনা'

লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সত্য সত্যই আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু আমাদের এই নবীন মুসলমান কবি উহা যেরূপ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, সেরূপ ভাবে দেশবাসী উহা গ্রহণ করিতে পারিলে আজ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।

"এ মরণে কে মরিবি আয়,
মরণের দিন ব'য়ে যায়।
এ মরণ সুধাময়, এ মরণে নাহি ভয়,
জীবন জড়ান এই মরণের গায়।
ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিয়ে, অনন্তে মিশিব গিয়ে
কেহ নাহি ত্যজিস্ হেলায়—
এ সুযোগ ;—আয় ত্বরা আয়।"

গ্রন্থের অনেক স্থলেই এরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তবে এই গ্রন্থস্থিত কয়েকটি বিসদৃশ বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গ্রন্থকার নবীন লেখক সুতরাং তাঁহার এ সামান্য দোষ শোধরাইবার আশা আছে। প্রথমতঃ তিনি কতকগুলি শ্রুতিকঠোর চলিত ভাষা স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন—

"ত্যজিয়া নগর, ত্যজিয়া গেরাম,
ত্যজিয়া আএশ, ত্যজিয়া আরাম' ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত 'উজাড়' 'ধাবন কুর্দ্দন' এবং কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য উর্দ্দু ও পার্শি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মুসলমান লেখক মাত্রেই এই দোষে দোষী। বাংলা কবিতা লিখিতে হইলে যাহাতে তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপভোগ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

"আমি নরাধম ঘোর গোনাগার,
কিন্তু দয়াময় গফুর গফ্ফার"—

বলিয়া চীৎকার করিয়া লোকের বিরক্তি ভাজন হইয়া লাভ নাই। অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধন বাঞ্ছনীয় কিন্তু এ প্রকার অনাবশ্যক শব্দ বাহুল্য দ্বারা বঙ্গ ভাষাকে ভারাক্রান্তই করা হয় বস্তুত তাঁহার কোনও উপকার হয় না। ইহা ছাড়া তাকাইয়া স্থলে 'তাকিয়া', স্মৃতি স্থলে 'সিরতি' আমাদের ভাল লাগিল না। গ্রন্থকার নবীন তাই এত কথা বলিলাম। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরও উন্নতি লাভ করিবেন এবং বঙ্গীয় পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।
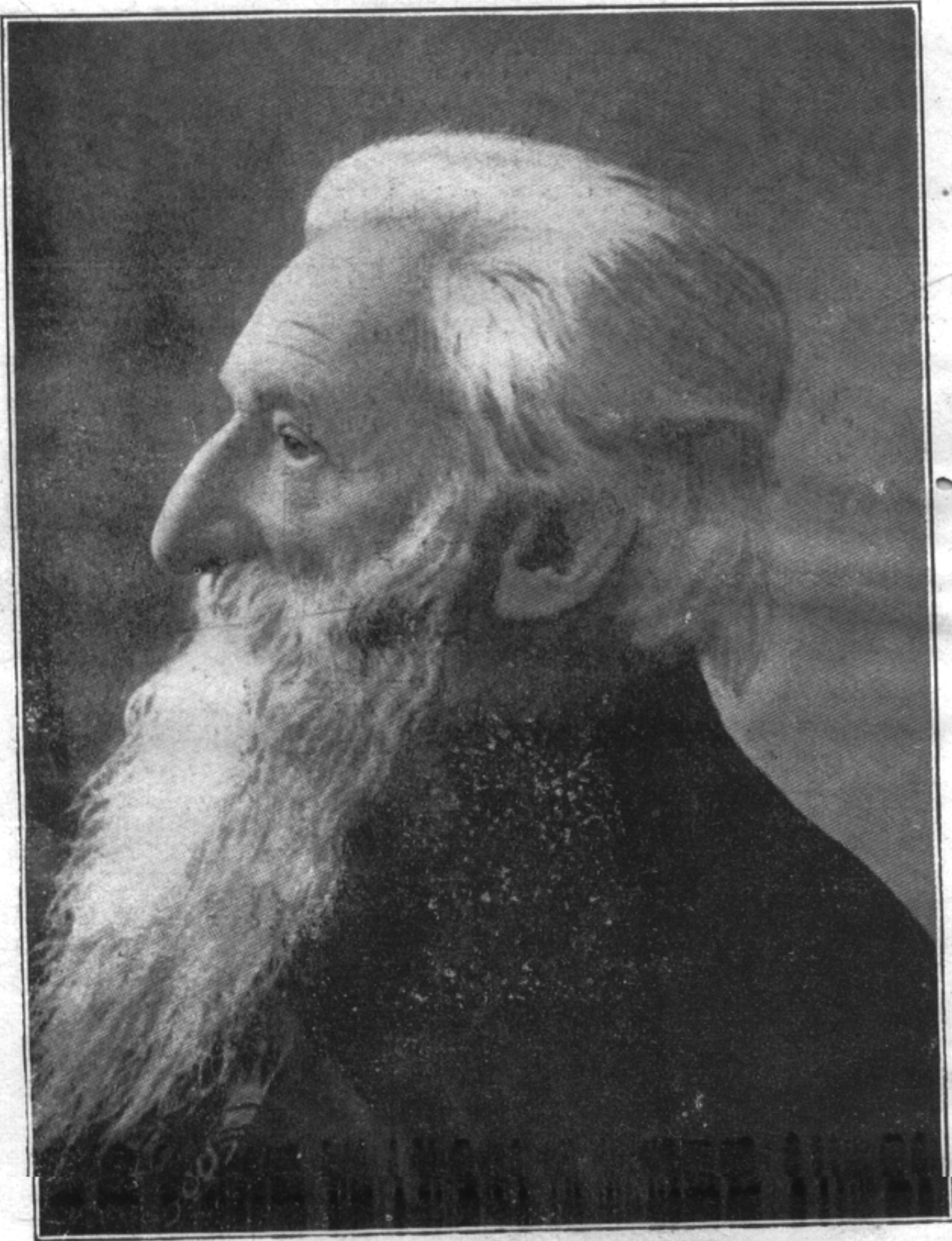
৺মহাত্মা জেনারেল বুথ।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৯ [১১শ সংখ্যা।

নিশারাণী।

১

উষার কিরণে আলো হ'বে দেশ—যখনি,
তখনি আমার ছুটী হ'য়ে যাবে—
আমি তো যাইব চলি'
বিদায়-বেদনে কাঁদিয়া ভিজাব ধরণী
অশ্রু-শিশিরে,—স্মৃতি রেখে যাব—
ফুটা'য়ে কুসুম কলি।

২

সারাটি রজনী আমিই জাগিয়া রচিব,
বরণ কিরণে নূতন করিয়া—
তোদেরি সোনার দেশ!
তোদেরি ঘুমানো মুখ পানে চেয়ে কাঁদিব;
সুপ্ত-শিয়রে শুনাবো আমার
'বেদনা-যে-কি-অশেষ।'

৩

ফুলে ফুলে আর পাতায় পাতায়, আমি যে—
চেতনা-পরশ-মন্ত্র পড়িয়া,
—ঢালিব নূতন প্রাণ;
ঘুম থেকে তোরা উঠিয়া বলিবি—"তুমি কে?
—উষা এসে সব ক'রে দিয়ে গেছে
সুন্দর শোভমান।"

৪

মর্ম্ম ভেদিয়া নিশ্বাস এক ফেলিব গো আমি,
সারাটি যামিনী আঁখি জলে মাখি'—
গতি তার অতি ধীর;
তোরা জেগে বল্—"উষা আসিয়াছে নামি',
তাই তার গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া—
বহিছে মৃদু সমীর!

৫

উষা সুন্দরী, কুৎসিৎ আমি বলিয়া—
আমি যাহা কিছু করিব তোদেরি
রহিয়া অন্তরালে;
ভোর না হইতে মনেরি মতন সাজিয়া,
আমার যা'কিছু বলিবে তাহারি
আসিয়া প্রভাত কালে।

৬

তার পর ধীরে মায়াবিনী ঢাকি' হাসিটী,
শত-নয়নেরে নিরাশ করিয়া—
খুলিবে ছদ্মবেশ;
দুপুর-গগনে বাজিবে তাহার বাঁশিটী!
সে যে কি-কঠোর তপ্ত রুক্ষ,—

আমিই আবার কাঁদিতে কাঁদিতে তখনি,
শত অনাদর নিমেষে ভুলিয়া
কোন্ টানে আসি ছুটি' !
ঘর্ম্ম মুছা'য়ে কোলে তুলে লই যখনি,
অবসাদ যত আঁচলে কুড়া'তে—
কেন বুজে চোখ দুটি ?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা। *

স্ত্রীশিক্ষা মানব সমাজে বৈদ্যুতিক শক্তি। এই শক্তি সমাজের সকল প্রকার আবিলতা ও আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া সমাজকে স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ও সজীব করিয়া তুলে, এবং উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে পরিচালিত করিয়া থাকে। এই বিদ্যুতের প্রবাহে সমাজের নানা প্রকার কুপ্রথা ভাসিয়া যায় ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজও সজীব হইয়া আপনার অস্তিত্বের জন্য সচেষ্ট থাকে।

দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের অবস্থাদি আলোচনা করিলেই স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা যখন এক শ্রেণীর লোককে আর এক শ্রেণীর লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখি তখন স্বতঃই মনে হয় এই আধিপত্য বিস্তারের মূলে কোন একটা সজীব শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আবার অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষন করিলে দেখা যায় শিক্ষাই সমাজকে এই কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ যে কোন দুই শ্রেণীর লোকের অবস্থাদি আলোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে শিক্ষাও এইরূপ আধিপত্য পরিমাপ করিয়া দেখাইবার একটা মাপকাঠি। তবে এই কথাও অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে স্ত্রীশিক্ষা

বাদ দিয়া 'শিক্ষার' পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ফলতঃ নারীজাতির উন্নতির দ্বারা একটা দেশের সম্যক্ উন্নতির পরিমাপ করিয়া লওয়ার প্রয়াস শুধু বিড়ম্বনা মাত্র।

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন ভগবান স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুধু পুরুষ জাতির সেবা শুশ্রূষার জন্য। পুরুষের সেবা ও তাহার সুখ সাধনই নারী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাই তাহার জীবনের চরমোদ্দেশ্য। পুরুষ বিধাতৃপুরুষকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত গন্তব্য পথে চলিতে থাকিবে আর নারী তাহারই চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিবে! তাহার আর কোন কাজ নাই, কর্ম্ম নাই। সে শুধু পুরুষের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিয়া পুরুষের কর্ত্তব্যের বোঝা ভারি করিয়া দিবে। কেন না সে যে অবলা দুর্ব্বলা। তাঁহাদের ভয় হয় পাছে বা স্ত্রী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবার অভিলাষ করিয়া বসে। তাঁহারা বলেন "রমণী গৃহলক্ষ্মী; রন্ধন, সীবন, সন্তান লালন পালনের গণ্ডীর ভিতরে নারীকে চিরদিন বসবাস করিতে হইবে। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আর কিছু আছে এইরূপ ভাবিতে যাওয়া ও নারীর পক্ষে অযৌক্তিক অনাবশ্যক এবং অহিতকর।

আমার মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার পরিপন্থী এই প্রতিবাদের বিপক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পুণ্যভূমি ভারতভূমির প্রাচীনতম ইতিহাসেও স্ত্রীশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বৈদিক যুগেও ললনাগণ যথারীতি সৎ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া স্বামীর ধর্ম্মাচরণে সাহায্য করিবার জন্য সংসারে প্রবেশ করিতেন। এই জন্যই স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বেও লীলাবতী, ভানুমতী, খনা, গার্গী প্রমুখ বিদুষীগণের জ্ঞান গরিমায় ভারত, জগতে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া আপনাকে ধন্য এবং জগৎকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। কে বলিবে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অবহেলাই ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ কিনা?

অতীতের কথা নাই বা বলিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে গেলেও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অস্বীকার করা চলে না।

আজ কাল উপজীবিকা অর্জ্জনের জন্যই পুরুষেরা এতটা ব্যস্ত যে আপন আপন সন্তানের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর তাঁহাদের জুটিয়া উঠে না অতএব রমণীগণ যদি সন্তান লালনপালনের সহিত সন্তানের শিক্ষার ভারও আপনাদের উপর লইতে পারেন তবেই ভবিষ্যবংশের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ শিক্ষায় সন্তানের উপর প্রসূতির যে কত তাহা বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

দেশের প্রতি পরিবারেই স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ত্রী। পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আর একথা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হৃদয়ের প্রসারতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচক্ষণতা চাইই। কিন্তু সুশিক্ষা ভিন্ন এই সকলের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আবার অনেকে মনে করিয়া থাকেন উচ্চ শিক্ষার ফলে রমণীগণ শুধু বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া থাকিতে প্রয়াস পান। সাংসারিক ও পারিবারিক কাজ কর্ম্মে তাঁহারা বড়ই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; আদর্শজননী ও আদর্শস্ত্রী হওয়াই যে তাঁহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য দুঃখের বিষয় আধুনিক উচ্চ শিক্ষার ফলে তাঁহারা সেই লক্ষ্য ভুলিয়া বিপথে পরিচালিত হন; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই অভিযোগের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। যদিই বা রমণীগণ উচ্চ শিক্ষার ফলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন তাহার জন্য দায়ী কে? তাঁহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ সংস্থাপন করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে পুরুষকেই ইহার জন্য জবাব দিতে হইবে। তবে এমন অনেক পরিবারও দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে রমণীগণ উচ্চ শিক্ষাগুণে কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া নিজ নিজ পরিবারকে সুখ ও শান্তির পুণ্য নিকেতন করিয়া তুলিতেছেন।

গত কয়েক বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলদৃষ্টে দেখা যায় স্ত্রী জাতিও কম প্রতিভা লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন না। উপযুক্ত

পুরুষকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। দুঃখের বিষয় আমাদেরই শৈথিল্যে এমন শত শত প্রতিভা অঙ্কুরেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে?

পূর্ণতা প্রাপ্তি অর্থাৎ পূর্ণ মানুষ হওয়াই, মানবাত্মাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া লওয়াই যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয় তবে স্ত্রী জাতিকে পেছনে ঠেলিয়া রাখিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়াস পাওয়া পুরুষের পক্ষে আপন আপন সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক মাত্র। পুরুষ এমন ভাবে কতটুক অগ্রসর হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠাও দুরূহ।

এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্ম ও সাধনা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব এই উদ্যোগে যদি পুরুষকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হয় তবে রমণী কেন ইহা হইতে বঞ্চিত হইবে?

আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি নারী জাতির ও একটা আত্মা আছে। সেই আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদিগকেও কিছু করিতে হইবে। তাঁহারা শুধু একটা রক্ত মাংসের পিণ্ড মাত্র নহে। ভগবান তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত করিয়াছেন। এই গুলির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য পুরুষও দায়ী।

আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বর্ত্তমানে আমাদের উপসংহারে কর্ত্তব্য এই যে—যে সকল সঙ্কীর্ণতা কুলললনাগণের শিক্ষা দীক্ষার পথ কণ্টকসঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে আমরা সেই সমুদায় সঙ্কীর্ণতা হইতে সমাজকে মুক্ত করিয়া লইতে বদ্ধ পরিকর হইব। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অধ্যাত্মতত্ত্বে ও রমণীগণ উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া মনুষ্যনামের স্বার্থকতাসম্পাদনে কৃতকার্য্য হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। স্ত্রীজাতির উন্নতি সামাজিক উন্নতির ভিত্তি এবং এই ভিত্তির দৃঢ়তা সর্ব্বোতভাবে শিক্ষাসাপেক্ষ এই কথা যেন আমাদের হৃদয়ের প্রতি স্তরে গাঁথা থাকে। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

শ্রীঅশ্বিনীশঙ্কর চৌধুরী।

বসন্তে।

প্রকৃতির সুনিয়মে
মধুর ফাল্গুনে আজ
বসন্ত এসেছে ফিরে
পরিয়ে কুসুম সাজ।
কুঞ্জবনে পিকবধু
ধরেছে মধুরতান,
মুকুল চুম্বিয়া অলি
গুঞ্জরিয়া গাহে গান।
আমি শুধু বসে একা
অলস অবস প্রাণ,
না জানি সঙ্গীত কিছু
নাহি মোর ধ্যান জ্ঞান।
সম্মুখে নিদাঘ আসে
ভীষণা মূরতি অতি!
সব কাজ পড়ে আছে
কি হ'বে আমার গতি!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নিষ্কলঙ্ক!

উপর্য্যুপরি বার কয়েক প্রবেশিকার দ্বার হইতে অকারণে প্রত্যাগত শ্রীমান নিমাইচাঁদের নাম অনেক অন্বেষণের পর এবারও যখন গেজেটে পাওয়া গেল না তখন বৃদ্ধ গোবিন্দশঙ্কর বুঝিলেন বিদ্যায় পুত্রের মস্তিষ্ক কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে—তথায় আর অতিরিক্ত স্থান তিলমাত্র নাই! শূন্যাকাশের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"নাঃ, ওটার আর কিছু হবে না।"

প্রশ্ন পুনঃপুনঃ অঙ্গুলিসঞ্চালনে বৃদ্ধের শুভ্রকেশকে আলোড়িত করিয়া তুলিল এবং সেদিন দ্বিপ্রহরে আলবোলার নল হস্তে তাকিয়া হেলান দিয়া গোবিন্দশঙ্কর নিমীলিত-নেত্রে যখন ইহার সহজ সিদ্ধান্তে প্রায় উপনীত হইয়াছিলেন এমন সময় রোরুদ্যমান বিধু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বিন্দুমাত্র ভূমিকার অবতারণা না করিয়া অনুনাসিক সুরে বলিয়া উঠিল—"জেঁঠা মশাঁ'ই--নিমেদাঁ' আমায় মেরেচেঁ অ্যাঁ—হ্যাঁ!"

অতর্কিত ভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রের এরূপ ক্রন্দনযুক্ত নালিশে গোবিন্দ-শঙ্করের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়া হস্তস্থিত নল পড়িয়া গেল, তিনি ত্রস্ত-বদনে উঠিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—কি হয়েছে?"

বালক পূর্ব্বস্বরে পুনরুক্তি করিল—"নিমেদা' আমায় মেরেছেঁ—!" সহসা কাঁচাঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্যই হউক বা নিতাই চাঁদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাবশতঃই হউক, পুত্রের এরূপ আচারে বৃদ্ধের ক্রোধ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি সরোষে বলিলেন—"নিমেটার বড় বাড় বেড়েছে দেখ্‌ছি, ফেল হয়ে একটুও দুঃখ নেই—ডেকে নিয়ে আয় ত তারে! হাঁরে কেন তোকে মেরেচে?"

বিধুভূষণ ডাকিয়া আনিবার আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রেই একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করে নাই, সুতরাং সে দরজার বাহির হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে, কোঁচার খুঁটটা টানিতে টানিতে আরম্ভ করিল—'এই আমি রাস্তায় একটা লাটিম কুড়িয়ে পেয়ে ছিলাম, তা' নিমেদা' বল্লে সেটা তা'র। আমি বল্লাম-'বাঃ তোমার কেমন করে হোল'—তাইতে সে আমার গালে জোরে এক চড় মেরে লাটিমটা কেড়ে নিলে।"

গম্ভীর স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—'আচ্ছা ডেকে নিয়ে আয়।

অনতিকাল পরেই বিজয়ী সৈনিকের মত সগর্ব্বে বিধুভূষণ এবং পশ্চাতে নিতান্ত নিরীহভাবাপন্ন নিমাইচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইল।

গোবিন্দশঙ্কর তখন বিছানায় খাড়া হইয়া বসিয়াছেন। একবার তাম্রকূটের ধূম্র ছাড়িয়া বলিলেন—'নিমে ও লাটিম কার?"

গম্ভীর স্বরে—"আজ ভাত খেয়েছিস্ ?" "হাঁ"

"তবে কথা কইতে পাচ্ছিস্ নে কেন ? ও লাটিম কার—রাস্তায় গেল কি করে ?"

নিমাই কহিল—'আমি ফেলে এয়ে-ছিলাম'—

"তবে সে আর তোর নয়। অন্য কেউ যদি নিয়ে নিত-ত আর পেতিস্ ? বিধু পাঁচ বছরের ছেলে, তার গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়েছিস্। দিয়ে দে' ওকে, ওর লাটিম।"

লাটিম পাইবা মাত্র সজলনেত্র বিধুভূষণের শুভ্র দন্তপংক্তি আত্ম-প্রকাশ করিল এবং বাক্যব্যয় না করিয়া অবিলম্বে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহার আশঙ্কা ছিল আবার বিচার ফল যদি পরিবর্ত্তিত হয়।

ইহার পর পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ কোন কাথাবার্ত্তা হইল না। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মত এই জড় অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য নিমাইএর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছিল এমন সময় নলটা রাখিয়া বলিলেন—"তোর লেখাপড়া কর্ব্বার ইচ্ছে আছে না, না ? যদি তোর দ্বারা আর কিছু না হয় ত' স্পষ্ট বল্, আমি অন্য কোন ব্যবস্থা করি !" নিমাই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দন সে তখন শুনিতে পাইতেছিল। গোবিন্দশঙ্কর অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে কহিলেন—"ভাল করে বোঝ, না হয়ত এখন থেকে বিষয় কর্ম্ম দেখ্তে আরম্ভ কর—সেও ত একটা কাজ। আর যদি লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকে ত, যতদিন ইচ্ছা পড়, আমার আপত্য নাই।"

নিমাই যতদিন একটা নিশ্চিতের ভিতর ছিল ততদিন তাহার যৎকিঞ্চিৎ হইতেছিল—কিন্তু দুইটা অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ফলতঃ তাহার কোনও দিকই বজায় রহিল না। না হইল লেখাপড়া—না হইল বিষয় কর্ম্ম দেখা !

(২)

নিমাইচাঁদের জীবনে একটা বিরাট পরির্ত্তন আসিয়াছিল। যেমন ঝঞ্ঝা বৃষ্টির পর আকাশ নির্ম্মল উজ্জ্বল হইয়া উঠে—নিমাইএর মনে হইত তেমনি তাহার জীবনের যতটুকু বাধা বিপত্তি মেঘ ও ঝড়

সব নিঃশেষে কাটিয়া গিয়া তাহার নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত জীবন সে ফিরিয়া পাইয়াছে ; এবং এই মহা ভ্রমের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া সে দিবসের পর দিবস বৃথাকার্য্যে অলসভাবে কাটাইয়া দিতে লাগিল। তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু শ্লথ বন্ধন ছিল তাহা সহসা নিমেষে খসিয়া পড়াতে, উন্মুক্ত নীলাকাশ তলে সে মুক্ত নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে জীবনের ব্রত করিয়া লইল। সমগ্র দিবস মাছ ধরিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, নিরীহ প্রাণী শিকার করিয়া এবং ইহা ছাড়া যাহা কিছু মনে আসিত তাহাই করিয়া সে কাটাইয়া দিত।

বৃদ্ধ পিতা সকল সময় পুত্রের খবর রাখিতে পারিতেন না—বড় ইচ্ছাও ছিল না।

নদীর বাঁধান ঘাটের উপরেই গোবিন্দশঙ্করের একটা ছোট বাংলোর মত ছিল। বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকাতে এবং সর্ব্ব প্রকারেই সুবিধা জনক বোধ হওয়ায় এক্ষণে তাহা নিমাই চাঁদের আবাসভূমি স্বরূপ হইয়া উঠিল। রাত্রি ব্যতীত প্রায় সকল সময়ই তাহাকে ইহার চতুষ্পার্শ্বে দেখা যাইত। একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহার তিনদিকে খোলা বারান্দা।—ঘরের একধারে একটা জীর্ণদেহ তক্তপোষ, তাহার বিছানায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় ধূমপানেরত নিমাইকে প্রায়ই দেখা যাইত। অপর পার্শ্বে কোণে গোটা দুই বন্দুক, একটা মোটা যষ্ঠি, কিছু মাছের 'চা'র' গোটা কতক ছিপ—ইত্যাদি থাকিত।

পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্ত যাইতে ছিলেন। অস্তগমনোন্মুখ রবির শেষ-কিরণ নদীবক্ষে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। নদীর জল ঝির ঝির করিয়া মৃদুমধুস্বরে বহিয়া যাইতেছে, তাহারই উপর রক্তিম সূর্য্যাভা কাঁপিয়া কাঁপিয়া নৃত্য করিতেছিল। স্বচ্ছ সলিলের ভিতর দিয়া মাছের উপর প্রতিফলিত রবিকিরণ ঝলকিয়া উঠিতেছিল।

ঘাটে বসিয়া অনন্যমনে নিমাই মাছ ধরিতেছিল। তাহার অন্যদিকে

কোন লক্ষ্যই ছিলনা—কানাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুব তারা। বিশেষতঃ প্রকৃতির এরূপ সৌন্দর্য্যের ভিতর সে আনন্দ পাইবার কিছুই খুঁজিয়া পাইত না। তাহার আনন্দ হইত—ছিপে মাছ গাঁথিলে কিম্বা আহতপক্ষীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে। সে যাহা হউক, সহসা যখন কোথা হইতে একখণ্ড ঘনকৃষ্ণ মেঘ আসিয়া অস্তমান্ সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং অনতিবিলম্বেই সোঁ। সোঁ। শব্দে ঝড় আসিতে লাগিল তখন নিমাই যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া একবার সে দিকে তাকাইল। ক্ষিপ্রহস্তে ছিপগুলি গুটাইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নিমাই উঠিতেছে এমন সময় "গেল—গেল!" শব্দে চমকিত হইয়া সে ফিরিয়া দেখিল—একটা ক্ষুদ্র নৌকা প্রাণপণশক্তিতে তীরাভিমুখে আসিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু প্রতিকূল বায়ু তাহাকে একপদও অগ্রসর হইতে দিতেছে না।

ছিপগুলা ফেলিয়া বাংলোর ভিতর হইতে নিমাই যখন ছুটিয়া বাহির হইল তখল নদীবক্ষে নৌকার কোন চিহ্নই নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই উত্তালতরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে সেইস্থান লক্ষ্য করিয়া সাঁতরাইয়া চলিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা তাহার! মনুষ্যের চিহ্ন নাই দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় সম্মুখে একটা সাহায্য প্রার্থী হস্ত দেখিয়া সে তাহা ধরিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে তীরাভিমুখে সাঁতরাইয়া চলিল।

একটা মগ্নব্যক্তিকে তরঙ্গসঙ্কুল নদীগর্ভ হইতে তীরে আনা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং নিমাইএর এবিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতাসত্ত্বেও সে অত্যন্ত হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনাহীন দেহটাকে ধীরে ধীরে রাণার উপর শোয়াইতে গিয়া সে মূহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল—এযে অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী!

পৃথিবীতে কোন কার্য্যেই নিমাই নিজেকে অক্ষম মনে করিত না। সকল প্রকার অসমসাহসিক কর্ম্ম একাকী সম্পাদন করিয়া সে চিরদিন নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সুতরাং একটা সামান্য নারীর

না। যুবতীর অবশদেহ খানি কোন ক্রমে আয়ত্ত করিয়া লইয়া বাংলোর ভিতর সে যখন প্রবেশ করিল—তখন মুসলধারে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইয়াছে।

উদরস্থ জল বমন করাইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। নিমাই মুখের কাছে ঝুঁকিয়া দেখিতেছিল নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা—এমন সময় দুয়ারের নিকট হইতে বিধু ডাকিল—"নিমেদা তুমি বাড়ি যাবেনা ?" অযথা একটু থতমত খাইয়া নিমাই বলিল—"বিষ্টি থেমেছে রে !" দুয়ারের বাহির হইতে সভয়ে উঁকি মারিয়া বিধু বলিল—"হ্যাঁ, ওকে নিমেদা ?" নিমাই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—"বিধু একটা কাজ কর্‌ত ভাই, গোটা দুই তিন বাতি আর একটা দেশলাই, আমায় দিয়ে যাত—বুঝলি !" "আচ্ছা" বলিয়া বিধু দৌড় মারিল।

বাতি ও দেশলাই পাইয়া নিমাই বিধুকে যথাযথ উপদেশ দিয়া গেল, বলিল—"একটু দুধ যেন ভুলিসনে !"

প্রায় দুইঘণ্টা পরে রমা চো'খ মেলিল। শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কোথায়, ভাল আছেন ত ?" সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া নিমাই বলিল—"হাঁ সেজন্য ভয় নেই, এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করত দেখি !"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রমা ঘুমাইয়া পড়িলে, কপাটে শিকল লাগাইয়া নিমাই বাহিরে আসিল। তখন রীতিমত রাত্রি হইয়া গেছে। আকাশের তারাগুলি ঝিকিমিকি করিয়া তাহাদের রূপের গরব করিতেছে, পূর্ব্বদিকে নির্ম্মল শুভ্র কিরণছটা চন্দ্রের উদয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জানাইতেছে এইবার সকল দর্পের অবসান !

কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও আবশ্যকীয় কয়েকটা সামগ্রী লইয়া নিমাই যখন ফিরিল তখন জোছনার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব ভাসিয়া যাইতেছে, অদূরে চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত ক্ষুদ্র বাংলোটি একটি অনুপম চিত্রের মত দেখাইতেছে

উন্মুক্ত বাতায়ন মধ্য দিয়া হাস্যময়ী কৌমুদী তাহার স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণ একটি অনিন্দ্য সুন্দর মুখের উপর নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে। মৃদুমন্দ সমীরণ ধীর পাদবিক্ষেপে আসিয়া সুন্দরীর মেঘকৃষ্ণ অলকরাশি লইয়া তাহার মুখ চখের উপর ক্রীড়া করিতেছে।

চিত্রার্পিতের মত নিমাই ধীরে ধীরে আসিয়া রমার পার্শ্বে বসিল। তাহার মূর্খকঠিন হৃদয় মধ্যে আজ একটা বিপুল বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছিল। সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটা পরিপূর্ণতা সজীবতার যেন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুন্তলরাশি রমার মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া নিমাই নির্নিমেষনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—। একটা অতৃপ্ত বাসনার অসহ্য আকুলতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—সহসা বিদ্যুদ্বেগে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল!

কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই। অদূরে কুলুকুলু রবে বিস্তৃতা নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, চন্দ্রকিরণে তাহার প্রতি উর্ম্মি প্রতি বারিকণা হীরক কণার ন্যায় জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে! পরপারে অস্পষ্ট কাশগুচ্ছ তাহারই মত উদ্বেলিত হৃদয়ে হেলিয়া দুলিয়া নদীর সহিত মধুর আলাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছে! দুই হাতের ভিতর উতপ্ত মাথাটাকে স্থাপিত করিয়া নিমাই চোখ বুঝিয়া বসিয়া রহিল। কেমন করিয়া আবেগভরা এই নবীন প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য মাদকতা নিঃশেষে তাহার মন হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিবে তাহারই চেষ্টা সে করিতেছিল!

একটা স্বপ্ন দেখিয়া, ঘুম ভাঙ্গিয়া, রমা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল— ওগো বাবা কোথায়!" তখন নিমাই আর এক নূতন বিপদে পড়িল। সে অনেক করিয়া রমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে তাহার পিতা তাহারই মত কোথাও আশ্রয় পাইয়াছেন—এবং প্রাতে তাহার সহিত নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে। রমার মন কিন্তু কিছুতেই মানিতেছিলনা—শত শত দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া, সে সহসা বলিয়া ফেলিল—"আর যদি—"অসমাপ্ত বাক্যকে বালিসের উপর মুখ দিয়া চাপিয়া সে আবার কাঁদিয়া উঠিল—।

ছিল—কোথা হইতে অলক্ষিতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে একটু ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল! যথা সম্ভব তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিয়া যেন একটু বিরক্ত হইয়া সে বলিল—"কেন তোমার কি 'বাবা' ছাড়া আর কেউ নেই—তোমার বাবার নাম কি?" চ'ক্ষের জল মুছিতে মুছিতে রমা তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং আনুপূর্ব্বিক তাহার পরিচয় দিল। পিতা ভিন্ন ত্রিসংসারে তাহার ত আর কেহ নাই—কাশীতে তাহারা দুজনে এক ক্ষুদ্র বাসাতে থাকিতেন,—সম্প্রতি পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তণের জন্য কয়েকস্থান ঘুরিয়া তাহারা আবার কাশীতে ফিরিয়া যাইতেছিল—পথিমধ্যে এই বিপদ!

খানিকটা আসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া, নিমাই বলিয়া ফেলিল—তোমার এখনও বিয়ে হয় নি?" রমা অকারণ মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বলিল—'হয়েছিল'। নিমাই তাহার মুখের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল দেখিয়া রমা আবার বলিল—'তখন আমার বয়স তের; তিনমাসের মধ্যেই আমি বিধবা হই—তারপর এই চার বছর বাবার সঙ্গেই আছি—। এই ক'টি কথা বলিতে রমার মনে হইতেছিল মাটির সহিত মিশাইয়া যাই—কিন্তু না বলিলেও যেন কি একটা খোঁচ থাকিয়া যায়!

ইহার পর উভয়েই অনেকক্ষণ নির্বাক রহিল—। একটা বাধ বাধ ভাব উভয়কেই কোথা হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। অতিকষ্টে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিমাই কহিল—"একটু দুধ খাও—বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ!" দুধ না খাইলে অনেক গোল, তাই দুধ খাইয়া রমা চুপ চাপ শুইয়া পড়িল—তাহার মনে হইতেছিল কখন এ রাত্রির অবসান হইবে। কিন্তু কাঠের পুতুলের মত নিমাই বসিয়া রহিল—তাহার নিদ্রাতুর নয়ন পল্লবদ্বয় পুনঃ পুনঃ পরস্পর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইতেছিল—একবার মিলিত হইলে যেন তাহারা আর বিচ্ছিন্ন হইবে না। এমন সময় দূরে একটা ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল।

অপরাধ কার ?

মিছে 'সখি ধরা অপরাধ।

আপনাতে দৃষ্টি নাহি শুধু মোর পানে চাহি

মিছে রোষ করে' সখি ঘটাস্ প্রমাদ।

জানিস্ ত চিরদিন ভৃঙ্গ নহে লোভ হীন,

তপ আচরিতে সে গো ঘুরে নাক বনে,

মধুগন্ধে পুলকিয়া রূপ ভাতি ঝলকিয়া,

কমল ফুটালি কেন উজল আননে ?

পাকাইয়া বিম্ব ফল রসভরা ঢল ঢল

অধরে মধুর কেন করিতে যতন ?

শুকের কি উপবাস ? শুধু কি তৃষার শ্বাস ?

ক্ষুধা যে জীবন কর্ম্ম তাহা কি নূতন ?

পড়িয়া জলের কাছে মীন সে কেমনে বাঁচে ?

সে কথা জানিয়া সখি, কেন কর ছল ?

আঁমি পুট তট ভরা সবজ্বালা ক্লান্তিহরা,

কালো সুগভীর বারি কেন টলমল ?

এটা সখি কার ভুল ? চোঁয়ায়ে মহুয়াফুল,

লাবণ্যে আনিলি কেন মদিরার বান ?

মিছে দুষ অশিষ্টতা, জানে সে কি তত্ত্ব কথা

ক্ষুদ্র মক্ষিকার আর কতটুকু প্রাণ ?

তরুর কি চপলতা ? কেন তোর বাহু লতা ?

সে কেন শাখার মত হলো না কঠোর ?

হাসির জ্যোছনা রাশি বিশ্বময় আসে ভাসি'

কোথায় পলায়ে সখি বাঁচিবে চকোর ?

মাদক মোহন তর কথা যেন বাঁশীস্বর,

মানস কুরঙ্গ গেত অবোধ সরল,

যদি কটাক্ষের শর ঝরে পুনঃ তারপর

কোথায় এড়াবে সেগো আঁখির গরল ?

পায়ে পায়ে যদি ফুটে কেবল গোলাপ ফুটে,
বুলবুল আঁখি মুদে বসিবে কি তপে ?
রূপের অনল যদি জ্বলে শুধু নিরবধি,
পতঙ্গ কেমনে বাঁচে পরাণ না স'পে ?
মানবের গৃহে জাগি এসব কিসের লাগি
মোহন সুষমা এত কিবা প্রয়োজন ?
পদে পদে অপরাধ নিতি ঘর পরমাদ
তবে কেন কুণ্ঠাহীন এত আয়োজন ?

শ্রীকালিদাস রায়।

জেনারেল বুথ।

অনেকের ধারণা যে মস্তকে 'কল্কি' এবং হস্তে তরবারি না লইলে দুষ্কৃতদের বিনাশ হইতে পারে না, কিন্তু পাপীকে প্রাণে বধ না করিয়াও যে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করা যায় ইহা খুব সত্য কথা। তাই বলা হইয়াছে যে পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। পাপীর প্রাণ-নিধন ছাড়া পরিত্রাণের যদি অন্য কোনও উপায় না থাকিত তাহা হইলে কখনও এরূপ কথা বলা হইত না। কিন্তু যিনি ইহা বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন যে মঙ্গলের পথ হত্যার শোনিতে রঞ্জিত নহে, পরন্তু তাহা প্রেম এবং কল্যাণের আলোকে উজ্জ্বল।

কিন্তু সংসারের মন্দ দিকটার প্রতি উদাসীন থাকিলে আমাদের চলিবেনা। অনেক সময় দেখা যায় যে অমঙ্গলকে অনেকেই চক্ষু বুজিয়া অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা ভীরুতা এবং দুর্ব্বলতা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। প্রকৃত বীর যে সে সাহসে ভর করিয়া সমস্ত অন্যায় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাঁহার চোখ বুজিবার বিন্দুমাত্রও অবসর নাই; সংসারে এই খারাপ দিকটা প্রবলভাবে বিরাজমান আছে বলিয়াই পুণ্যের এত প্রশংসা। সংসারে যদি নরক না থাকিত, পাপীতাপীর উষ্ণশ্বাস পৃথিবীর বাতাসকে যদি

বিষাক্ত করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে পুণ্যপারিজাতের সৌরভ বহিয়া মলয়ার গৌরব কিছুমাত্র বাড়িতনা। কিন্তু সংসার বড় অধম, মানুষ বড় দুঃখী, ইহাদের দুঃখ মোচন করাই মানুষের প্রধান ধর্ম্ম। সংসার কুৎসিৎ, কদর্য্য কিন্তু "যে যত কুৎসিৎ তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য।" হীনতা মানুষের একটা প্রকাণ্ড ব্যাধি, "এ ব্যাধি না থাক্‌লে মানুষের অনুকম্পার স্থান রৈত কোথায়?—কার দুঃখ দুরকরে, কাকে টেনে তুলে মানুষ সুখী হোত?"—সমস্ত যুগে এবং সমস্ত দেশে এই সত্যকে মানুষ তাহার কাব্যে, ইতিহাসে, তাহার সমস্ত শিল্পচাতুর্য্যে এবং তাহার ধর্ম্মসাধনায় প্রচার করিয়া আসিতেছে। ইহা শুধু কথার কথা নহে, বাস্তব জীবনে এই সত্যকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করা যায় এবং বিংশশতাব্দীর এই বিলাস-লালসার মধ্যেও যে তাহা সম্ভবপর এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য আজ আমরা একটি মহা পুরুষের কথা বলিব। এই মহা পুরুষের নাম জেনারেল বুথ।

বুথ ১৮২৯ সালে ইংলণ্ডে নটিংহাম সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সেই জন্য অল্পবয়সেই বুথকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি কুসংসর্গে পড়িয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় আপনা হইতেই তাহার সুমতি হয়। এমন সময় আমেরিকা হইতে একজন ধর্ম্মযাজক নটিংহামে আসিলেন; তাঁহার উপদেশ উইলিয়ম বুথের হৃদয় স্পর্শ করিল। বুথ ভাবিলেন তিনিও এইভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। তিনি তখন নটিংহামের দরিদ্র পল্লীতে গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৫। এই কার্য্যে বুথ আরও কয়েকটি ধর্ম্মপ্রাণ সঙ্গীর সাহায্য পাইলেন এবং সকলে মিলিয়া দরিদ্রের বাড়ী গিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিতেন, দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন এবং ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। বুথের পিতা প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য ছিলেন; বুথও বাল্যকালে এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির

মধ্যে তাঁহার প্রাণের সহজ-স্ফূর্ত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল, পনর বৎসর বয়সেই তিনি এই সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া "ওয়েস্‌লিয়ান্ মেথডিষ্ট" নামক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এই অল্পবয়সেই তাহার ধর্ম্মানুরাগ এবং দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির ভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

'মেথডিষ্টদের' প্রচারকরূপে নটিংহামে তিনি পাঁচ বৎসর কাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে যাইতে হয়, সেখানে এক আফিসে তিনি কেরাণীর কাজ পান। আফিসে সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যা সময় তিনি তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। যে সমস্ত দীনদরিদ্র গির্জ্জায় যাইতে সাহস পাইত না, তিনি তাহাদিগকে লইয়া রাস্তার ধারে উপাসনা করিতেন।

ক্রমে তাঁহার উৎসাহ এত বাড়িয়া গেল যে তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি ও সময় ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও আফিসের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি সভা করিয়া বক্তৃতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম্মকথা প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মপ্রচার করা সম্বন্ধে মেথডিষ্টদের সাথে তাঁর মতান্তর উপস্থিত হইল, তাই তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া "মেথডিষ্ট নিউ কনেক্সন" (Methodist New Connexion) নামক মেথডিষ্টদেরই একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া প্রচারকের কাজ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম বুথ "ক্যাথারাইন রমফর্ড" নাম্নী একজন মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমফর্ড বুথের উপযুক্তা "সহধর্ম্মিনী" ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে সকল রকমে সাহায্যকরিতেন। "নিউ কানেক্সন" সম্প্রদায়ের লোকেরা বুথের অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া তাঁহাকে কোনও ধর্ম্ম মন্দিরে স্থায়ী আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। যদিও ইহাতে তাঁহার সকল রকম সুখসচ্ছন্দের সুবিধা হইত তথাপি তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না। পরের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, নিজের সুবিধার দিকে চাহিলে তাঁহার চলিবে

কেন? দেশময় কত শত দুঃখী দরিদ্র অশেষ প্রকারে যাতনা ভোগ করিতেছে, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিবেন, তাঁহার প্রেম এবং সেবা তিনি দেশময় বিস্তৃত করিয়া দিবেন, এক জায়গায় তাঁহার এই পুণ্য প্রবাহকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিল; বুথ এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কর্ম্মত্যাগ করিলে তাঁহাকে একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার অন্নসংস্থানের কোন উপায় থাকিবে না। আর তাহা না করিলে আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। বুথ পত্নীর পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, ক্যাথারিন্ কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বুথকে পদত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন স্বামী স্ত্রী দুইজন ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা চৌমাথায় দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে যাহা দিত তাহাতেই তাহাদের দিন চলিয়া যাইত।

লণ্ডন ছাড়িয়া বুথ কর্ণোয়ালে (Cornnwall) আসিলেন। সেখানে পুরুষদের মধ্যে তিনি এবং রমণীদের মধ্যে তাঁহার পত্নী ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। কর্ণোয়াল হইতে কিছুদিন পর তাঁহারা কার্ডিফে (Cardiff) গেলেন এবং অবশেষে কার্ডিফ হইতে ওয়ালসলে (Walsall) গমন করিলেন। 'ওয়ালসলে' তাঁহারা একটি ধর্ম্মপ্রচারের দল গঠন করিলেন; এই দলের নাম রাখিলেন "হালিলুজা ব্যাণ্ড" (Hallelujah Band) এই দল দরিদ্র ও পতিতা পল্লীতে গিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নাট্যশালা ও মদের দোকানের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ধর্ম্মকথা প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই খুব সুফল ফলিল। চোর, জুয়াচোর, মাতাল প্রভৃতি যাহারা এতদিন সমাজের উপর ভগবানের অভিসম্পাতের মত বিরাজমান ছিল, যাহাদের মনে কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যও সৎচিন্তা স্থান পায় নাই তাহারা দলে দলে এই দলভুক্ত হইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। পতিত এবং পতিতাগণ তাহাদের ঘৃণ্য জীবন যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিল।

এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া বুথদম্পতি ওয়ালসল পরিত্যাগ করিয়া আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তে (East End) তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে দারিদ্র্যই সেখানকার লোকের অধঃপতনের প্রধান কারণ। মানুষ খাইতে পায় না বলিয়াই চুরী করিতে বাধ্য হয়, অনেক রমণী দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেশন সহিত পারেনা বলিয়াই পাপ পথ অবলম্বন করে। সুতরাং ইহাদের নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে আর্থিক দুরবস্থা দূর করা দরকার। তাই যাহাতে ইহাদের আর্থিক অসচ্ছলতা বিদূরিত হয় বুথ সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি "পূর্ব্ব লণ্ডন পুণরুজ্জীবনী সমিতি (East London Revival Society) স্থাপন করিয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। সময় সময় ইহারা পুষ্টিকর খাদ্য পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বুথ এই সমিতিকে সংস্কার কারয়া নূতন আকার দান করিলেন। সমর বিভাগে যেরূপ নিয়ম প্রণালী আছে বুথ তাহার সমিতির নিয়মপ্রণালী সেই আদর্শে প্রণয়ন করিলেন। প্রচার মণ্ডলীকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক বিভাগের উপর এক এক কাজের ভার দিলেন। সমিতির সভ্যগণকে সৈনিকবেশে সুসজ্জিত করিলেন এবং তাহাদিগকে "কাপ্তেন" "মেজর" "কর্ণেল" "প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইল। সমিতির পুরাতন নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নামাকরণ হইল "মুক্তি ফৌজ" (Salvation Army) বুথ নিজে এই ফৌজের সেণাপতি হইয়া জেনারেল (General) উপাধি ধারণ করিলেন। ইংলণ্ডের নানা স্থানে সভ্যগণের বাসের জন্য 'সৈনিকাবাস' (Barrack) প্রস্তুত হইল। এইভাবে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহারা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।—অনেকেই জেনারেল বুথের নাম শুনিয়া মনে করেন যে তিনি বোধ হয় একজন বড় সমরসেনাপতি ছিলেন এবং "মুক্তি ফৌজ" কোনও বিশেষ সৈন্যদলের নাম হইয়া থাকিবে। বুথ এবং তাঁহার সভ্যসম্প্রদায় প্রকৃতপ্রস্তাবে গোলাগুলী লইয়া যুদ্ধ কারতেন না বটে কিন্তু তাঁহাদের অস্ত্র তরবারির চেয়েও

দুর্ব্বার, তাঁহাদের লক্ষ্য বন্দুক গোলকের চেয়েও ধ্রুব এবং তাঁহাদের জয়লাভ মৃত্যুর চেয়েও নিশ্চিত। প্রীতি, দয়া, অনুকম্পা এবং সেবা তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। মানুষের শত্রু তাঁহাদের শত্রু; পাপ মানুষের প্রধান শত্রু সুতরাং পাপের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযান। সমর যদি গৌরবের জিনিষ হয় তাহা হইলে ইহাই মানুষের উপযুক্ত সমর। যে সমরে "মানুষে মানুষ খায়" তাহা মানুষের উপযুক্ত সমর নহে, তাহা পশু সমাজে শোভা পাইতে পারে কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে ইহা অতি মাত্রায় কালিমালিপ্ত করিয়া দেয়। এক সময় ছিল যখন বীর বলিলে কেবল যোদ্ধাকেই বুঝাইত কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। কার্লাইল্ তাঁহার বীর পুজায় যোদ্ধাকে বীরের শ্রেষ্ঠ আসন দেন নাই; বীরের আদর্শকে তিনি উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। একজন জ্ঞানী বলিয়াছেন যে "পৃথিবীতে বুদ্ধই শ্রেষ্ঠতম বীর।" (Budha is the greatest hero in this world) অথচ বুদ্ধ জীবনে কখনও তরবারি স্পর্শ করিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

বুথ কখনও গোলাগুলী লইয়া সমর করেন নাই এবং করাল হত্যাভিনয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করেন নাই সত্য তথাপি তাঁহার মত যোদ্ধা বিরল, তাঁহার মত বীর বর্ত্তমান যুগে খুব অল্পই দেখা যায়।

বুথ তাঁহার "মুক্তি ফৌজের" সাহায্যে লণ্ডনে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া লণ্ডনের পথে পথে ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। পানশালায় কারাগারে ও পতিতাপল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে অধঃপতিত মানব মানবীর নৈতিক উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান কতিতে লাগিলেন এবং রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহাদের সেবাহস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু দেশের লোক বুথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, সংবাদপত্র

তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত সভাও শোভাযাত্রা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অর্থদণ্ড হইল, কাহারও বা কারাদণ্ড হইল। কিন্তু তাঁহারা বিচলিত হইলেন না, তাঁহারা জানিতেন যে ইহা একটী সুলক্ষণ। সকল দেশে এবং সকল যুগে মঙ্গল অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এইরূপ বিরুদ্ধভাব জাগিয়াছে। বিরুদ্ধতাই ভক্তির আদি অবস্থা; ইহারা একই জিনিসের দুইটী চরম দিক। মহাপুরুষকে মানুষ সহজে চিনিতে পারে না; তাঁহারা জগতের উপকার করিতে আসেন বলিয়াই যেন জগত তাঁহাদের উপর রুখিয়া বসে। জগতের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পিথাগোরাস্‌কে মানুষ প্রথমে চিনিতে পারে নাই, সক্রোটিশ্‌কে মানুষ প্রথমে চিনিতে পারে নাই, যীশুকে মানুষ প্রথমে চিনিতে পারে নাই, লুথারকে পারে নাই, কোপার্নিয়াশ্‌কে পারে নাই, গোলিলিওকে পারে নাই, নিউটনকে পারে নাই, সিজারকে পারে নাই। তাই Emerson বলিয়াছেন "To be great is to be misunderstood" কিন্তু জগত তাঁহার মহাপুরুকে চিনিতে পারুক আর নাই পারুক মহাপুরুষের তাহাতে বিশেষ যায়—আসে না। কারণ তাঁহারা জানেন যে "What I must do is all that concerns me, not what the people thinks" কিন্তু সত্যের বিপক্ষে এই বিরুদ্ধভাব বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না। তাই কিছুদিন পর ইংলণ্ডের লোক বুথকে চিনিতে পারিল; তাহারা যখন দেখিল যে এই "মুক্তিফৌজ" দেশের কি অশেষ উপকার করিয়াছে এবং করিতেছে তখন সকলে বিস্মিত হইল।

বুথ দেখিলেন যে এখন তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ইংলণ্ডে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, তাহা সমস্ত জগতে প্রসারিত করিতে হইবে। তদনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে "মুক্তিফৌজের" শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর ভারতবর্ষে এবং লঙ্কায়ও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে সমস্ত জগতে প্রায় ৫৬টী দেশে "মুক্তি ফৌজের" শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই সমস্ত স্থানে সব শুদ্ধ ২১০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। ইঁহারা পতিতা ও অনাথআশ্রম, আতুরালয় হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বুথের "সহ-ধর্ম্মিনী" পরলোকে গমন করেন। "মুক্তি ফৌজের" মহিলা-প্রচার বিভাগে ইনি দশ বৎসর কাল কর্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের পতিতারমণীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ইনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনেকের আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত।

বুথ প্রথম জীবনে যেরূপ অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে আবার তেমনি সমগ্র বিশ্বমানবের ভক্তিঅর্ঘ্য পাইয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ভ্রমণের পর যখন তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান তখন লণ্ডনের এলবার্ট হলে তাঁহাকে এক বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হয়। আমাদের ভারতবর্ষে তিনি দুইবার আসিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমরা তাঁহার বিশেষ কোন খোঁজ রাখিতাম না। পৃথিবীর বড় বড় রাজা, সাহিত্যক, রাজনীতিক ও দার্শনিকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত আদর এবং সম্মান করিতেন। বুথ অতি মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেশনও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা এবং স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যকে কিছুমাত্র মলিন কবিতে পারে নাই।

এই মহাপুরুষ ১৯১২ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া "চিরশান্তিময় যেই স্থান" সেই "মধুর-দেশে" প্রয়ান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে জগতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে।

বুথ একটী বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "In darkest England and the wayout" তাহাতে তিনি ইংলণ্ডের দুঃখীকাঙ্গালের শোচনীয় জীবন যাত্রার একটী উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে ইহারাই দেশের মূলশক্তি, ইহাদিগকে উপেক্ষা করিলে দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বজীবনব্যাপী ইহাদেরই সেবা করিয়া জগতে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ এই বার্ত্তা অনেকদিন পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপবর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র) পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"—তিনি আরেক স্থলে বলিয়াছেন—"The poor, the ignorant, the downtrodden, let these be your God." কিন্তু আমরা তাঁহার এই বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু বুথ তাঁহার জীবনে বিবেকানন্দের এই সত্যবাণীকে সার্থকতা দান করিয়াছেন। আশা করি যে এই স্বদেশী সন্ন্যাসী এবং বিদেশী প্রচারকের অমূল্য শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে আজ স্পর্শ করিবে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

বস্তু ও ভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগতের আদি ও অন্ত চিন্তা করিলে প্রাধান্যটা ভাবেরই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ভাবই ইহার আদি অবস্থা, এবং ভাবেই ইহার শেষ। বিশ্বপিতা আপনার ভাবকে আকারবদ্ধ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন। তিনি চান যে এই বৃহৎ জড়পিণ্ডটা আপন অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে ক্রমে অধ্যাত্মিককতার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার বিরাট ভাব রাশির সহিত আসিয়া আবার মিলিয়া যাউক। এই যে বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে,—

জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখন ও বা ভাবময়, কখন ও মূরতি"

ইহা বিশ্বপিতারই লীলা এবং তাঁহারই সৃজনানন্দের বিচিত্র প্রকাশ মাত্র।

এই যে ভাব হইতে বস্তুতে, বস্তু হইতে ভাবে যাওয়া আসা ইহা আমাদের চোখের সাম্‌নে প্রতিনিয়তই ঘটিয়া আসিতেছে। বর্ষার সলিল রাশি দেখিতে দেখিতে উত্তপ্ত রবিকরস্পর্শে বাষ্পের মাঝে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেয়; আবার একদিন সে বাষ্পপুঞ্জ নিবিড় বর্ষাধারায় ধরার উপর নামিয়া আসিয়া তড়াগ-পল্বব আপন উচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রবাহে ভাসাইয়া তোলে। গাছ পঁচিয়া কয়লা হয়, কয়লা পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া আকাশে উঠে। বাষ্প জমিয়া জল হয়, জল বরফের মাঝে জন্মান্তর যাপন করে। ফল শস্য ও প্রাণীদেহ মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া সৌন্দর্য্য আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে নিয়ত সচেষ্ট।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় অঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

যে দিকেই চাওয়া যায়, কি জড়জগতে কি মানব জগতে এই বস্তু ও ভাবের মধ্যে একটা অবিরাম আনাগোনা চলিয়া আসিতেছে দেখা যাইবে। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, ভাব ও বস্তুর আনাগোনা ছাড়া কিছুই নহে। এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টিকর্ত্তার মানস-নক্সার আকার বদ্ধ অবস্থা, যেন তাহার বিরাট ভাবতারল্যের একটা জগৎ জোড়া Precipitate পড়িয়া রহিয়াছে।

বস্তুই যখন ভাব হইতেছে, এবং ভাবই যখন আবার কোন সময় বস্তুতে পরিণত হইতেছে তখন তাহাদের মধ্যে মূলগত যে একটা ঐক্য রহিয়া গিয়াছে তাহা দেখাই যাইতেছে, প্রভেদ যা'কিছু তাহা শুধু বাহ্য। এক অঙ্গের রূপান্তর মাত্র। দু'য়ের মধ্যে এই ঐক্য টুকু দেখাইতে চেষ্টা করা যা'ক্। এমার্সন এ সম্বন্ধে তাঁহার "Nature" নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ তিনি দেখাইয়াছেন যে মানবভাষার নৈতিক শব্দগুলিও প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভাষার Right শব্দের অর্থ খাঁটি; এই খাঁটিত্ব একটা মানসিক অবস্থা; কিন্তু এই শব্দটা বাস্তব Straight শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তেম্নি Wrong, Twisted হইতে হইয়াছে। একটা রেখার সরলতার সহিত মনের সরলতার, এবং রেখার বক্রতার সহিত বক্রবুদ্ধির যে একটা সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাষা দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা "সরল রেখা"ও বলিয়া থাকি, আবার "সরল মানুষ"ও বলি। এই "সরল মানুষের" সরলের এই অর্থ নহে যে এই লোকটা হাটিতে বসিতে কোন সময়ই বাঁকিয়া যায় না, বরং এই শব্দটা তাহার অন্তর্জগতের উপরেই আলোক পাত করে। তেম্নি অন্তর্জগতের Spirit বাস্তবজগতের Wind হইতে; Transgression, Crossing of a line হইতে; Supercillous, Raising of the eye brow হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি যদি বলি "এই লোকটার মাথা নাই" তখন আপনারা ইহা নিশ্চয়ই বুঝিবেন না যে এ লোকটা একটা কবন্ধ বিশেষ, বরং বুঝিবেন যে তাহার মেধাশক্তিই নাই; তেম্নি "হৃদয় নাই" বলিলে তাহাকে যদি মনুষ্য কোঠার বাহিরে ফেলিয়া দেন তবে তাহার প্রতি অন্যায় করা হয়, বরং বুঝিতে হইবে যে সে নিষ্ঠুর। বস্তু ও ভাব, দুই জগতেই এক শব্দের প্রয়োগ হইতেই উভয়ের সাদৃশ্যটা আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি মানবমনের প্রতিবিম্ব বিশেষ। মনের যে কোন ঘটনার সহিত প্রকৃতি হইতে একটা না একটা জোড়া মিলাইয়া

দেওয়া যায়। ভাষায় উপমা ও রূপক ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। কোন কিছুর পরিচয় দিতে হইলেই তাহা কিসের মত কোন জিনিষের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আছে সে কথাটা না বলিলে পরিচয়টা সম্পূর্ণই হয় না। স্মৃতির অঞ্জন মাখিয়া অতীতের তুচ্ছ কথাগুলিও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে কিরূপ মধুর হইয়া উঠে একথা বলিতে গিয়া সুদূর পশ্চিম দিগন্তের কণকস্বপ্ন বিচ্ছুরিত মেঘ খণ্ডগুলির সান্ধ্য-আলেখ্য স্মরণপথে না আনিয়া পারি না। পৃথিবীর যত ধূলাবালু, ভালমন্দ, যত ক্ষণিক বৈচিত্র, একটি অনির্দ্দিষ্ট স্রোতোবেগে কোন অজ্ঞাত নিরুদ্দেশের দিকে বহিয়া চলিতেছে, কিছুই তাহার স্বস্থানে টিকিয়া থাকিতেছে না, প্রবাহ আঁকড়িয়া দাঁড়াইতেছে না, এই যে অন্ধ আবেগে গম্য স্থানের কোন খোঁজ না রাখিয়াও একটা বহিয়া চলিবার ভাব মনুষ্য আবহমান কাল হইতে আপনার জীবনে অনুভব করিয়া আসিয়াছে ইহাকে স্পষ্টভাবে সে কোন কল্লোলাকুল আবেগ-মূঢ় বহমান নদীস্রোতের কাছে বসিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল, এমন কি তাহার নিজের জীবনেরই এই ভাবটা বোধ হয় তাহার পূর্ব্বে জানাই ছিল না। আমাদের প্রাত্যহিক বৈচিত্র্য-বহুল কর্ম্ম-মুখর ক্ষণিক জীবনের পশ্চাতে যে একটি উদাসীন নিত্যসজাগ পরিবর্ত্তনহীন চিরজীবন বিরাজ করিতেছে তাহা আমরা হয়ত কোন গোধূলির বিরামসূচক নীরব বৈরাগ্যধ্বনির মাঝে বসিয়া, অথবা মধ্যনিশীথিনীর স্তব্ধ তিমিরস্বপ্নে মগ্ন হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞাত পুষ্পের বায়ু-বহা সৌরভ সম্ভারের ন্যায়. দূরাগত অজানা কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত শ্রোতের দুই একটা মন্দীভূত হিল্লোলের ন্যায় অতিক্ষীণ আভাসে মাত্র জানিতে পারিয়াছি কিন্তু এই আবিষ্কারের আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়াই চিরজীবনকে আকাশের সহিত এবং ব্যক্তিজীবনকে পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম যাহা ঝাপ্‌সা ছিল তাহা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে কোন যুগবিশেষের মানবমণ্ডলী যখন বর্ত্তমানের তিমিরচ্ছায়ায় সুপ্তির জড়িমা নিয়া অলীক স্বপ্নবিভ্রমের পশ্চাতে আলেয়া-মুগ্ধ পথভ্রান্ত পথিকের

দর্শী মহাপুরুষ মিথ্যার মায়া কাটাইয়া দিয়া তমোমগ্ন দারুণ বিশ্ব-রজনীর আসন্ন পরিসমাপ্তির পরপ্রান্ত হইতে আগত একটি অতি ক্ষীণ আলোক রশ্মির আভাস পাইয়া বিশ্বের সুপ্তিমগ্ন মানবসমাজের কাছে সে শুভ সংবাদ প্রচার করিয়া দেন, "উঠো, জাগো, প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে; স্বপ্নমোহ ঝড়িয়া ফেলিয়া হাত মুখ ধুইয়া দিবসের কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক"—এই মহাপুরুষের সহিত ভোরের পাখীর সুন্দর সাদৃশ্য, এবং এই তুলনা হইতেই মহাপুরুষের বিশেষত্ব অন্য কোন কথার অপেক্ষা না রাখিয়াই, অন্য শত কথায় যাহা হইবে না তার চেয়ে স্পষ্ট হইয়া আমাদের চক্ষে ফুটিয়া উঠে।) এমনি দেখা যাইবে যে আমরা সাধারণ কথাবার্ত্তায় এবং লিখায়, প্রতিদিনের ভাব বিনিময়ে এই উপমা ও রূপকের সাহায্য না লইয়া পারি না। কথায় কথায় বলিয়া থাকি, "রাম পাথরের মত কঠিন, যদু সাপের মত ক্রূর, অমুকের মন মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল, অমুক মেষশাবকের মত নিরীহ।" তেমনি প্রেমের সহিত তাপের আলোকের সহিত জ্ঞানের, আঁধারের সহিত অজ্ঞানের, কুসুমের সহিত মনের কোমল ভাবগুলির, লজ্জার সহিত সন্ধ্যাকাশের বা গোলাপী আভার, সবল দৃঢ় চিত্ততার সহিত পর্ব্বতের, ভাষায় এমন একটা সুনিবিড় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে যে এখন পরস্পরকে আর বিযুক্ত করা অসম্ভব। এমার্সন বলেন "Whole of nature is a metaphor of the human mind." তিনি দেখাইয়াছেন যে আমাদের জড়বিজ্ঞানের সূত্রগুলি মনোবিজ্ঞানকেও আলোকিত করিয়া দেয়। "Re-action is equal to action", "whole is greater than its part," এইগুলি মনস্তত্ত্বেও প্রযোজ্য, এবং বিশেষ অর্থ হইতে সার্ব্বজনীন সত্যে ব্যবহৃত হইবার সময়ই এই সূত্র গুলির প্রকৃত গভীরতা অনুভূত হয়। তেমনি A rolling stone gathers no moss; A bird in the hand is worth two in the bush; The last ounce break's the camel's; Long-lived trees make roots first প্রভৃতি

ভাষার মধ্যে বস্তু ও ভাবের যে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উভয়ের মাঝে যে একটা প্রভেদ-চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া যায় না তাহা কতকটা দেখান গেল। মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে তাহা বাহ্য প্রকৃতির দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত। রজনীর স্তব্ধ তিমির-ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া তরুণী উষা যখন আপনার পুলক-হাসি তরল সুধা-তরঙ্গের মত বিশ্বে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয় তখন মানব আপনার প্রকৃতির মাঝে একটা নবীনতা, একটা তারল্য, একটা অব্যক্ত রমণীয়তা অনুভব করিয়া থাকে তখন আর নিজকে সীমাবদ্ধ মনে হয় না, দেহের কঠিন গ্রন্থগুলি যেন ক্রমে শিথিল হইয়া আসে, জড়ের বন্ধন চাপ মনের গা' হইতে ক্রমে ঢিলা হইয়া খসিয়া পড়ে, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিটা পথের নীচ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, মন বাষ্পের মত আলোকের অসীমতায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই তরুণ-তরল মনটি দিবসের কর্ম্ম-মুখরতায় অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যায় নিজকে গুটাইয়া লইয়া ধ্যান-গম্ভীর বৈরাগ্যমগ্ন হইয়া যায় দিবসের এই বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া এমার্সন বলিয়াছেন "The dawn is my Assyria; the sunset and moonrise my Paphos, and unimaginable realms of faerie; broad noon shall be my England of the understanding and the senses; the night shall be my Germany of mystic, philosophy and dreams." দিবসের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন মানবের মনকে বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত করে, ষড়ঋতু ও তেমনি বিচিত্রস্পর্শে মানবের হৃদয়তন্ত্রী হইতে বিভিন্ন সুর জাগাইয়া তোলে। এই জন্যই বসন্তে প্রেমিক মিলন—আহ্বানের আবেগ-মূঢ় বিহ্বলতায় বিকল হইয়া যায়; সজল-জলদমালা-পরিবেষ্টিত বারিঝর্ঝর বরষায় তা'র বিরহ-কাতর হৃদয়ে অজানা বেদনায় অশ্রু গুমরিয়া উঠে; শরতে আবার যৌবনের এই চাঞ্চল্য ও আলোড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া প্রৌঢ়ের স্নিগ্ধ-মধুর শান্ত-সংযত প্রেমে চিত্ত

শিক্ষাও তদনুরূপই। ভারতবর্ষ তাহার "তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্ক-ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটা-মণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষ-কৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এক উদার শান্তি, এক বিশাল স্তব্ধতা" লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র-বাবু তাহা তাঁহার "নববর্ষ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন। এমার্সন, উত্তপ্ত জল বায়ু মানুষের বাক্‌শক্তির উপর কিরূপ কাজ করিয়া থাকে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।* New Englander নাকি শীতের প্রভাবে মুখ হা করিতেই কুণ্ঠিত; দ্বিধার সহিত দু'একটা কথা বলিয়াই তা'র বক্তব্য শেষ করিয়া দিতে চায়। Ireland এর কোন স্ত্রীলোক আবার তা'র বর্ণনার মধ্যে কিছুই বাদ দেয় না, গুছাইয়া গাছাইয়া সমস্ত Details বলিয়া তবে সে শ্রোতাকে নিষ্কৃতি দিবে। কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপের কাছে কোন দেশই টিঁকে না, সিসিলিবাসীর মুখ হইতে নাকি বহ্নিউদ্গীরিত ধূম্রের ন্যায় হাসি-ঠাট্টা, গল্প-চাতুরী অবিরত ধোঁয়াইয়াই চলিয়াছে। বিভিন্ন মানব সমাজ বিভিন্ন প্রকৃতির কোলে লালিত হইতেছে, ইহারই ফলে তাহারা প্রত্যেকেই একেকটা অনন্য সুলভ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। এই জন্যই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ Iceland দ্বীপবাসীদের সহিত জর্ম্মন-চরিত্র মিশ খায় না; শৈল-বন্ধুর Scotland বাসীর সবল দৃঢ় চিত্ততার সহিত হ্রদ-বহুল ইতালীবাসীর সৌন্দর্য্য- স্বপ্ন-মগ্ন মধুর প্রকৃতির কোন সাদৃশ্যই নাই; এই জন্যই বেদুয়ীনের উন্মত্ত কঠোর কর্ম্ম মুখরতার সহিত আলস্যভার-মন্থর কোমল বাঙ্গালী জীবনের সুদূর ঐক্য ও কল্পনায় আসে না। ক্রমশঃ।

প্রার্থনা।

কত জ্বালা লয়ে এসেছি ছুটিয়ে
তোমারি চরণতলে,
শান্তির নিঝরে সিক্ত কর মোরে
ডুবাও চোখের জলে।

বিশ্বের এ লীলা　　তোমারি ত খেলা
　　মায়ায় রচেছ সৃষ্টি,
ভিখারী দুয়ারে　　সুধায় কাতরে,—
　　কর গো করুণা বৃষ্টি।
নিশিদিন মান,　　ভরিয়া পরাণ,
　　কাঁদিয়াছি নিরবধি,
স্নিগ্ধ নিরমল　　অরুণ উজ্জ্বল
　　জ্যোতিতে বহাও নদী।
তৃষিত হৃদয়　　যেন গো জুড়ায়
　　তোমার করুণা ছায়,
এ জীবন নদী　　যেন নিরবধি
　　কৃপায় উজান ধায়।
হাতে হাতে ধরে　　দেখাও আমারে
　　শান্তির নব স্বর্গ,
শুষ্ক হৃদয়　　এনেছি বহিয়া
　　ও চরণে দিতে অর্ঘ্য।

শ্রীরাজবালা দেবী।

অপূর্ণ চিত্র।

(গল্প)

তখনকার দিনে তাহার মত চিত্রকর সেই সহরে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সকলেই বলিত "যদি চিত্র দেখিতে ইচ্ছা কর তবে কমলের চিত্রশালায় যাও।" কমল যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সে দেখিতে, ফুটফুটে তাহার চেহারা খানা, উন্নত নাসা, পদ্মের পাঁপড়ির মত তাহার চোখ দু'টি, তাহার উপরে কালো কালো টানা টানা ভ্রূ, বিশাল বক্ষ, তাহার সরল মুখখানির উপর সর্ব্বদাই যেন উৎসাহের একটা ঢেউ খেলিয়া যাইত। আহার নাই নিদ্রা নাই—কমল দিবা রাত্রি মনের মত করিয়া চিত্র আঁকিত—কতদিন যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিত—যখন তাহার চোখ দু'টি রঙএর বিভিন্নতা বুঝিতে পারিত না তখন তাহার আহারাদির কথা মনে হইত। কত বিনিদ্র রজনীর পর যখন অরুণের লাল আভা তাহার চিত্রে পড়িত তখন তাহার সেই সুন্দর মুখ খানি সফলতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তন্ময় হইয়া চিত্রের

দিকে চাহিয়া সে বলিত "দেবী, আর কতদিন বসিয়া থাকিব। এ জীবনে কি আশা পূর্ণ হইবে না?"

সে দেশের বাদশাহের মেয়েও খুব ভাল ছবি আঁকিতে পারিত। সে কমলের নাম শুনিয়াছিল। তাই একদিন সে তাহার এক পরিচারিকাকে কমলের নিকট পাঠাইয়া তাহার সব-চেয়ে-ভাল ছবিখানি কিনিতে চাহিল।

কমল একখানি চিত্র দেখাইয়া বলিল, "এ ছবি খানিই আমার সব চেয়ে ভাল—ইহা বিক্রয়ের নহে—অমূল্য। তবে যদি বাদশাহজাদী চাহিয়া থাকেন তবে লইয়া যাও কিন্তু জেনো ইহা আমি বিক্রয় করিতে পারিব না।"

বাদশাহজাদী চিত্র দেখিয়া ভাবিল "এমন চিত্র ত আমি আর জীবনে দেখি নাই! কি সুন্দর পরিকল্পনা! জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—জ্যোৎস্নানদীর জলে আপনার শুভ্র শরীর খানি বিছাইয়াদিয়াছে—ছোট ছোট ঢেউগুলিকে চুম্বন করিতেছে—আছারি বিছারি খাইতেছে, তাহার উপরে এক তরুণী-তরণীতে এক পরমাসুন্দরী রমণী! রমণীর কেশপাশ বায়ু হিল্লোলে যেন কাঁপিতেছে—ওষ্ঠের হাসি যেন মন্ত্রের হাসিকে লীন করিয়া দিতেছে। চিত্র দেখিয়া বাদশাহজাদী তন্ময় হইয়া গেল।

পরে একদিন কমলের নিকট বাদশাহের তলপ আসিল। কমল বাদশাহের নিকট হাজির। বাদশাহ বলিল "চিত্রকর, তুমি এই চিত্রখানির অপূর্ব্ব অংশটুকু পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে? এই চিত্র আমার কন্যা আঁকিয়াছে।"

কমল স্বীকৃত হইল। নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে চিত্র পূরণ করিতে বসিল।

দিন চলিয়া গেল। সকলে বলিল "ছবি আঁকা এখনো কি শেষ হইল না? এতক্ষণ বসিয়া কি করিতেছে চিত্রকর।"

অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। কিন্তু কই—চিত্র ত অপূর্ণই রহিয়াছে, কেবল সেই অপূর্ণ জায়গাটুকুতে একটা গভীর লাল রঙ! ছবির পাশে চিত্রকর পড়িয়া—আর তাহার বুকে এক ক্ষত চিহ্ন

শ্রীরঞ্জিনচন্দ্র হালদার।

প্রীতি

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] চৈত্র, ১৩১৯ [১২শ সংখ্যা।

উতলা।

ওগো প্রিয় প্রিয়তম!
তোমার স্মৃতিটি ছন্দোবন্ধে গাঁথি
রেখেছি হৃদয়ে মম।
লেখনীর মুখে হৃদি ঢালি দিয়ে
সযতনে তাহা প্রকাশিতে গিয়ে
সকল ভুলিয়া এঁকে ফেলি তব
মুখখানি মনোরম।
ওগো প্রিয় প্রিয়তম!
হৃদয়বীণার তারে,
ঝঙ্কারিয়া তব আরাধনা গীতি
জেগে উঠে বারে বারে।

কণ্ঠে আমার প্রাণ দিয়ে ঢালি
কি গাহিতে যেয়ে কি গাহিয়া ফেলি
মিলন মধুর বিরহ বিধুর
গান সে গানের পরে।
হৃদয় বীণার তারে!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

নিষ্কলঙ্ক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩

প্রাতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রৌদ্র তাহাদের মুখে চ'খে পড়িয়া বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্রস্ত-বসনা রমা চমকিয়া উঠিয়া বসিতেই নিমাই এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—তখন উভয়ের নাম একত্রিত করিয়া ক্ষুদ্র গ্রামের ভিতর একটা ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে!

গোবিন্দশঙ্কর কম্পিত হস্তে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তুমি ঠিক্ কথা বল্‌ছো নবীন?"

নবীন বলিল—"আজ্ঞা হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এখনও তা'দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি, বিশ্বাস না হয় আপনি—" বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন —"রাধামাধব!" ক্ষনেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন—"কিন্তু সে যে বার-বনিতা একথা তুমি কি করে জান্‌লে?" "তা না হলে আর কি সম্ভব, আর না হলেও একটা স্ত্রীলোকত বটে? এই বিধুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না কাল সন্ধ্যার সময় ও কি দেখেছে!" বিধু-ভূষণ প্রথম হইতেই ভয়ানক ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কেননা জেঠা-মশাইয়ের মুখ চ'খের ভাব দেখিয়া সে স্থির বুঝিয়াছিল যে লাটিম চুরি অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় কার্য্যে নিমেদা আজ লিপ্ত। সে নিজে কিছুই বলিতে চাহিল না, যাহা প্রশ্ন করা হইল তাহার এমন অসংলগ্ন জটিল উত্তর দিল যাহাতে নিমাই এর বিরুদ্ধে আর কোন

গোবিন্দশঙ্কর দারওয়ানকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন নিমাইকে কোন ক্রমেই যেন আর বাটিতে প্রবেশ করিতে না দেয়। যে পুত্র তাঁহার পবিত্র বংশে কলঙ্ক আনিয়াছে তাহার মুখ দর্শন তিনি পাপ মনে করেন। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"আজ থেকে সে আমার ত্যজ্যপুত্র!"

অত্যধিক পরিশ্রম ও অনিদ্রায় নিমাইএর মাথাটা বড় ধরিয়াছিল। অবিন্যস্ত কেশ, রক্তবর্ণ চক্ষু, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"রমা, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর আমি তোমার বাবার সন্ধান নিয়ে আস্‌ছি।"—রমাও দাঁড়াইয়া উঠিল, আলুলায়িত কেশদাম সম্বরণ করিতে করিতে বলিল—"ওগো, আমি একলা কি করে থাকবো?"

অতি দুঃখেও নিমাইএর হাসি আসিয়াছিল,—"কপাটে খিল দাও ভয় কি—" বলিয়া সে কম্পিত চরণে বাহির হইয়া গেল।

রমার পিতার অন্বেষণ বৃথা জানিয়া নিমাই তখন গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এই অল্প সময়ের মধ্যে অজানিত একটা ভয়ের ছায়া তাহার মনে কোথা হইতে আসিয়াছিল। এক রাত্রের মধ্যে সে যেন কি একটা অপরাধ করিয়াছে যাহার জন্য সে স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত বিশ্বের সম্মুখে অপরাধীর মত সে যেন চলিয়তছিল—প্রকৃতির প্রত্যেক তুচ্ছ জিনিষটাও যেন আজ তাহাকে দেখিয়া গোপনে বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছে! সহসা সে দাঁড়াইয়া পড়িল—কিন্তু সে কোন অপরাধ করে নাই—! একজন জলমগ্নাকে প্রাণদান করিয়াছে, নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়াছে মাত্র। রাত্রের অন্ধকারের ভিতর নিমাইএর নিকট যাহা সরল সহজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল দিনের আলোকে সে তাহাকে কোন মতেই ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। দিনের তীব্র আলোক কোন গুপ্ত কোণের তমসাটুকু যেন ঘুচাইয়া দিয়া কঠিন সত্যকে তাহার চ'খের সম্মুখে ধরিয়াদিল!

তথাপিও সে জোর করিয়া স্থির করিল তিলমাত্র অপরাধী সে নয়—এবং পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমূল বৃত্তান্ত সে জানাইবে

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে যখন চিরাভ্যস্ত সিংহ দুয়ার পার হইতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় প্রহরী তাহাকে নম্রভাবে সেলাম করিয়া জানাইল তাহার প্রবেশ নিষেধ!

নিমাইএর মাথার ভিতর দিয়া যেন একটা বহ্নির শিখা ছুটিয়া গেল। বিস্ময়ের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সে কিছুক্ষণ প্রহরীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—তারপর ধীরে ধীরে সেইখানটাতে বসিয়া পড়িল। যখন জ্ঞান হইল—শুনিল একটা কলরব উঠিয়াছে এবং দেখিল তাহার পিতা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"দরোয়ান! ও কে বের করে দাও।"

প্রহরী একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কর্কশকণ্ঠে গোবিন্দশঙ্কর বলিলেন—"শীঘ্র ওকে বের করে দাও—দেখ্ছো না মাতাল হয়ে বাড়ী এসেছে—দাঁড়িয়ে রইলে যে—"

প্রহরী অগ্রসর হইল। দুইহাতে মাটিটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিমাই শুধু বলিল "বাবা—!"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কোন কথা শুনতে চাইনে তোমার।" প্রহরী নিমাইএর হাত ধরিয়া তুলিল। সজোরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া নিমাই বলিল—"ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি—" দুইপদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া বলিল—"বাবা—কিন্তু জান্বেন আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—নিষ্কলঙ্ক!"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"থাক্ আর কথায় কাজ কি?"

অপ্রত্যাশিত ভাবে নিদারুণ আঘাত পাইয়া নিমাইএর তখন উন্মাদের ভাব আসিয়াছিল। সে স্থির করিল সেই দিনই দেশত্যাগ করিবে, আর কখনও ফিরিবেনা—এবং পিতার এই অকারণ তাড়নার প্রতিশোধ!—ওঃ—আর চলিতে পারিল না, রোষে ক্ষোভে, ঘৃণায় লজ্জায় সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দুই হাত দিয়া চোখ আবৃত করিয়া উচ্ছ্বাসিত অশ্রুকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। শেষে কিনা পিতা তাহার উপর সন্দেহ করিয়া

খানিকটা কাঁদিয়া যখন হৃদয়ভার কতকটা লঘু হইল তখন সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ দূরে তাহার চিরপুরাতন বাসভূমি যেখানে তাহার পিতামহ প্রপিতামহগণ কত শত বর্ষ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গৌরবের সহিত বাস করিয়া আসিয়াছেন, আজ কিনা সেখান হইতে কলঙ্কের ছাপ লইয়া সে বাহির হইয়া আসিয়াছে! আর নয়,—সে দ্রুত পদে চলিতে লাগিল—কিন্তু কোথা যাইবে? এত বড় জগতটায় আপনার বলিতে যে তাহার আর কেহ নাই—কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক নাই, সে যে আজ সম্পূর্ণ একা! সহসা মনে পড়িয়া গেল—গাঢ় মেঘের কোলে বিজলীর মত কাল রাত্রের জ্যোৎস্না প্লাবিত সেই মুখখানি! মজ্জমান্ ব্যক্তি ডুবিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সম্মুখে একটা আশ্রয় পাইলে যেমন আগ্রহচিত্ত তাহাকে আলিঙ্গনে উদ্যত হয় তেমনি করিয়া রমার নিকট সে ছুটিয়া চলিল।

ঘরে ঢুকিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রমার দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া নিমাই বলিল—"বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিলেন!" বিস্ফারিত নেত্রে রমা বলিল—"কেন?" "বোধ হয় তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি ব'লে" বলিতে বলিতে নিমাই শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল একটা বিরাট গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোনও অণুমাত্র আলোকের আভাস নাই শুধু দূরে অতিদূরে যেন একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ রশ্মিরেখা!

চোখ বুজিতে বুজিতে নিমাই বলিল—"রমা, আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবনা। কি করে যে এখন বেঁচে আছি জানিনা।" রমা তাহার যন্ত্রণাকাতর-বিকৃতমুখ দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কষ্ট হচ্ছে?"

কাতরস্বরে নিমাই বলিল—"সে যে কি কষ্ট তা তোমায় কেমন করে বোঝাব রমা! বুকের ভিতর কিসের যেন একটা বিষম বিপ্লব ব'য়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে কেন তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। এই কষ্ট যে কেবল আমি একা নয়, তোমাকেও এই অন্যায়ের সঙ্গে

ঘোর কৃষ্ণমেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া বারিপতন হইতেছিল। বৈদ্যুতিক আলোকে সমস্ত পদার্থ একবার ঝলসিয়া দিয়া কড় কড় শব্দে অদূরে একটা বাজ পড়িল। নিমাইএর পার্শ্বে বসিতে বসিতে রমা বলিল—"কেন তুচ্ছ আমার জন্য আপনার জীবনকে বিপন্ন কল্লেন ? আপনার নামে অযথা কলঙ্ক আন্‌লেন—তার চেয়ে—"

বাধা দিয়া নিমাই বলিল "তুমি বলে নয় রমা, একজন বিপন্না নারী বলে ! কিন্তু এখন আমার কি মনে হচ্ছে জান"—

এক দৃষ্টে নিমাইএর মুখের দিকে চাহিয়া রমা বলিল—"কি মনে হচ্ছে ?" "মনে হচ্ছে সার্থক তোমার প্রাণদান ক'রে—ধন্য আমি ! আর মনে হচ্ছে"—সহসা নিমাই স্তব্ধ হইল। রমা কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না এমন সময় চোখ চাহিয়া নিমাই আবার বলিল—"রমা ! আমার বুকের ভিতর ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে। ছেলেবেলা ডাক্তারে বলেছিল আমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত—আজ তা' স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। একটা কথা—আমি চলে গেলে আমার কথা কি তুমি একটুও মনে রাখ্‌বে না—রমা ?"

রমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নিমাইএর বাক্যের মধ্যে এমনই একটা রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পাইতেছিল যে অশ্রুনেত্রে চাহিয়া রমা বলিল, "রাখ্‌বো বই কি !"

নিমাই বলিল—"কিন্তু একটা কথা আমি কোন মতেই ভুল্‌তে পার্ব্ব না। কি জান রমা ? তোমার কালরাত্রের সেই জ্যোৎস্না মাখা মুখখানি !—ওঃ রমা আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখ—ওঃ কি যন্ত্রনা !" রমার দুইহাত সে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

কাতর হইয়া রমা বলিল "আপনার বাড়ীতে সংবাদ দিই—অনিদ্রায়—দুদিন উপবাসে আপনি কেমন হ'য়ে পড়েছেন !"

হাতদুটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া নিমাই বলিল—"আর একটু, আর একটু তুমি আমার কাছে বোস !"

রহিল—। সে দেখিল নিমাইএর ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল।

গোবিন্দশঙ্কর আহারের পর নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় ঝড়ের মত রমা ঘরে প্রবেশ করিল।

বিস্মিত-নেত্রে তিনি বলিলেন—"তুমি কে মা?" হাঁপাইতে হাঁপাইতে রমা বলিল—"আমি রমা!"

গোবিন্দশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন—"ওঃ রমা! কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কন্যা! এস মা, তোমার পিতা কোথায়?"

রমা বলিল—"জানিনা, কাল সন্ধ্যার আগে আপনার ঘাটের সম্মুখে আমাদের নৌকা ডুবে যায়, বাবাকে পাওয়া যায় নি!"

"তবে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা?"

"আপনার বাংলোয়"

খাটের বাজুটা দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—"নিমাইএর সঙ্গে?" দৃষ্টি আনত করিয়া রমা বলিল—'হাঁ'

বিছানা ছাড়িয়া বৃদ্ধ নামিয়া পড়িলেন—"ওঃ কি পাপই করেছি—নির্দ্দোষী নিমাইকে আমার—সে এখনও সেখানে আছে?"

"হাঁ, তিনি বুকের যন্ত্রণায় বড় কাতর"

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

নিমাইএর প্রাণহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গোবিন্দশঙ্কর যখন কাতরস্বরে "ওরে নিমাই, বাপ আমার" বলিয়া ডাকিতে-ছিলেন তখন সে বহুক্ষণ তাহার নিষ্কলঙ্ক জীবণের সম্মুখে এক দীর্ঘ কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া কোন এক অজানা পথের যাত্রী হইয়া পড়িয়াছে!

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বস্তু ও ভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনের ভাবের উপর বাহিরের বস্তুর কতদূর প্রভাব তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা গেল। বস্তু যেমন ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে, মনের ভাবও তেমন বাহিরকে নিয়ন্ত্রিত করে। উন্নত মানসিক ভাব শরীরকে একটি উজ্জ্বল দীপ্তি দান করে। মানুষের মন যতই মহৎভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দেহসৌন্দর্য্যও ততই বাড়িয়া উঠিতেছে। আদিম মানব সমাজের সহিত বর্ত্তমান মানব সমাজের তুলনা করিলেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। যাহা কিছু সুন্দর তাহার সহিত পবিত্রতার এবং কুৎসিতের সহিত অপবিত্রতর একটা মূলগত সাদৃশ্য আমাদের মনে সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্যলাভ আর কিছুই নহে, শুধু জড়তা ঘুচাইয়া দিয়া আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হওয়া। জড়তাও আত্মার স্বরচিত একটা গৃহমাত্র। আত্মা আপনার বাসোপযোগী করিয়া যে একটি ঘর বাঁধিয়াছিল সে প্রথমে দরজা জানালা তা'তে কিছুই রাখে নাই। ফলে আলোক ও বাতাসের অভাবে গুটিপোকার মত আপনারই রচিত ঘরে সে আট্‌কা পড়িয়া গেল। চারিদিকের কঠিন প্রস্তর বেষ্টন ভেদ করিয়া আত্মার লক্ষণগুলি বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারিল না। গাছ পাথর মাটি জলের মধ্যে আত্মার সেই অবস্থা। আত্মার সাধনাই হইয়াছে শুধু এই নিজের গড়া প্রাচীরটাকে ক্রমে ঘুচাইয়া দিয়া নিজে মুক্ত হইবার চেষ্টা। আত্মার এই ইচ্ছার তাড়নাতেই নিম্নতম জড়ও অভিব্যক্ত হইয়া জীবে আসিয়া উপনীত হইল। নিম্নতম জীব protoplasm এর মধ্যে, আত্মা না বলিতে চাও, প্রাণের লক্ষণ কতকটা প্রকাশ পাইল, জড়তাও কতকটা মুছিয়া গেল। ক্রমে জড়তা যতই ঘুচিতে লাগিল, প্রাণ লক্ষণ যতই সুস্পষ্ট হইতে লাগিল, জীব ততই সুন্দর হইতে লাগিল। এই ক্রমবিকাশ

পরও পর্য্যায় আছে, দেবত্ব আর বেশী দিন মানবের কাছে স্বপ্নের মত মনে হইবে না, স্বর্গের দুর্ল্লভত্বও ঘুচিয়া যাইবে। সে ভবিষ্যতের কথা থাক্। বর্ত্তমানে আমাদিগের কি করা উচিত তাহাই দেখিতে হইবে।

মানবের জড়ত্ব এখনও ঘুচে নাই। মনুষ্য-দেহরূপে আত্মার গৃহটি এখনও বিরাজ করিতেছে, যদিও এই গৃহের অনেকগুলি দরজা জানালা কাটা হইয়াছে, এবং গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণগুলিও আগেকার উপকরণগুলি হইতে অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। আলোক ও বাতাসের সহিত আদান প্রদানের অনেক সুবিধাসত্ত্বেও আত্মা এই মনুষ্য দেহরূপ গৃহটি লইয়াও সুখী নহে। বন্ধন হইতে সে একেবারে মুক্ত হইতে চায়। এই মুক্তি লইয়াইত নানা মুনির নানা মত। কেহ হয়ত বলিবেন যে সংসার অনিত্য, চোখ বুজিয়া এ বিষয় ধ্যান করিতে থাক, অবিদ্যা কাটিয়া যাইবে, মুক্তিলাভ করিবে। প্রবন্ধ-লেখক সে দলের লোক নহে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। আমি এপর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়া আসিতেছি তার মধ্যে ইহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে ভাবকে পরিপূর্ণ করিতে হইলে, তাহা বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিয়া হইবে না, বরং বস্তুকে গ্রাহ্য করিয়া নিয়া তাহাকে ক্রমে ভাবে পরিণত করিলে, তবেই সম্ভব হইবে। মানুষ যে এখন এত বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা বস্তুকে অস্বীকার করিয়া নহে, বস্তুকে ভাবে পরিণত করিয়াই, কারণ ভাব জিনিষটা সৃষ্টি ছাড়া পরীরাজ্য হইতে আমদানী নহে, তাহা বস্তুর মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে শুদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে। বস্তুকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিলে ভাবও তল্পি তল্পা লইয়া তখনি বিদায় হয়। বাষ্পকে পাইতে হইলে যেমন আকাশে উঠিতে হয় না, বরং পৃথিবীর জল লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হয়, তেমনি মানসিক laboratory processএ বস্তুকে আনিয়া ফেলিলেই তবে ভাবকে পাওয়া যায়। আপিসকে স্বীকার করিয়া না লইলে ঘর সৌন্দর্য্যশালী

বিশেষ গুণটুকু আছে যে সে আপিসের জড়তা হইতে নিজের খোরাক জোগাড় করিয়া লইতে পারে। মনুষ্যদেহ যেরূপ বাহিরের জিনিষকে নিজের করিয়া নিয়া ক্রমে বাড়িয়া উঠে, মনও বস্তুর সম্পর্কে আসিয়া তেমনি বাড়ে। হাতের কাজের মধ্য দিয়া, চক্ষুর দেখার মধ্য দিয়া কানে শোনার মধ্য দিয়া কখন যে কোন বস্তু অন্তরে প্রবেশ করিয়া বসে তাহা কেহ খোঁজ রাখে কি? মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বস্তু ভাব জন্ম গ্রহণ করে এবং মনের ব্যাপ্তি বাড়াইয়া তোলে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সমস্ত বিশ্বসংসার তাহার সমস্ত জড় বস্তু ও খুঁটিনাটি লইয়া মানবের মনকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্যই তাহার সম্মুখে মূক হইয়া বসিয়া আছে। সমস্ত জড় বস্তু বলির পশুর মত শ্রেণীবদ্ধভাবে যজ্ঞকর্ত্তার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিয়াছে, কখন তাহাদের নিজ নিজ পালা আসিবে এবং আপনারা মুক্ত হইয়া যজ্ঞ কর্ত্তাকেও মুক্তিমার্গে অগ্রসর করিয়া দিবে। বিরাট-বিশ্বপ্রকৃতি মানবের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; মানবের কাজ তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করা, তাহাকে কাজে খাটাইয়া তোলা। জগতের বিরাটত্বের সহিত তুলনা করিলে মানব আজ পর্য্যন্তও অতি অল্প পরিমাণ বস্তুকেই কাজে খাটাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। এখনও মানবের জ্ঞানের বাহিরে কত পুষ্প ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া যাইতেছে; কত গাছ গজাইয়া আপনার নিষ্ফল তরুজীবন শেষ করিয়া দিতেছে, পর্ব্বত-চূড়ায়, গহন অরণ্যমধ্যে, সাগরের তলদেশে কত জীবজন্তু অজ্ঞাত ভাবে বিচরণ করিয়া চলিয়াছে; কত ঔষধ, কত খাদ্যদ্রব্য, কত ধাতু আজও অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবন বহন করিতেছে; কত দেশ আজও মনুষ্যনয়নের অগোচরে রহিয়াছে; কত অসম্ভব ঘটনাই বা নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে তাহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে কি? যাহা পাই নাই তাহার তুলনায় যাহা পাইয়াছি তাহা কত সামান্য! যখন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কাজে খাটাইয়া লইতে পারিব, চন্দ্রসূর্য্য ও বিদ্যুতের চঞ্চল রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নদী

গিরিবন ও জলস্থল আকাশ পাতালের সমস্ত জড় অজড়ে মিলিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইবে এবং সকলকে আমি প্রয়োজনের মধ্য দিয়া ভাবে ও শক্তিতে পরিণত করিয়া তুলিতে পারিব, তখনি আমার মনের পূর্ণ পরিণতি, তখনি আমার মুক্তি, "নানা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমি একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সমস্ত বিচিত্রতা লইয়া আমারই মধ্যে বিরাজ করিতেছে। আমিই কোন স্বপ্ন-বিশ্রুত আদিমযুগে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডটা সৃষ্টি করিয়া আমার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছি ; আমারই স্বাভাবিক প্রয়োজনানুসারী সময় বিভাগ প্রভাত-মধ্যাহ্ন-রাত্রি ও ছয় ঋতুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আমারই নির্ম্মলতা আকাশ গড়িয়াছে, আমারই শ্যামল যৌবন বসন্তে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, আমারই জীবন-স্পন্দনে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের সৃষ্টি,—এক কথায় আমিই সব, আমিই ব্রহ্ম—কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন। এই কথা ঠিক হইলেও আমি এই বিরাট বিশ্বরাজ্যের বদ্ধ সিংহদ্বারের বাহিরে দীন রিক্তবেশেই কি পড়িয়া নাই! আমার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার এখন সে গৌরব কই! আমিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছি ইহা এখন জোর করিয়া দাবী করিতে পারি কই? আমি ত আমাকেই চিনি না। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "আত্মানং বিদ্ধি", নিজকে জান, এই নিজকে জানাই মুক্তির উপায়। জ্ঞান জিনিষটা আর কিছুই নহে শুধু নিজেকে জানা। আমার মধ্যেই সমস্ত রহিয়াছে, জ্ঞান নূতন করিয়া কিছুই জানে না, যাহা আছে শুধু তাহাই আবিষ্কার করে। আমার মধ্যে প্রকাণ্ড জগৎ রহিয়াছে, এই জগৎকে আগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে তবেই আমি আমার বিশালত্ব বুঝিতে পারিব এবং আমাকে জানিতে পারিব—নতুবা আমি যে ক্ষুদ্র মানুষ সেই মানুষই রহিয়া যাইব।

আর একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ কেন সমস্ত এসিয়া, চিরদিন ভাবের উপাসক। তাহার সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ, জটিল তর্কজাল একত্বের সন্ধানেই নিয়োজিত। তাহার

গৃহীর গার্হস্থ্য, রাজার রাজ্যপালন সেই একের চরণতলেই অর্ঘ্যের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। সে আধ্যাত্মিকতাকে অতিমাত্রায় আমল দিতে গিয়া কর্ম্মজীবনকে যে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করে নাই তাহা বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে তাহার কতকটা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইউরোপও আবার কল বানাইয়া, লড়াই করিয়া, বাণিজ্যতরীর পাল ফুলাইয়া আধ্যাত্মিকতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সে ধনসম্পদকেই বড় বলিয়া জানিয়াছে এবং বহমান রক্তস্রোতের উপর দিয়াও অকুণ্ঠিত মনে তরণী বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে যে একটা কত বড় অসম্পূর্ণ জীব সে তাহা ধারনাই করিতে পারে না। এমার্সন প্লেতোর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন" The unity of Asia and the detail of Europe, the infinitude of the Asiatic Soul and the defining result-loving, machine-making, opera-going, surface-seeking Europe, Plato came to join and by contact to enhance the energy of each." এই দুই বিভিন্ন সভ্যতার মিলন ছাড়া পূর্ণ পরিণতি কখনই বিকশিত হইবে না। আজ তাই বিধাতার মঙ্গলবিধানে এসিয়া ও ইউরোপের প্রতিনিধি ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে, তাই আজ উভয়ের স্বার্থ-সংঘাত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষ এই দুঃখের দাহ ও সংঘাতের বেদনাতেই আপনাকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে। তারপর তার সুপ্রতিষ্ঠিত যজ্ঞভূমির মাঝে সমস্ত বিরোধিকে মিলনাকর্ষণে টানিয়া লইবার, এবং ভারতের ভাব লইয়া ইউরোপের বস্তুকে জয় করিবার এবং উভয়ের সংযোগে পূর্ণ পরিণতি ফুটাইয়া তুলিবার সময় আসিবে। ভারতবর্ষ কবে এই বিশেষ গৌরবের অধিকারী হইবে তাহারই সূচনায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা পূর্ণ সার্থকতার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

প্রতিদান।

তব তরে যেবা করে কণ্টক চয়ন,
তুমি তারে দাও ফুল্ল কুসুম শোভন।
তোমার সে দান র'বে হাসি ভরা ফুল,
কাটা তার হ'য়ে রবে স্মৃতিপথে শূল।
দুঃখ যেই দেয় তোমা, তুমি সুখ দাও,
হিংসুকেরে হাসিমুখে আনন্দ বিলাও।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

বঙ্গে ইংরাজ অধিকার।

১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ ; ভারতরে রাজনৈতিক গগন ঘন মেঘাচ্ছন্ন। সকলেই প্রবল ঘূর্ণী বায়ু ও দারুণ অশনি সম্পাতের আশঙ্কা করিতেছিল। প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যে পলাসীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইল আর পাণিপথের প্রাচীন প্রান্তরে মহারাষ্ট্রের মস্তকে বজ্রপাত হইল। তখন হীনবল নামসর্ব্বস্ব দিল্লী সম্রাট মহারাষ্ট্রগণের ক্রীড়া পুত্তলী। দক্ষিণে 'পুনার রাজপ্রাসাদে বসিয়া পেশোয়া বালাজী বাজীরাও দিল্লীর দুর্গ চূড়া হইতে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত মোস্‌লেম পতাকা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মারাঠাগণের জাতীয় পতাকা শিবাজীর গৈরিক ধ্বজা সেই স্থানে স্থাপন করিয়া' সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপণের সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তখন রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় অপমান ও ক্রোধ বক্ষে চাপিয়া বাহ্য আনুগত্য প্রকাশ করিয়া নিজাম সবিনয়ে পুনার রাজকোষে চৌথ উপস্থিত করিত। মহীশুরের ব্যাঘ্র হায়দার আলি ও তাহার পুত্র শার্দ্দুল বিক্রম টিপু তখন শৃগালের ন্যায় ব্যবহারে তৎপর ছিলেন। নিজাম ও পেশোয়ার অনুগৃহীত ও প্রচুর ভূমির অধিকারী ফরাসী দস্যুগণের হৃদয়ে দক্ষিণে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন

সানের হিসাবের-খাতাগত-প্রাণ ইংরাজ-বণিক কি করিতেছিলেন? যাহারা ভারতী ভূপতিগণের সিংহাসন তলে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া ও মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ও বাণিজ্য সম্ভার রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূমি ক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেন এবং রাজানুমতি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন সেই ইংরাজ বণিকগণ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কি করিতেছিলেন? আর ঐ যে সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফগানিস্থানের শৈলকুঞ্জে এক সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল সেই নির্ঘোষে হিন্দুস্থানের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল এবং মহারাষ্ট্র বীরের বিজয়-দীপ্ত নির্ম্মল ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তখন ইংরাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইংরাজ বঙ্গাধীপের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। কোন রূপে বাণিজ্য সংরক্ষণ করিতে ও রাজ-প্রসাদ লব্ধ ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ড রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস; উদরান্নের নিমিত্ত প্রবাসী দরিদ্র বণিক, রাজ্যেশ্বর আর সিংহাসন বিহারী রাজচক্রবর্ত্তী ভূপতি পথকুক্কুরের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়িত।

বঙ্গে ষড়যন্ত্র

বঙ্গদেশের রাজধানীতে তখন প্রবল রাজমন্ত্রীগণ কুটিল ষড়যন্ত্রে ব্যাপৃত। রাজসিংহাসনে বালক নবাব; তাঁহার প্রকৃতি উদ্ধত; তিনি অদূরদর্শী, অনভিজ্ঞ ও আয়োজনাতিরিক্ত কঠোর। স্বার্থপর প্রবল রাজকর্ম্মচারিগণ সিরাজের প্রতি বিরূপ। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভ কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কবে হতভাগ্য বালকটাকে পদাঘাতে দূর করিয়া তাহার স্থানে অভিষিক্ত হইব এই চিন্তায় মির জাফরের রাত্রি বিনিদ্র হইয়া উঠিল। আর জগতশেঠ ভাবিলেন বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হউক তাহাতে আমার কি যায় আসে; আমার ভূগর্ভস্থিত অন্ধকার ধনাগার বঙ্গদেশের রত্ন কাঞ্চনে আলোকিত হইয়া উঠুক। এই দারুণ দুর্দ্দিনে কেবল একটী রমণী রাজনৈতিকগণকে স্বদেশের

সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বিরত করিতে প্রয়োগ পাইয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালী সেই স্নেহময়ীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে এবং তাঁহার স্মরণে বাংলার নরনারীর মস্তক ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী; কিন্তু রমণীর কি সাধ্য, কুচক্রিগণের চক্রান্ত ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ষড়যন্ত্রে ইংরাজের যোগদান।

ইংরেজ দেখিলেন মহাসুযোগ; বৃষভ গর্জ্জিয়া উঠিল, এখন না হয় কখনই না," এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। ত্র্যহস্পর্শ সংযোগে সিরাজের সর্ব্বনাশ হইল। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান মিলিয়া আলিবর্দ্দির দুলাল বালক নৃপতির প্রাণনাশ করিল। আর আত্মদোষস্খালনপ্রয়াসী ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া, হতভাগ্য বালকের যে চিত্র অঙ্কিত করিলেন জগতের ইতিহাসে উহা হইতে অধিকতর কলঙ্কমলিন চিত্র আর অঙ্কিত হয় নাই। রোমের উন্মাদসম্রাট "নীরো" সিরাজের তুলনায় দেবতা; সমসাময়িক ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ সিরাজকে এই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। *

পলাসীর যুদ্ধ।

নররক্ত প্রবাহ ভাগিরথীর বিমল সলিল কলুষিত করিয়া তুলিল। নদীর বক্ষ বিলোড়িত হইল, ক্রন্দন কল্লোলে ভরিয়া গেল। নদী সৈকতে দগ্ধ বারুদের তীব্রগন্ধ, আহতের হাহাকার আর বিজয়ী সেনাগণের গগনভেদী জয়নাদ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুনের অপরাহ্নে পলাসীর এই ছবি। মুরসিদাবাদের রাজপথে লোকারণ্য; নবাবের অবরোধে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি। একি দৃশ্য! আলুলায়িত কুন্তল আলিবর্দ্দি-কন্যা প্রকাশ্য রাজপথে শ্লথবসনে হস্তিশুণ্ডতলে ধূলিবি লুন্ঠিতা! আর হস্তিপৃষ্ঠে ও কি! দলিত গোলাপকুসুম সদৃশ ও কাহার মুখ? পৌরবাসিগণ সভয়ে দেখিল উহা ছিন্ন কণ্ঠ

* শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সিরাজের মস্তক। নির্ম্মম নপুংসকগণ মূর্চ্ছিতা সিরাজমাতাকে রাজ-পথ হইতে তুলিয়া লইয়া গেল। নগরবাসী হিন্দু মুসলমানের তপ্ত নিশ্বাস ও অভিশাপ সিংহাসনারূঢ় জাফরকে চঞ্চল ও বধির করিয়া তুলিল। ধনী, দরিদ্র সকলে একবাক্যে-কহিল বিশ্বাসঘাতকের বক্ষে শৈলপাত হউক। ভগবানের ইচ্ছা; কিয়দ্দিবস পরে দূত সংবাদ আনিল সাহাজাদা মিরণ রণক্ষেত্রে পটগৃহে বজ্রাগ্নিতে নিহত; কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী অনুচরগণ দেখিল গুপ্তহত্যাকারীর আগ্নেয়াস্ত্রে মীরণের মস্তক বিদীর্ণ। বৃদ্ধ অনুতপ্ত মীরজাফর মহাব্যাধিগ্রস্ত। সকলে এক বাক্যে কহিল-ধর্ম্মের ল বাতাসে নড়ে।

মীরজাফর ও মীরকাসিম।

পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরাজ কোম্পানী বঙ্গবিজয় ঘোষণা করেন নাই। ক্লাইভ আসিয়া মীরজাফরকে বঙ্গবিহারের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ইংরাজ তখনও প্রজা, বণিক্ ও শক্তিশালী ভূম্যাধিকারী মাত্র। মুরসিদাবাদের রাজকোষ একেবারে শূন্য; ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণকে পারিতোষিক দিয়া মীরজাফর নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্রমৃত, নিজশরীর ব্যাধিগ্রস্ত, জাফর রাজ্যশাসনে একরূপ অপারগ, সৈন্যগণ বেতন পায় না, তাহারা খেপিয়া উঠিল। এই দুঃসময় জাফরের জামাতা কাসিম স্বীয় তহবিল হইতে মুদ্রা বিতরণ করিয়া সৈন্যগণকে শান্ত করিলেন। কোম্পানীর নির্দ্দেশ অনুসারে জাফর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন অথবা করিতে বাধ্য হইলেন। জামাতা কাসিম বাংলার গদি প্রাপ্ত হইলেন। আবার সেই লীলা; অর্থ গৃধ্নু ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের মনস্তুষ্টি করিতে কাসিমের শেষ কপর্দ্দক নিঃশেষিত হইয়া গেল। কাসিম যখন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহা-সনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার সংকল্প ও ভরসা ছিল যে বণিক্-

পানিপথের যুদ্ধ ও সম্রাট সাহআলম।

তারপর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ক্রন্দনের রোল। সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; পানিপথের সিকতাময় ভূমিতে সদাশিব ও বিশ্বাস চির নিদ্রায় অভিভূত; তিন লক্ষ মহারাষ্ট্র সৈন্য রণক্ষেত্রে শায়িত। নগ্ন সন্ন্যাসীবেশধারী খঞ্জ নানাফরনবিশ পেশোয়ার রাজ সভায় আসিয়া নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিল। ক্ষুব্ধ বালাজী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ভগ্নমনোরথ পেশোয়া, পুত্রশোক ও ভ্রাতৃশোক সহ্য করিতে পারিলেন না; অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সপ্তদশবর্ষীয় বালক মধু পিতার আশাহত ও অশ্রুমলিন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দস্যুসম্রাট নাদিরের শিষ্য মহাবীর আহম্মদ ও পরাক্রমশালী মহারাষ্ট্রগণ যখন আপনাদের বল পরীক্ষা করিতেছিলেন তখন ভাগ্যহীন হত-গৌরব দিল্লীসম্রাট সাহ আলম বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত। পানিপথের যুদ্ধে আহম্মদের শক্তি নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল; তিনি আর অগ্রসর হইলেন না; পঞ্জাবের কিয়দংশ নিজ অধিকারে ভুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অযোধ্যার নবাব উজীর সুজাউদ্দৌল্লা নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহারাষ্ট্রগণের শীঘ্র মাথাতুলিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি সম্রাট সাহ আলম দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে সাহস করিতেছেন না। তিনি বঙ্গদেশের সীমান্তে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন—ইচ্ছা কোনরূপে বঙ্গ দেশটা হাত করা। সাহ আলমের অভিসন্ধি সকলেই বুঝিতে পারিল। একদা মেজর কারনক সম্রাটের ফরাসী সৈনাধ্যক্ষকে দলবলসহ বন্দী করিলেন। রাজনৈতিক বিষয় মীমাংসা করিবার নিমিত্ত ইংরাজের পক্ষ হইতে বাদসাহের নিকট সম্ভ্রমপূর্ণ নিমন্ত্রণ পত্র গেল। বাদসাহ আসিয়া পাটনায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। ইংরাজের মনোনীত মীরকাসিম সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার দেওয়ানীর ফার্ম্মাণ পাইলেন; স্থির হইল মীরকাসিম বৎসরে ছাব্বিশ লক্ষ মুদ্রা দিল্লীতে প্রেরণ করিবেন।

মীরকাসিম ও ইংরাজ।

মিরকাসিম এখন আর ইংরাজের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া থাকিতে চাহেন না। সম্রু ও পিক্রস তাহার সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রকাশ্যযুদ্ধে পরিণত হইল। ইংরাজ পুনরায় কুষ্ঠব্যাধিতে গলিত দেহ মীরজাফরকে মুরসিদাবাদে বাংলার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ভাগ্যবিমুখ; মীরকাসিমের সৈন্যদল কাটোয়ায় পরাজিত হইল এবং ঘেরিয়ার ঘোরতর সংগ্রামে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানগুলি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ও প্রতিহিংসা বাসনায় মীরকাসিমের মস্তক বিকৃত হইয়া উঠিল। রাজবল্লভ ও সেঠগণ সপরিবারে নিহত হইল; পাটনায় নবাবের আদেশে ইংরাজ বন্দিগণকে সমরু * বধ করিল। উদয়নালায় মীরকাসিমের বঙ্গাধিকারের শেষ চেষ্টা বিফল হইল, তিনি অযোধ্যার নবাব উজীরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নবাব উজির মীর কাসিমকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; আবার দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। বক্সারের যুদ্ধে (৩রা মে ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ হেকটর মান্‌রো Hector Munro) ইহাদিগকে পরাজিত করেন। কাসিমের পরিণাম কি হইল তাহা কেহই বলিতে পারে না। সহায়হীন সম্রাট সাহ আলম ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। সুজাউদ্দৌল্লার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। বাংলায় ইংরাজের ক্ষমতা অপ্রতিহত; কিন্তু দেশাধিপতি মিরজাফর; ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাহাদের চিরকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে রুগ্ন ও দীন নবাব মীরজাফরকে আপনাদের ন্যায্য উৎকোচের জন্য পীড়ন করিতে লাগিল। মীরজাফর কোথা হইতে দিবেন; যাহা-হউক ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে বাংলার নবাবীর কবল হইতে রক্ষা করিল।

---

* সমরুর ইতিহাস অতি বিচিত্র। বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিল।

বাংলার নবাবী।

বাংলার নবাবীটা একটা খুব লাভজনক ব্যবসা; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচিত্র পণ্যদ্রব্য—বাংলার নবাবী। মীরজাফরের দ্বিতীয়পুত্র নিজাম-উদ্দৌলা বাংলার মস্‌নদে উপবেশন করিলেন। বুভুক্ষিত শকুনির ন্যায় ইংরাজগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল। ইহাদিগকে তুষ্ট করিতে নূতন নবাব ভিখারী হইয়া গেল। নূতন নবাবের সহিত নূতন সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল। উহা এইরূপ (১) কোম্পানি বঙ্গদেশের সামরিক সংরক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সামরিক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটী জেলার রাজস্বসংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তে প্রদত্ত হইল। মহম্মদ রেজাখাঁ নবাবের প্রতিনিধি ও প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ক্লাইভ ও বাংলার দেওয়ানী।

কর্ম্মচারিগণের উৎকোচগ্রহণ ও বাংলার বিশৃঙ্খলার সংবাদ ইংলণ্ডে ডিরেক্টরগণের কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ক্লাইভ পুনরায় কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন (৩রা মে ১৭৬৫)। ঐ দিবস ইংরাজ সেনাপতি কারনক (Carnoc) কোরার নিকট পুনরায় অযোধ্যায় নবাব উজিরকে পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর উজির সন্ধির প্রার্থী হইলেন। দশবৎসর পূর্ব্বে যে ইংরাজগণ বাংলার নবাবের এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইত, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ তাহারাই দিল্লীর সম্রাটের এবং অযোধ্যা ও বাংলার নবাবের ভাগ্যবিধাতা। ক্লাইভ বাংলার নূতন নবাবের সন্ধিপত্র বজায় রাখিলেন; অযোধ্যার নবাবের সহিত সখ্য স্থাপন হইল কিন্তু তাঁহাকে কোরা ও এলাহাবাদ ছাড়িতে হইল। বাকী রহিলেন দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম। তিনি কোরা এলাহাবাদ ও বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে বাংলার দেওয়ানী চিরস্থায়ীরূপে কোম্পানীকে প্রদান করিলেন। বাদসাহী ফার্ম্মাণের প্রধান সর্ত্ত কয়েকটী এইরূপ।—

(১) সম্রাট বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পাইবেন।

(২) বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের ভার কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হইল।

(৩) কোম্পানী দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের ভার পাইলেন।

(৪) নিজামতের ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক ৫৬ লক্ষ টাকা কোম্পানী নবাব নাজিমকে দিবে।

কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের চিরস্থায়ী দেওয়ান এবং নবাব নিজাম উদ্দৌলা নবাব নাজিম। নবাব নাজিম দেশের শান্তিরক্ষা করিতেন ও ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। যখন মোগল সম্রাটগণ পরাক্রান্ত ছিলেন তখন নাজিম ও দেওয়ানের পদ একই ব্যক্তি অর্থাৎ সুবাদার প্রাপ্ত হইতেন।

(৫) কোম্পানি সামরিক বিষয়ের কর্ত্তা হইলেন।

(৬) এই সকল বিষয়ের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যে টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিবে তাহা কোম্পানীর নিজস্ব। অদ্ভুদকর্ম্মা ক্লাইভ এইরূপে বাংলার শাসন বিধান করিয়া ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

বাংলা শাসন।

ক্লাইভ চলিয়া গেলেন; কোম্পানী দেওয়ানী পাইলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব সংগ্রহে অনভিজ্ঞ সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের ভার স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকের হাতে অর্থাৎ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের হাতেই রহিল। এই সময়ে বাংলাদেশে যে ভীষণ মন্বন্তর ঘটিয়া গেল তাহার বিবরণ এক হণ্টার * ব্যতীত আর কোন সত্য-সন্ধিৎসু ইংরাজ ঐতিহাসিকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। এই দারুণ দুর্দ্দৈবের কথা এখনও বাংলায় প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত আছে।

মন্বন্তর।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসীরা করভারে নিপীড়িত, ইহার পর আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কোম্পানী ষোলআনা রাজস্ব আদায় করিয়া লইল। তাহার পর শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে তণ্ডুলকণা দুষ্প্রাপ্য

হইয়া উঠিল। বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গেল। বুভুক্ষু জন সাধারণ ক্ষুধার্থ বন্য পশুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিল। পশু, পক্ষী, শাক, পাতা, কীটপতঙ্গ, মানুষ খাইতে লাগিল। পরে তাহাও পাওয়া যায় না। এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লোক স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বিক্রয় করিতে লাগিল। তারপর আর ক্রেতা জুটে না. সকলেই বিক্রেতা তখন পিতা মাতা আপনাদিগের শিশুসন্তান ভক্ষণ করিতে লাগিল। মানুষ পিশাচ হইয়া গেল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় মানুষ মানুষকে হত্যা করিয়া নরমাংসে উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মহা-মারী আসিয়া জুটীল; বাংলা দেশ প্রেতের লীলাভূমি হইল। এই বিবরণ একবারে অতি রঞ্জিত ও অসত্য নহে। বাংলার ইতিহাসে ইহা অশ্রু তরল কজ্জল মসীতে লিখিত।

[ওয়ারেন হেষ্টিংস ও বাংলার নবাব।]

ঘটনা, কোর্ট-অব-ডিরেক্টরগণের গোচরে আসিল। আর অবহেলা করিলে চলে না। ভীমকর্ম্মা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বাংলার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। বাংলার দুর্দ্দসার জন্য হেষ্টিংস রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে দায়ী করিলেন। তাঁহাদিগের বিচার হইল, বিচারে নির্দ্দোষী প্রমাণ হওয়াতে তাঁহারা মুক্তি পাই-লেন কিন্তু স্বপদ হইতে বিতাড়িত হইলেন। নিজামুদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সৈয়ফ-উদ্দৌলা ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুবারক উদ্দৌলা যথাক্রমে বাংলার নবাব নাজিমের পদ প্রাপ্ত হন। বার্ষিক ষোললক্ষ মুদ্রা বৃত্তি লইয়া মুবারক রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। নিজামৎ কোম্পানির হাতে গেল। সাহ আলমের বৃত্তি পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ হেষ্টিং-সের শাসনকালে কোম্পানী বাংলার দেওয়ানি, নিজামৎ ও সাম-রিক বিভাগের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিলেন। এই সকল পদে ইং-রাজ কর্ম্মচারী ও দেশীয় সহকারী নিযুক্ত হইল। বাংলাদেশ ইংরাজের হইয়াগেল। ইহাই বঙ্গে ইংরাজ অধিকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এরূপ ঘটনা পৃথিবীর কুত্রাপি আর কখনও ঘটীয়াছে কি না পুরাবৃত্ত সে বিষয়ে নীরব।

শ্রীঅনুপমচন্দ্র রায়।

ছায়া পথ ।

ওগো ছায়াপথ !

পরিয়া মন্দার মালা, বুঝি সুরপুর বালা,

এই পথ দিয়ে যায় গাহিবারে গীতি,

মঞ্জীর মুখর পদে, দেখ বুঝি নিতি,

এই পথে যায় চলে বাসবের রথ,

তারকা রতন ছাওয়া ওগো ছায়া পথ !

২

ওগো ছায়াপথ !

হোথা বসি' কত কাল নিরখ' মেদিনী,

কত যুগ যুগান্তর, বিরাজিছ নভোপর,

হেরিছ সরসে হাসে ফুল্ল কুমুদিনী,

প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি মলিনা নলিনী !

কত বর্ষ দেখিতেছ এমর জগৎ

নিত্য পরিবর্ত্তশীল ; ওগো ছায়া পথ !

৩

ওগো ছায়াপথ !

দেখেছ কি রঘুনাথে অতীত ত্রেতায়,

মধুর দণ্ডক বনে, অথবা অনুজ সনে

খুঁজিছেন চারুচন্দ্রমুখী বনিতায়

শুনেছ কি, ফিরে যেতে যেতে অযোধ্যায়,

বলিছেন তাঁরে চাহি হাসিয়া ঈষৎ

"হের প্রিয়ে, সেতু মম যেন ছায়া পথ !"

৪

ওগো ছায়াপথ !

রূপসী উর্ব্বশী যবে, রতন নূপুর রবে,

মুখরিয়া সুরপুরী যেতে ছিল চলি",
তার পায়ে অর্জ্জুনেরে নোয়াইবে বলি',
দেখেছ সে পদক্ষেপ, নৃত্যভঙ্গী বং
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সাক্ষী ছায়াপথ !

৫

কি ভঙ্গীতে নীলাম্বর প্রতি অঙ্গ ঘিরে !
যেতে এই পথ বেয়ে কি গান উঠিল গেয়ে
"রিনিকি ঝিনিকি" তার চরণ মঞ্জীরে,
রতন সম্ভবাবিভা বেষ্টি' রূপসীরে
গরবে ভাবিতেছিল, "কে হেন মহৎ
উপেক্ষিতে পারে রূপ !" ওগো ছায়াপথ !

৬

তুমি কিগো দেখে ছিলে ঐ খানে বসি,
যবে জিতেন্দ্রিয় বীর প্রণমিয়া নত শির,
মাতৃ সম্ভাষণ করি ফিরা'ল উর্ব্বশী,
কি তীব্র সরম তা'র উঠিল উচ্ছসি'
প্রতি পদ ক্ষেপে ! হায় ব্যর্থ মনোরথ
রূপসীরে দেখেছিলে ? ওগো ছায়াপথ !
যুগ যুগান্তের স্মৃতি উজ্জ্বল বিশদ,
ও বরাঙ্গে অঙ্কিত কি আছে ছায়াপথ !

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

চিরবিচ্ছেদে।

আমি তারে ভাল বাসতাম। সে আমার কেহ ছিল না,—আত্মীয়মাত্র। সে যেতে যেতে আমায় যেখানে কার্য্যক্ষেত্র হ'তে বিশ্রামের জন্য হাঁফ ফেলতে দাঁড়াতে হ'ত, ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে পড়ে সে সেইখানে এসে উপস্থিত হ'ত। দুদিনের মাত্র দেখা,

কিন্তু কি যেন এক অজানা—গভীর আকর্ষণ, তার সেই হৃদয়ের দিকে আমার শুষ্কপ্রাণ টেনে এনে, আমার মধ্যে স্বর্গীয় পবিত্র চিত্তবৃত্তিগুলি সজাগ করে তোলে।

একজন একজনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছি, এমনি করে ডুব খেয়ে খেয়ে ভাবছি—কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে? যতদূর সম্ভব একজন একজনকে কাছে রাখ্‌ছি—এমনি সময় তার ডাক পড়ল। সে ছিল তখন অনেক দূরে, সেখান থেকে ভগবানের তলবে হাজির হ'তে চলে গেল। যাবার আগে আমায় সে জানা-বার সময় পায়নি;—গেলে পর অপরের লিপি বল্‌তে এল আমায় এক অতি সহজ কথা—সে আর নাই, মরেছে। আমি বুঝ্‌তে পার-লাম না; পত্রখানি বড় অসংলগ্ন বোধ হল। অনেকক্ষণ চক্ষে জল এল না, ক্রমে বাত্যা উঠ্‌ল না, হৃদয়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি অনুভব করলাম না—শুধু ভাব্‌তে লাগলাম, বুঝ্‌তে চেষ্টা করলাম, —এর মানে কি? ক্রমে পা দুখানি দেহভার বহনে অসমর্থ দেখিয়ে জানিয়ে দিলে, এ বার্ত্তার গুরুত্ব আছে। তবু বিশেষ কিছু অনুভব কর্‌লাম না; মন্ত্রচালিত হ'য়ে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ব'সে পড়লাম। দেখ্‌লাম, কিছু ভাবান্তর হয়েছে বটে—বুকের মধ্যে গুরুতর যন্ত্রণা, চক্ষে অযাচিত জল। জানলাম না কেন এ জল আমার নয়নে, কেন এ যন্ত্রণা আমার বুকে—ভাবলাম, সেকি কখন যেতে পারে, না বলে আমায় ছেড়ে যাবে? হতভাগ্য নর, তখনও দর্প!

অনেক চিন্তায় স্থির করলাম, এতার অভিমান—সে ত কখন আমায় কাঁদায় নি; তবু হ'তে পারে—অভিমান। ভাবলাম—কে যুক্তি দিল জানি না—তার আত্মা এখন মুক্ত, অতএব নিশ্চয়ই আমার খুব কাছে কাছে আছে। কার্য্যক্ষেত্র হ'তে রাত্রে নির্জ্জন বিশ্রামাগারে এসে বিনিদ্র নয়নে তার অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম—যদি সে আসে। আস্‌তে দেরী হতে লাগ্‌ল, নিশ্চেষ্টতা অসহনীয় হ'ল—দ্বারমুক্ত করে বাইরে গেলাম; সুদূর প্রান্তরের নির্জ্জন শান্ত বৃহৎ বাড়ীটা জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে আমায় ব্যর্থ দেখে হাস্‌ছে,—

দেখ্‌তে পেলাম—কিন্তু, তারে দেখলাম না। সারাটী রাত এম্নি করে তারই জন্য ঘরে বাহিরে অপেক্ষা করলাম; না,—এ তার গুরুতর অভূতপূর্ব্ব অভিমান—সে এল না। প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল,—এ সময় বুকের দুঃসহ বেদনা, নয়নের অবিরল অশ্রু ভাল লাগল না—তাকেই পাচ্ছি না, কার কাছে কাঁদি, কার কাছে বুকের বেদনা জানাই?

পরদিন কার্য্যক্ষেত্র হতে কোনক্রমে ক্ষণিকের অবসর চেয়ে নিয়ে, তার স্নেহের কেন্দ্রক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'লাম—দেখ্‌তে,—তাকে সেখানে পাই কিনা। কত বিনিদ্র রজনী, গুরুভার দিবস তার অতি-প্রিয় স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে এলাম। তবু তার দেখা-পেলাম না। তার অতিপ্রিয় বাল্যসুহৃদের কাছে গেলাম, একটু ভাগাভাগির জন্য; বোধ হয়, তার হৃদয়ের ঋড় সে মনেই রাখ্‌লে—আমার কাছ হ'তে সরে গেল। তার বাপমার নিকট গেলাম—দেখলাম, প্রতিদিনি যেমন সূর্য্য উঠে প্রভাত হয়, তেমনি তাঁরাও কাঁদেন—কাজকর্ম্ম করেন—আবার দিন যায়, দিন আসে। সংসার সেই পুরাতন নিয়মে পুরাতন ভাবেই চলেছে—তার স্থান, তার অভাব আপনি পুরছে, কেউ তার জন্য ব্যস্ত নয়—সে ক্রমশঃ বিস্মৃতি সাগরে ডুবে স্বজনের মন হতে সরে পড়ছে।

নিজের পানে চেয়ে দেখলাম হৃদয়ে দুঃসহ দাহ—কার জন্য? সংসার তারে ভুল্‌তে বসেছে, আমার ব্যাকুল হৃদয় তার কাছে যেতে ব্যর্থ প্রয়াস করছে। ভাবলাম সে কি আমায় শুনছে না? যখন বিদেশে—সহস্রার্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে বাস করতাম, তখন ত' মনোভাব-বিনিময়ের সম্বল ছিল আমাদের লিপি। কিন্তু, আজ কি মানব বুদ্ধি সুলভ এমন কিছু নাই, যা' অবলম্বন করে পরজগতের আমার এই অতিপ্রিয় হৃদয়টী দেখি—কেবল মাত্র দেখি, সে কেমন আছে—সে সুখী, কি দুঃখী? "প্ল্যাঞ্চেট" আমায় প্রতারণা করলে, তার দর্শনলোলুপ হয়ে নিশা ভ্রমণ আমায় ব্যর্থমনোরথ করলে। এখন কি নয়নের জল হৃদয়ের বেদনা আমার সম্বল হবে? সখ্য, বন্ধুর স্নেহ—যা' পবিত্র

হস্নে মাতৃস্নেহ হ'তেও স্নিগ্ধ ও মধুর—তা'কি মাত্র এ জগতের? তার এত ভালবাসা—সে কি আমার স্মৃতি এ জগতেই অসার দেহের ন্যায় ত্যাগ করে গেল? ত্যাগ করে গেল, আর জ্বালিয়ে গেল এক অগ্নিকুণ্ড!

মনকে প্রবোধ দিব এমন ত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। একি মাত্র এ জীবনের দাহ না পরজীবনেও বইতে হবে? একটা গভীর নিরাশা, একটা পৌরুষহীন উৎসাহহীন বিশ্বাস—কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবন নিয়ে, বুকের বেদনা সম্বল করে এ জীবন কাটাতে হবে? ঈশ্বরের ব্যবস্থা মনে করে, এ কঠিন শাস্তির অর্থ না বুঝলেও—মাথা পেতে নিচ্চি—কিন্তু, এই দৈন্য, নৈরাশ্য অন্তর্বেদনার মধ্যে একটীবার যদি জানতাম যে সে এখনও আমায় মনে করে—ভালবাসা শুধু এ জগতের নয়!—

* * * * *

প্রভো! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

শ্রীঅনাথনাথ চৌধুরী।

বসন্তে।

বসন্ত লো আসিয়াছে বুঝি,
পাখী গেয়ে দেয় সমাচার;
ধরা তাই ফুলদল দিয়ে
বুকে পাতে আসন তাহার!
দখিনা সে বহে ঝুরু ঝুরু,
স্বপ্ন রচে নিখিল নয়ানে;
নভ ধরা এক হ'য়ে গেছে
বসন্তের একখানি গানে!

আমি হায় কোথায় পালাব
লয়ে প্রাণ ব্যথা পরিপূর?
লাজে মরি, গান গাহিব কি?
বাঁশীতে যে বাজেনাক সুর!
নিখিল বাঁশরী খানি আজি
ধরিয়াছে পুলকের গান;
আমি ওলো মূক, নত আঁখি,
সভা মাঝে একি অপমান!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

সেবাব্রত শশিপদ।

বরাহনগর কলিকাতা হইতে এক মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তটস্থিত একটী সহর। ইহা হিন্দু বিধবাদের আশ্রম এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদের প্রথম শিক্ষানিবাস বলিয়া বিখ্যাত। এই স্কুল পণ্ডিতা রমা বাই কর্ত্তৃক স্থাপিত পশ্চিম ভারতের বিধবা আশ্রমের অনুরূপ। এই স্কুলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শশিপদবন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার উপনয়নের অব্যবহিত পর হইতেই চারিদিক হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব ও অনুরোধ আসিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শৈশবে বিবাহ করিয়া একটী বিধবা বালিকাপত্নী রাখিয়া পরলোক চলিয়া যান। বিধবা বালিকা পুত্র বধুর শোকে শশিপদের মাতা এত আঘাত পাইয়া ছিলেন যে পাছে বাল্য বিবাহ দিলে শশিপদেরও অকালমৃত্যু হয় এবং তাঁহার বিধবা পত্নী সংসারের দুঃখের আর একটী কারণ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শশিপদের বিবাহ দিবেন না এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন; নানারূপ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার এই সঙ্কল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অবশেষে ভোলানাথ ঘোষাল নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া শশিপদের মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং করপুটে, অত্যন্ত দীন ভাবে আবেদন করিলেন যে তাঁহার কন্যার বয়স প্রচলিত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিবাহ যোগ্য বয়সের অধিক হইতে চলিয়াছে, সুতরাং এই অরক্ষনীয়া কন্যাকে আর ঘরে রাখিলে সমাজের নিকট তাঁহার মস্তক হেঁট হইবে। তাহাতেও রাজী না হওয়ায় ভোলানাথ একেবারে হত্যা দিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার অকপট প্রার্থনা শশিপদের মাতার হৃদয়স্পর্শী হইয়া তাঁহার মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। দয়ার্দ্র হইয়া তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন। এবং ভোলানাথের অবস্থা খারাপ জানিয়া সমাজে প্রচলিত কৌলীন্য প্রথানুযায়ী কন্যাপণের দাবীও কমাইয়া দিলেন। তখনকার দিনে উচিৎ দাবী ত্যাগকরা খুব উন্নত-

মন এবং সহৃদয়তার পরিচায়ক। বাস্তবিক তিনি তাঁহার সময়ের অন্য ভদ্রমহিলাদের চেয়ে অত্যধিক উদার ও উন্নত মনা ছিলেন। অধিকন্তু তিনি ছেলের মনের ভাব জানিবার জন্য বিবাহের পূর্ব্বে যাহাতে শশিপদ তাহার ভাবী স্ত্রীকে দেখিতে পারেন এবং ঐ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারেন সেরূপ সুযোগ দিয়াছিলেন। ইহা ও তাঁহার খুব মানসিক শক্তির পরিচায়ক কারণ তৎকালে ঘটকের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া বর কন্যার বিবাহ হইত! সেই প্রথার বিরোধী হইলে সমাজে একটু অদ্ভুৎ দেখাইত।

শশিপদের বিবাহের পর প্রথম বৎসর তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় বৎসর (১৮৬১ সালে) তিনি তাঁহার শ্বশুর আলয়ে বাস করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই শশিপদ তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী চির সহচরী মূর্খ অনক্ষর থাকিবেন এই ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। বিশেষ ইংরেজী শিক্ষার ফলে তিনি দেশের অনেকগুলি কুসংস্কার ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন। এবং স্ত্রীও অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার জীবনে উচ্চাশা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতায় সমদর্শিনী হইতে পারিবেন না এই চিন্তা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন হয় শিক্ষিত হইয়া তাঁহাকেই তাঁহার অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে অশিক্ষিতের ন্যায় চলিতে হইবে অথবা তাঁহার স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাঁহার পত্নী স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। পৌত্তলিকতা এবং ধর্ম্মজ্ঞানে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। অনেক চেষ্টা, অনুনয় বিনয়ের পর তিনি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হইলেন। ১৮৬১ সালের শেষভাগে তিনি প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বেশ উন্নতিলাভ করেন। তাঁহার শিক্ষায় ক্ষিপ্রতা দেখিয়া তাঁহার বিধবা জাও শিক্ষালাভের জন্য লালায়িত হইলেন এবং বর্ণ পরিচয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। শশিপদের স্কুলের প্রথম ছাত্রী এই দুইজন। ক্রমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শিক্ষা

গ্রহণোপযোগী হইলে তাহাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এই স্কুলই বরাহনগরের স্ত্রীশিক্ষার প্রথম স্কুল হইল। শশিপদের স্ত্রী যখন ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণের উপযোগী হইলেন তখন তিনি তাহাদের জন্য এবং বয়স্থা স্ত্রীদের জন্য দুইটী বিভিন্ন শ্রেণী খুলিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার বাড়ীর ত্রিসীমানায়ই এই শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ক্রমে পাড়ার অন্যান্য বালিকা ও বয়স্কা মহিলাগণ ঐ স্কুলে যোগ দিতে লাগিলেন।

শশিপদ যখন তাঁহার স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন তখন পাড়ায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কারণ তখনকার দিনে স্ত্রীর সঙ্গে দিনের বেলায় দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ করায় দোষ স্পর্শিত। এবং এই সামাজিক দোষের জন্য শশিপদ এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়কেই সমাজের হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক দৃঢ়তার সহিত এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি স্বীয় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ফলে পাড়ার বয়স্থা স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার স্ত্রীর নিকট আসিতে লাগিলেন।

"দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং আত্মসমর্পণে অনেক বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" পূর্ব্বে পাড়ার যেসব লোক এই স্কুল সম্বন্ধে তীব্র শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা করিতেন ক্রমে তাঁহারা ইহার শুভানুধ্যায়ী হইয়া উঠিলেন। পাড়ার বর্ষীয়সী লোকেরা যখন কঠিন বানান গুলি শিক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত তাহা দেখিলে মনে এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইত। স্বল্পকাল মধ্যেই সকলে হাতে পুস্তক লইয়া শশিপদ ও তাঁহার স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। এই প্রকারে বরাহনগরের প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বর্ষীয়সী এবং প্রধানতঃ বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ শিক্ষা গোপনে অন্দর মহলেই দেওয়া হইত। সুতরাং কাহারও লজ্জাশীলতার হানি হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। ক্রমে অতঃপর সর্ব্বসাধারণ স্ত্রীলোকদের জন্য প্রকাশ্য স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ছাত্রীগণ স্কুলে

মাদুরে বসিয়া পড়াশুনা করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে বসিবার আসন ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া ৺দীননাথ নন্দী মহাশয়ের পূজাদালানে ঐ পাঠশালা আরম্ভ হইল। শশিপদ নিজে উপরের শ্রেণীর শিক্ষার ভার নিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী এবং ভ্রাতৃজায়া নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শশিপদের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন নূতন বিশ্বাস স্থান পাইতে লাগিল। জাতিভেদের এবং পৌত্তলিকতার উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পরিল। তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। সুতরাং জাতীয়তার ভিত্তির মূল হইতে এই সর্ব্বনাশী জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা যাহাতে অচিরে তিরোহিত হইতে পারে তৎপ্রতি কৃতসংকল্প হইলেন এবং জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। জাতীয়-ধ্বংশের এই দুইটীই প্রধানতম কারণ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই সময় কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি কল্পে সংগ্রাম করিতেছিলেন। একদা শ্রীগোপাল মল্লিক মহা-শয়ের বাড়ীতে কেশব বাবুর এক বক্তৃতায় শশিপদ উপস্থিত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা তিনি এতই আকৃষ্ট হন যে অতঃপর তাঁহার ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় গুপ্ত বিশ্বাস ব্যক্ত হইয়া পড়িল এবং তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বিশ্বাস জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন।

এই কার্য্যের পর তাঁহার পরীক্ষা এবং বাধা বিঘ্ন আরম্ভ হইল। তিনি উপবীত ত্যাগ করিলেন; তন্নিবন্ধন বাড়ীতে এবং তাঁহার গ্রামে ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রতিবেশগণ তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীকে নানারূপ বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এই নির্য্যাতনে তাঁহার হৃদয়ের বল এবং দৃঢ়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাঁহার স্কুলটীর অত্যন্ত ক্ষতি হইল; স্কুলের সমস্ত ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করিল এবং স্কুলের জন্য যে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন তাহাকেও প্রতিবেশিগণ নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। সেই দিনই শশিপদ কলিতাতা হইতে স্কুলের

জন্য অন্য একটী শিক্ষক আনিলেন। প্রতিবেশিগণ তখন যে বাড়ীতে স্কুল হইতেছিল সেই বাড়ীওয়ালাকে বলিয়া তথা হইতে স্কুল উঠাইয়া দিল। কিন্তু শশিপদ এত দৃঢ় ভাবে ঐ স্কুলের উন্নতি ও রক্ষা কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে বাধ্য হইয়া এক বৎসরের কবুল লিখাইয়া এক ভদ্রমহিলার নিকট হইতে তিনি একটী ঘর ভাড়া নিলেন এবং তথায় তাঁহার স্কুলের আসবাব পত্র স্থানান্তরিত করিলেন। স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী জমীদারের সাহায্যে ঐ বাড়ী হইতে পাঠশালা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আইনতঃ তাহা পারিলেন না। তৎপর কেহ যাহাতে স্কুলে কাহারো বাড়ীর মেয়ে না পাঠান সে জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় সংকল্পের নিকট সবই পরাভূত হইল। ১৮৬৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর ঐ স্কুলের প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরিত হয়। Presidency collegeএর professor Lobb সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রীর সংখ্যা তখন ৫৭জন Mr. Tudor Trevor নামক একজন শিক্ষিত ইউরোপীয়ান তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই স্কুলের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে —দুষ্ট, মূর্খ ও সংকীর্ণ মনা লোকদিগের শত সহস্র প্রকারের অমানুষিক অত্যাচারও শশিপদকে সংকল্প চ্যুত করিতে পারে নাই। ভারতের শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে এইরূপ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। সামাজিক ও শিক্ষা ব্যাপারে যে স্ত্রী লোকের ও পুরুষের সমান অধিকার আছে তাহা শশিপদই প্রথম দেখাইতে চেষ্টা করেন। তৎপর Miss Carpenter এর সহিৎ তাঁহার পরিবারের পরিচয় হয়। এবং তাঁহার সঙ্গে শশিপদের পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্টতা জন্মে। তৎপর Miss Carpenter এবং অন্যান্য কয়েক জন সাহেবের সাহায্যে শশিপদ আরও দুইটী শাখা স্কুল স্থাপিত করেন। এমন সময় তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। যিনি তাঁহার সঙ্গে একযোগে ঐ স্কুলের ও স্ত্রী শিক্ষার জন্য এত কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হ'ন।

অতঃপর তিনি Bengal Female Boarding School এর একটী বিধবা মেয়েকে বিবাহ করেন।

১৮৮৬ সালে শশিপদের স্কুলের অনেক European শুভানুধ্যায়ী জোটেন এবং তাঁহার স্কুলের নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। ঐ স্কুলে শশিপদ ও তাহার স্ত্রীর সাহায্যে বোর্ডিং হাউস প্রস্তুত হইল। অনেক বিধবা ইঁহাদের নিকট অপত্য স্নেহে সাহায্য ও শিক্ষা পাইয়াছেন। Indian Magazine নামক ইংরেজ পরিচালিত সংবাদ পত্রে ও Sir Stewart Bayleyর প্রমুখাৎ বহু বহু প্রসংশা পত্র শশিপদের নিকট আসিতে লাগিল।

Sir Stewart Bayley তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনার দেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিধবার দুঃখ লাঘব করিবার জন্য অদম্য চেষ্টার সম্বন্ধে আমার প্রশংসা বাহুল্য মাত্র। আমি এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শুধু আপনাকে এই বলিতে চাই যে আপনার এই মহৎ কার্য্যে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আপনার এত সময়, অর্থ, উৎসাহ ইহাতে ব্যয় করিয়া অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার নিস্বার্থ চেষ্টা যে এখন এমন ফলবতী হইয়াছে ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে আপনার স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।"

"অনলস হইয়া নিস্বার্থ প্রাণে বীরের ন্যায় অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিলে তাহার সুফল স্বয়ং ঈশ্বর নিজ হাতে অর্পণ করেন"। শশিপদের কর্ম্ম সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ে মানুষ মাত্রেরই সগৌরবে অনুকরণীয়।

আজ "দেবালয়" সকলেরই পরিচিত। ইহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ইহার উদ্দেশ্য। এই মহান্ অনুষ্ঠানের স্থাপন কর্ত্তা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবা তাঁহার জীবনের ব্রত; এই ব্রত আমাদের দেশবাসীর জীবনে আদর্শ হওয়া উচিত।

রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ ধর্ম্ম।"

সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় বর্ষ] মাঘ, ১৩১৯ [১০ম সংখ্যা।

গান।

বাহার মিশ্র—একতালা।

আর কত দিন কলুষ মলিন ছায়ায় ভুলিয়া থাকিব।
কবে জীবনে মরণে আপনার জেনে তোমারে শুধু ডাকিব
নাথ! হৃদয় ভরিয়া ডাকিব॥
কবে বুঝিব যশোধন মান, সকলি মিথ্যা সকলি ভাণ,
উপেখি তব সকল দান, চরণ শুধু চাহিব॥
কবে ভুলিয়া সকল অসার শিক্ষা, লইব পুণ্য প্রেমের দীক্ষা,
তব শ্রীচরণ রেণু ভিক্ষা, প্রণত শিরে মাগিব॥
কবে উজ্জ্বল তব রাজ আসন হেরিব হৃদয়ে রাজে.
তুমি নির্ম্মল করে টানিয়া আমারে লইবে তোমার কাজে,
মত্ত মম বাসনা রাশি, তব পদ তলে লুটিবে আসি,
আমি আনন্দ সাগরে ভাসি, গৌরব তব গাহিব॥

শ্রীকামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য

সেকালের চিত্র।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-কিশোরগঞ্জে।

কিশোরগঞ্জের অবস্থা যখন এইরূপ তখন মহাত্মাবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। প্রচারক ও প্রচারকার্য্য কাহাকে বলে তাহা কেহ জানিত না। বাবু রামশঙ্কর সেন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন করিয়া আপন বাসায় রাখিলেন এবং স্কুল ঘরে একটা বক্তৃতার আয়োজন করাইয়া দিলেন।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানী আসিয়াছে -- সে এক ঈশ্বর সম্বন্ধে ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবে এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল। মফঃস্বলের একটী ভদ্র লোক মোকদ্দমার কার্য্য উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন "কি ভায়া! তোমাদের তো একজন আসিয়াছে—কি জানি বলে?" আমি বলিলাম "দাদা! একবার সেই বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, মনের অন্ধকার সব ঘুচিয়া যাইবে", তখনই আবার মনে মনে ভয় করিয়া বলিলাম "না আপনাদের মনের অন্ধকার যেরূপ গভীর তাহা কি ঘুচিবে? যাহা হউক তথাপি বক্তৃতা শুনিতে অবশ্য অবশ্য যাইবেন।"

বক্তৃতা হইল; প্রকাণ্ড স্কুল ঘর ভরিয়া লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া ছিল, সকলে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় নীরবে সেই বক্তৃতা শুনিল। তেমন সুমিষ্ট বিশুদ্ধ ভাষা ইতি পূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই; একটা লোক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া কোন কাগজ বা পুঁথি পত্র না দেখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে এমনও আর কোথাও দেখি নাই। আমরা-তো শ্রদ্ধা সহকারে, আশান্বিত হৃদয়ে শুনিতে গিয়াছিলাম আমাদের ভাল লাগিবারই কথা, বিরুদ্ধ মত লইয়া যাহারা গিয়াছিল তাহারাও বক্তার যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রানুমোদিত উক্তি সকল শুনিয়া মনে মনে পরাস্ত না হইয়া পারিল না।

সভা সমিতি ও তাহার নিয়ম প্রণালী তখন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই। রামশঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিজাশঙ্কর সেন, যিনি পরে

ব্যারিষ্টার হইয়া ছিলেন, তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেন। তিনি বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় উপবেশন করিবা মাত্র, হেড মাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "আমি প্রস্তাব করি বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে দূর দেশ হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এরূপে বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।" তখন উক্ত গিরিজা বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন 'আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করি।" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন "আমি প্রস্তাবককে বল্‌ছি গো, আমি ধন্যবাদ পাবার জন্য এখানে বক্তৃতা কর্ত্তে আসি নাই,যাহা সত্য যাহা ধর্ম্ম তাহা লোক সমাজে প্রচার করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য বোধ ক'রে আমি এখানে এসে যা কিছু বলেছি তার জন্য ধন্যবাদ চাইনে।" তখন মাষ্টার মহাশয় ও গিরিজা বাবু মনে করিলেন "যা কি গুরুতর অপরাধই বা করিয়া ফেলিয়াছি।" তাঁহারা এসব নিয়ম কিছুই জানেন না এই মর্ম্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন বক্তৃতার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমার সেই ভদ্রলোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি দাদা, কেমন শুনলে?" তিনি উত্তর করিলেন "না ভাই আর কিছু বলবার নাই, বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে।"

কাছারীতে যশোদল নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা রামশঙ্কর বাবুকে বলিলেন যে এমন সুন্দর বক্তৃতা হইল অথচ তাঁহাদিগকে তাহা শুনিতে দেওয়া হইল না কেন? যশোদল ব্যবসায়ী-গুরু, গোস্বামী ও ভট্টাচার্য্য দিগের বাসস্থল। সে গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগ্রহান্বিত হইয়া বিজয় বাবুর বক্তৃতা শুনিতে চান দেখিয়া রামশঙ্কর বাবু আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই দিনই চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সকলকে সংবাদ দিয়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। কাছারী ও স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হইল। সন্ধ্যার পর বক্তৃতা হইল তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, বক্তৃতা সুদীর্ঘ এবং হৃদয় গ্রাহী হইয়া ছিল।

কিশোরগঞ্জ টাউনের মধ্যে কাটাখালি গ্রামে প্রামাণিকদিগের বাস। তাহাদের বাড়ীতে একুশ রত্ন প্রভৃতি মঠমন্দির দেখিবার জিনিস ছিল এবং সেই প্রামাণিকদিগের বিবরণ ইতিহাসের বিষয় ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই প্রামাণিকদিগের বাড়ীখানা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। রামশঙ্কর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারকনাথসেন, স্কুলের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এক বাসায়ই থাকিতেন, তিনি বিজয় বাবুর সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে প্রামাণিকের বাড়ী দেখাইতে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পরিধানে একখানা সামান্য থানের ধুতি হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়াছে, গা'য় একখানা সামান্য-চাদর আর কিছু নাই। দাড়ি গোঁফ কামান, পায় জুতা নাই। এই সাত্বিক বেশে সাধু পুরুষ হাঁটিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পথ প্রদর্শক তারক বাবু একটী পূরা সাহেব, তিনি কোট প্যাণ্ট পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। রামশঙ্কর বাবু কাছারীতে বসিয়া তাহা দেখিলেন এবং উঁহারা কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ছুটিয়া স্কুল ঘরে গেলেন, যাইয়া হেড-মাষ্টার মহেশ বাবুকে বলিলেন "উঁনি হাঁটিয়া যাইতেছেন—তারক ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে এটা ভাল দেখায় না, তোমরা কেহ হাঁটিয়া তাঁহার সঙ্গে যাও।" গিরিজা শঙ্কর তখন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, পিতার ঐ কথা শুনিয়া "Uncle return, Uncle return" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তারক বাবুকে ফিরাইলেন। তারকবাবু সকল কথা শুনিয়া ঘোড়া রাখিয়া নিজেই হাঁটিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে গেলেন এবং সকল দেখাইলেন।

প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কার্য্য করিয়া কিশোর-গঞ্জ হইতে চলিয়া গেলে সেখানে নূতন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠন বা তাহার সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি এমন কিছুই হইল না কিন্তু হিন্দুসমাজ চঞ্চল এবং স্থানে স্থানে নানা আন্দোলনে আলোড়িত হইতে লাগিল। বিজয় বাবুর বক্তৃতা ও জীবন্ত দীষ্টান্তে ময়মনসিংহ নগরে যে আন্দোলন ও উত্তেজনা উপস্থিত করিয়াছিল সে সকল সংবাদ ক্রমে কিশোরগঞ্জে পঁহুছিল এবং তার পর সাক্ষাৎকারে তাঁহার বক্তৃতায় যাহা শুনা গেল

এবং বিপ্লব ও পরিবর্ত্তণের দিকে যুবকদিগের যেরূপ আকর্ষণ দেখা গেল তাহাতে হিন্দুসমাজকে টলমলায়মান করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শুনিলেন ময়মনসিংহে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতেছে সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাদেরও একটা কিছু করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিশোরগঞ্জ নগরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রশস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গনযুক্ত একটী সুন্দর আখড়া আছে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুগণ মিলিয়া সেই আখড়ায় এক সভা করিলেন। গৌরচন্দ্র পাঠক নামে সেথানকার একজন টোলের পণ্ডিত সেক্রেটারী রামশঙ্করবাবুর নিয়োগক্রমে আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা পড়াইতেন। এই উপলক্ষে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক প্রভৃতি নূতন সভ্যসমাজের সঙ্গে পাঠক মহাশয়ের মেশামেশি হইত। তিনি জামা গায় দিয়া এবং নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে যাইতেন। উল্লিখিত আখড়ার সভাতে উক্ত পাঠক মহাশয়ও গিয়াছিলেন।

জনৈক পণ্ডিত পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "গৌরচন্দ্র, বল তো ব্রহ্মজ্ঞানীরা কি বলে?" তিনি উত্তর করিলেন "তাহারা বলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই মানুষ ও এক ঈশ্বরের সন্তান সুতরাং সকলেই সমান।"

পণ্ডিত—বল কি গৌরচন্দ্র, তাহারা এত বড় কথাই বলে?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ, ওরা আরও অনেক বড় বড় কথা বলে।

পণ্ডিত—না, তা কেন হইবে? ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সেইজন্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আর ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে শূদ্রের উদ্ভব তাই শূদ্র নিকৃষ্ট।

পাঠক—তাহারা বলিবে "আমরা এই যুক্তি মানিনা।"

পণ্ডিত—কি বলিলে গৌরচন্দ্র, তাহারা এই কথাই বলিবে যে "শাস্ত্র মানিনা"?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ; তাহারা এইরূপই বলিবে।

পণ্ডিত—তখন ধরিয়া দিব এই বেদ খানা।

পাঠক—তোমার বেদ মানি না।

পণ্ডিত—আরে ও গৌরচন্দ্র বলিস্ কি? তাহারা কি এই কথাই বলিবে যে 'বেদ মানিনা?'

পাঠক—হাঁ।

পণ্ডিত—বেদ মান না? তবে মান কি আমার।—এই বলিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন।

এই ভাবে তাঁহাদের আপনাদের মধ্যেই নানারূপ বাদানুবাদ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, কিছুই অবধারিত হইল না। প্রাচীন দিগের মধ্যে অনেকেই, "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা, ঘোরকলি উপস্থিত, আর কিছুই থাকিবে না," ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বায়ু ও দীপ।

বায়ু গর্জ্জি কহে, "দীপ, নিবাই তোমায়?"
দীপ বলে, "বিন্দু মাত্র খেদ নাহি তায়।
দুঃখ শুধু, গৃহস্থের গৃহ দীনতম,
দগ্ধ করে যবে সখে, লোল জিহ্বা মম,
সে প্রবল দাহনের তুমিই সহায়,
আজি ক্ষীণ দীপ্ত আমি, নিবাও আমায়।"
বায়ু কয়, "জগতের এই ত নিয়ম,
প্রকাশে দীনের কাছে যত পরাক্রম,
গৃহদাহে আমি তব সহায় প্রবল,
নিবাই যখন তুমি গৃহীর সম্বল!"

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

ফ্যান্সী চিন্তা।

আজ ফ্যান্সীর সাহায্যে স্ত্রীপুরুষ-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব; হয়ত বিঁধিবে না, তবু ফ্যান্সীকে ধারাইতে ছাড়িব কেন? অনেক দিনের অব্যবহারে ফ্যান্সী ভোঁতা হইয়া গিয়াছে; তীক্ষ্মমুখ সরু শরের মত হইয়া তাহা যদি না বিঁধে, অন্ততঃ বৃহৎকায় কুড়ুলের মত ভেদিবে ত, অর্থাৎ চলিত কথায় বলিতে গেলে, ধারে না কাটিলেও ভারে কাটিবে।

জগতে আদৌ স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি কেন এ জিজ্ঞাসা প্রত্যেক ফ্যান্সী চিন্তকের মনে জীবনে একবার না একবার আসিবেই। উত্তরে মনের প্রাকৃতদিকটা কিছুমাত্র ভাবিবার সময় না লইয়া বলিয়া উঠিবে,—স্ত্রীপুরুষ রহস্যের মূল কথা সৃষ্টি রক্ষা। জগতে একাকার হইতেই প্রভেদের সৃষ্টি। স্ত্রী পুরুষেরও একটা একাকারের যুগ গিয়াছে; আদিমকালের Hepmaphrodite সম্প্রদায়ই সেই যুগের প্রতিনিধি। সেগুলি স্ত্রীপুরুষকে এক করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট ছিল। তারপর কোথা হইতে একটা ব্যক্তিত্বের নেশা আসিয়া একাধি স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করিয়া দিল। কি উদ্ভিদ কি জীবজগতে সকলই ভাবিল পৃথক হইয়াই বুঝি সুখ, একটা বিভিন্ন বৃত্তির দেহভার আর কেন বহন করিয়া মরি, জীবন সংগ্রামে এখন লঘু হইয়া আপন মনে যথা-ইচ্ছা এখন বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিব, আমাকে আর এখন পায় কে? কিন্তু উল্টা বুঝিলি রাম! হে জগতের নরনারীগণ, পৃথক অস্তিত্ব লইয়া এখন তোমাদের সুখ কোথায়? এখন যে আবার মিলনের জন্য আকুল হইয়া ফিরিতেছ। এই যে বিশ্বব্যাপী বিরহের হাহাকার উঠিয়াছে তাহার নিবৃত্তি কোথায়? এই তৃষাদীর্ণ চাতকের কণ্ঠে কোনো দিক দিয়াই ত প্রেমবারি বর্ষিত হইতেছে না! লঘু দেহের চঞ্চনৃত্যে কোথায় গিয়া পড়িয়াছ, প্রিয়-মিলনের নান্দীও ত কোথাও বাজিয়া উঠিতেছে না। চির-বিরহের যমুনা ভিতর দিক বহিয়া চলিয়াছে, এ পারে ওপারে বসিয়া ডাক ছাড়িয়া

কাঁদা ছাড়া এখন আর উপায় কি? বিচ্ছেদ পথে কত মৌমাছি এবং মলয়ের আনাগোনা চলিয়াছে, কত মরাল এবং মেঘের দূত বসিয়া গিয়াছে কিন্তু কুলশীল টাকা এবং স্বার্থের বাধা ত কিছুতেই ঘুচিতেছে না। কত সাগরের উপর দিয়া সেতু রচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এই কৃত্রিম কাঠ বিড়ালের বাহু সেতু দিয়া কি আর হৃদয় অন্তঃপুরে পৌঁছা যায়! কোন্ সুদূর অতীতে ব্যক্তিত্ব-প্রেরণা রাবণের বেশ ধরিয়া আসিয়া স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করিয়া গিয়াছে, এখন যত সেতুই বাঁধ আর যত হনুমানের দৌত্যই বসাও, যত সুগ্রীব-বিভীষণের মিতালিই কর, আর আগুনেই পোড়াইয়া লও, হে সংসারকাব্যের রামেরা, তোমাদের কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবন যাইবে। * কত পাহাড় কাটিয়া বাষ্পযান, কত আকাশ কাটিয়া ব্যোমযান প্রেমের লিপি বহন করিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু সেই লিপির অর্থ কেউ বুঝে না, বিচ্ছেদও তার জন্য কিছুতেই ঘুচিতেছে না। প্রত্যেক বিচ্ছেদের রেখায় রেখায় বোমা ফাটিতেছে, রক্ত-লেখা ঝলকিয়া উঠিতেছে; সেই বিচ্ছেদ রেখায় প্রভুর শাসন আর ভৃত্যের দাস্য, বাণিজ্যতরীর স্ফীতপাল আর দারিদ্র্যের কঙ্কালসার রিক্ততা; সেইখানেই বিরহিণী যুবতীর রক্তচক্ষু আর যুবক কবির হাওয়ায়-উড়া উদাস দৃষ্টি, সেই সূক্ষ্ম রেখায় বড় বড় লঙ্কা ট্রয়গুলি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। আপনা আপনি বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলে এখন মিলনের জন্য কাঁদিয়া মর। তোমাদের কণ্ঠে এখন চির-বিরহের গান—"চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে।" এই যমুনা তোমাদের "স্বখাদ সলিল।" দেখিও, অন্ততঃ একটি শবের ভেলাকেও না পাইয়াই প্রেমের আবেগে ভাসিয়া পড়িও না। কিন্তু ওপারে গিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইলেই কি হইবে? সেখানেও "দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া!"

বৈজ্ঞানিক রেখাকে আদিমতার দিকে তার চরম স্থানে বাড়াইয়া

* এই হয়েছে আমার উদ্ভাবিত রামায়ণের নূতন রূপক ব্যাখ্যা। চোখে আঙুল দিয়া বলিয়া দিলাম, কি জানি কেহ আবার না ধরিতে পারে। ফ্যান্সী চিন্তক।

লইয়া গিয়া আমরা স্ত্রীপুরুষ-রহস্যের দার্শনিক সমাধান পাই। পূর্ণতার নিগুর্ণ পরব্রহ্ম আপনাকে প্রকৃতি পুরুষে বিভক্ত করিয়াদিলেন; তখন হইতেই পুরুষ ভগবান, সর্ব্বৈশ্বর্যময়, অনন্ত লীলার আধার, আর প্রকৃতি নিত্যরসোদ্বেল, তরুলতা ফল ফুল এবং জীব পর্য্যায়ের লীলা-নিকেতন। পরব্রহ্ম আকাশে শিকায় তুলা থাকুন, নিম্নে প্রকৃতি পুরুষের দৈনন্দিন ঘরকন্না লইয়াই আমাদের কারবার। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলন-রসই জীবনের উৎস, সেই মিলন রেখায় গাছ গজাইয়া উঠে, পাখী গান গাহে, আর কত ফ্যান্সী-চিন্তকের রস-কল্পনা উধাও ছুটে। এই পুরুষ আমাদের নিত্যকালের নায়ক আর প্রকৃতি চিরন্তনী নায়িকা। পুরুষ এক; কিন্তু প্রকৃতি বৈচিত্রপন্থার পথিকা, কভু তিনি পশুবশকারিণী মানবের আদি-মাতা জগদ্ধাত্রী, কভু বা শত্রুসংহারিণী শিবরূপী-অনন্তমঙ্গল-বিধৃতা বরাভয়দাত্রী কালী। প্রকৃতি যখন চিরন্তনী মাতা, পুরুষ তখন নিশ্চয়ই চিরন্তন পিতা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো দরকার নাই। পুরুষ যখন বংশীবদন চিকণ কালা আর প্রকৃতি অভিসারিণী ব্রজবধূ শ্রীরাধিকা আমরা সেই কথাই বলিতেছি।

কিন্তু এই নিত্য-প্রেমের রসলীলা লইয়া তোমাদের পেট ভরিবে না। হে ব্যক্তিগত-প্রেমব্যাপারওয়ালারা, তোমাদের জন্যও কিছু কথা বলিয়া রাখিতেছি, শুনিয়া লও। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রস-জীবনগুলিও আমার সর্ব্বদিক-স্পর্শী ফ্যান্সী লেখনীকে এড়াইয়া যাইবে না। সাগর তাহার উপাদান রহস্য লইয়া ক্ষুদ্র বিন্দুতেই ধরা দিয়াছে, প্রমাণ পাইতে চাও, বিন্দু লইয়া পরীক্ষাগারের কারবারে লাগিয়া যাও, দেখিবে সাগরের 'জান' দুটি বিন্দুর মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে; তবে এই একরূপী পুরুষ অম্ল-জান হইতে বহুরূপিণী প্রকৃতি উদক্কার জানকে পৃথক করার দাম্পত্য অভিশাপ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে সেটি কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি। তার চেয়ে একটা পেয়ারা পাতা কামড়াইয়া ফেল, দেখিবে একই রকম রসগন্ধ বীজ

গাছের পাতা হইতেই আমরা গাছকে জন্মাইয়াছি। আদিম জীবাণু বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইয়াও প্রত্যেক অংশেই জীবনস্পন্দনময় আদিম জীবানুই থাকিয়া যায়। অতএব হে ফ্যান্‌সীচিন্তার পাঠক পাঠিকারা, (অর্থাৎ যারা ফ্যান্‌সী চিন্তা না পড়ে তা'রা নয়) তোমরা সকলেই ছোট সংস্করণের পুরুষ এবং প্রকৃতি এই কথা জানিয়া রাখ এবং আজ হইতে তোমাদের স্বভাব-রসস্রোত অক্ষুণ্ণ হইয়া বহিয়া চলুক।

সমষ্টি-আত্মা যেমন বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে জন্মিয়াছে প্রত্যেক ব্যষ্টি-আত্মা (জীবাত্মা ইত্যাদি কথা পুরোণো হইয়া গিয়াছে, ফ্যান্‌সী-চিন্তকের যোগ্য নয়) তেমন কোনো বিশেষ নর এবং নারীতে বিভক্ত হইয়া এই বিপুল সংসারের মধ্যে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে, এই কথা না মানিয়া উপায় নাই, কারণ ইহা স্বয়ং প্লেতোর কথা। প্রত্যেক অর্দ্ধ-আত্মার সঙ্গে অপরার্দ্ধের মিলনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং বুক-ভাঙা নিরাশার মধেই করুণ সাহানার মত পার্থিব ব্যাপারের অনন্ত বিরহ-গান বাজিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক নর নারীই তার অপরার্দ্ধের প্রেমপাশেই বদ্ধ, কাজেই দেখা যাইতেছে যে মানব ভাষার 'অভিন্ন-হৃদয়', 'প্রাণ', 'প্রাণপ্রিয়', 'অভেদাত্মা', 'হৃদয়বল্লব', 'হৃৎপিণ্ডেশ্বর' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী', 'Better-half' প্রভৃতি কথাগুলি সার্থকনামা। আমি ফ্যান্‌সীর প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পৃথিবী জুড়িয়া এই অর্দ্ধ-আত্মার শিকার-খেলা দেখিতেছি। জগতের ইদন-দিদন এবং কোম্পানি বাগানের কুঞ্জে কুঞ্জে এইরূপ কত অর্দ্ধ-আত্মা একা অথবা জোড়া লাগিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই চির-বুভুক্ষু অর্দ্ধ-আত্মাগুলি বাঙ্গালী পেটের মত আকণ্ঠ ভাতে-জলে কোণে কোণে পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অপরার্দ্ধের শিকারে বাহির হইয়াছে এবং যে কোনো একক অর্দ্ধ-আত্মার দেখা পাইলেই তার গা ঘেষিয়া খাঁচে খাঁচে আপনার সঙ্গে জোড় লাগিয়া যাইতেছে কি না পরখ করিয়া লইতেছে। অনেক সময় দূরের দেখাতেই